তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা

লেঃ কর্ণেল (অবঃ) এম.এ. হামিদ পিএসপি

তিনটি সেনা অভ্যুত্থান

ও

কিছু না বলা কথা

লে: কর্নেল (অব:) এম. এ. হামিদ, পি.এস.সি.

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত
৪র্থ নতুন সংস্করণ, ২০১৭

হাওলাদার সংস্করণ
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৩
প্রকাশক
মোহাম্মদ মাকসুদ
হাওলাদার প্রকাশনী
৩৮/২-ক, মান্নান মার্কেট, ৩য় তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ।

প্রচ্ছদ
সুজন জাহাঙ্গীর

বর্ণবিন্যাস
এ্যালিয়েন গ্রাফিক্স
৪৫/১-এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ ।

মুদ্রণ
জি জি প্রিন্টার্স
নয়াবাজার, ঢাকা-১১০০ ।

মূল্য : ২৫০.০০ টাকা মাত্র

TINTI SENA OBBHUTTAN O KISU NA BALA KATHA written by Lt. Col. (Ret) M. A. Hamid, P.S.C. Published by Hauladar Prokashoni, 38/4, Banglabazar, Mannan Market, 2nd Floor, Dhaka-1100, Mobile : 01726956104
Price : Tk. 250.0 Only

ISBN ISBN 978-984-8964-58-3

উৎসর্গ

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট, ৩রা নভেম্বর, ৭ই নভেম্বর এবং পরবর্তী সেনা অভ্যুত্থানের রক্তাক্ত দিনগুলোতে যে সব শত শত হতভাগ্য অফিসার ও সৈনিকবৃন্দ কারণে-অকারণে প্রাণ বলিদান দিয়েছেন এবং যাঁদের দুর্ভাগা পরিবারবৃন্দ আজও তাদের প্রিয়জনদের স্মৃতি স্মরণ করে চোখের জলে বুক ভাসায়, তাঁদের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে বইখানি উৎসর্গ করলাম।

কিছু কথা ও অনুমতিপত্র

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৫ সালে ঘটে যাওয়া তিনটি সামরিক অভ্যুত্থান আমাদের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ঘটনা। যার জের এখনও কম-বেশি চলমান। এখনও তর্ক-বিতর্ক চলে সেই সময়কার ঘটনাবলি নিয়ে। লেখালেখিও হয়েছে কম না। তবে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ তেমন একটা পাওয়া যায়নি। আমার প্রয়াত স্বামী লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবদুল হামিদ, পি.এস.সি. সে সময় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের 'স্টেশন কমান্ডার' থাকার সুবাদে অত্যন্ত কাছ থেকে এই ঐতিহাসিক ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর ঐ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই পরবর্তীতে 'তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা' শিরনামে লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। বইটি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়– একাধিক মুদ্রণ ও পাইরেসিই তার প্রমাণ।
বইটি অনেকদিন থেকে বাজারে পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই আবার নতুন সংস্করণে বইটি কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে প্রকাশ করার জন্য এগিয়ে এসেছেন 'হাওলাদার প্রকাশনী'র তরুণ প্রকাশক মোহাম্মদ মাকসুদ। একমাত্র তাঁকে এই বইটির মুদ্রণ, প্রকাশন ও বিপণনের অনুমতি প্রদান করা হলো।

রাণী হামিদ
ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।

ভূমিকা

১৯৭৫ সালে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সংঘটিত হয়েছিল তিন তিনটি ভয়াবহ সেনা-অভ্যুত্থান। তিনটি অভ্যুত্থানই যুগান্তকারী ঘটনা, শতাব্দীর অন্যতম ঐতিহাসিক ঘটনা, যেগুলোর মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক ও সামরিক পরিমণ্ডলে ঘটে ব্যাপক উত্থান-পতন। এমন কি সরকার পরিবর্তনের মতো অবিশ্বাস্য ঘটনাও ঘটে যায়।

সৌভাগ্যবশত তিনটি ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানই অতি নিকট থেকে দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। প্রায় প্রতিটি ঘটনার সাথে কম-বেশি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সংযুক্ত ছিলাম।

অন্যেরা যেখানে শুনে শুনে লিখেছেন, আমি সেখানে নিজে প্রত্যক্ষ করে লিখছি। ইতিমধ্যে বেশ কিছু লেখক অভ্যুত্থান ঘটনাগুলো ঘটনা না দেখেই শুধু শুনে শুনেই রং চং দিয়ে বিভিন্নভাবে অতিরঞ্জিত করে গল্পাকারে অলংকরণ করে লিখেছেন। এতে প্রকৃত তথ্য বিকৃত হয়েছে।

তাগিদ থাকা সত্ত্বেও এতদিন ইচ্ছে করে অভ্যুত্থানগুলোর ওপর বিস্তারিত কিছু লিখিনি। এর কারণ ছিল প্রথমত, সেনা অভ্যুত্থান ঘটনাগুলো খুবই Sensitive, দ্বিতীয়ত, ঘটনাগুলোর সাথে আমারই বহু সিনিয়র সহকর্মী, বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি জড়িত থাকায় একান্ত ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও এসব নিয়ে কিছু লিখতে চাইনি।

গত বছর 'আজকের কাগজ' পত্রিকায় তিনটি অভ্যুত্থানের ওপর আমার কিছু প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সেগুলো সর্বস্তরের পাঠক সমাজে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করে। তখন থেকে বন্ধু-বান্ধব, সুধীমহল আমাকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অভ্যুত্থানগুলোর ওপর একটি বই লেখার তাগিদ দিতে থাকেন। বস্তুত তাদের তাগিদেই আমি এই বই লেখার কাজে হাত দেই।

১৫ আগস্ট, ৩ নভেম্বর, ৭ নভেম্বর অভ্যুত্থানগুলোর ওপর আমার লেখার সুবিধা হলো, ঐ সময় সৌভাগ্যক্রমে আমি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের স্টেশন কমান্ডার হিসেবে অত্যন্ত কাছে থেকে ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানগুলো প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছিল। এছাড়া অভ্যুত্থানের প্রধান নায়কদের প্রায় সবার সাথে ছিল আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও সরাসরি জানাশোনা।

অভ্যুত্থানের সর্বাধিক আলোচিত নায়ক জেনারেল জিয়াউর রহমান ছিলেন আমার কোর্স-মেট। ১৯৫৩ সালে পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমিতে আমরা দুই বছর একসাথে ক্যাডেট হিসেবে অধ্যয়ন করি। সে ছিল আমার বন্ধু। তাঁর সাথে আমার সম্পর্ক ছিল 'তুই তুকারের'। তাই আমার আলোচ্য বইতে অনেক সময় 'তুমি' সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটেছে; বস্তুত এটাই ছিল আমাদের স্বাভাবিক সম্পর্ক। তাঁর সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অনেকের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বন্ধু হলেও বহুক্ষেত্রে তাঁর ও আমার মত এবং নীতির মিল ছিল

না। বিভিন্ন ব্যাপারে ঝগড়াঝাটি এমনকি গালাগালি চলতো। দুঃখের বিষয় স্বার্থান্বেষী প্রভাবশালী একটি মহলের প্ররোচনায় অভ্যুত্থানের সময়কালে লগ এরিয়া কমান্ডার থাকাকালীন সময় তাঁর সাথে সিরিয়াস ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়। যার ফলে হঠাৎ করেই আমি স্বেচ্ছায় সমম্মানে সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করে বেরিয়ে আসি।

বরাবরই জিয়া ছিল মেজাজি এবং প্রবল আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন একজন সৎ ও সচেতন অফিসার। কিন্তু সে অসৎ অফিসারদের কানে ধরে কাজ করাতে সুবিধা হয় বলে মনে করতো। তাঁর সাথে জেঃ ওসমানী, মোশতাক আহমদ, জেঃ খলিল প্রমুখের বনিবনা না থাকা সত্ত্বেও যেভাবে সবার সাথে একা লড়ে ফাইট করে উপরে উঠে আসে, তা ছিল অবিশ্বাস্য ব্যাপার, যেটা ছিল লিডারশীপ কোয়ালিটির এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

জেনারেল এরশাদ প্রাথমিক পর্যায়ে ছিলেন একজন অখ্যাত দুর্বল প্রকৃতির অফিসার। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনিই ছিলেন একমাত্র অফিসার, যার দুর্বলতাই হয়ে দাঁড়ায় তার উর্ধ্বে ওঠার বড় 'প্লাস পয়েন্ট'। তিনি কোহাটের অফিসার ট্রেনিং স্কুল থেকে পাস করা একজন 'অনিয়মিত' অফিসার ছিলেন, বহু পরে নিয়মিত হন। জেঃ এরশাদ ও আমি একসাথে ১৯৬৭ সালে কোয়েটার স্টাফ কলেজ কোর্স করি। দক্ষ স্মার্ট অফিসার হলেও তার চারিত্রিক দুর্বলতার জন্য জাতিকে বহু মূল্য দিতে হয়। সেনা অভ্যুত্থানের অন্যতম ফসল জেনারেল এরশাদ, যিনি জিয়াউর রহমানের বদান্যতায় তড়িৎ প্রমোশন পেয়ে হন জেনারেল এবং ডেপুটি চীফ অব স্টাফ। অতঃপর আকাশ হল তার সীমানা।

ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ, অভিজ্ঞ অফিসার। কথাবার্তায় চালচলনে রাজকীয় ব্যক্তিত্ব। আমার কিছু জুনিয়র থাকায় তার সাথে সম্পর্ক থাকলেও ততো ঘনিষ্ঠতা ছিল না। অন্যান্যের মতো তিনিও ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী তার প্রতি সদয় ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের এক বীর সেনানায়ক খালেদ মোশাররফ, নেহাৎ দুর্ভাগ্যের শিকার হয়ে অকালে সৈনিকদের হাতে প্রাণ হারান।

জেনারেল শফিউল্লাহ নম্র, ভদ্র অফিসার, সেও আমার কোর্সমেট। অগাস্ট অভ্যুত্থানের আকস্মিক ঘটনাপ্রবাহ সামাল দিতে না পারায় সমালোচিত হন। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৪ অগাস্ট ১৯৭৫ তারিখে শফিউল্লাকে সরিয়ে তার স্থলে জিয়াউর রহমানকে সেনাপ্রধান করা হয়।

অগাস্ট অভ্যুত্থানের প্রধান নায়ক মেজর ফারুক ও মেজর রশিদ ছিল অনেক জুনিয়র অফিসার। তাদের সাথে আমার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও সব সময় তারা আমাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছে। ফারুক-রশিদই প্রকৃতপক্ষে জিয়াকে শুরুতে সেনাপ্রধানের গদিতে বসায়, কিন্তু পরে জিয়া তাদেরকে এড়িয়ে চলায় তাদের ক্ষোভের অন্ত ছিল না। ফারুক খুবই স্মার্ট, প্রাণবন্ত, আবেগপ্রবণ অফিসার। রশিদ ছিল ধীরস্থির, শান্ত ও হিসেবী।

কর্নেল তাহেরও ছিল আমার অনেক জুনিয়র, তাই সরাসরি তার সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তাহের ছিল একজন দৃঢ়চেতা মুক্তিযোদ্ধা অফিসার। ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর ও কর্নেল জিয়াউদ্দিনের সাথে ছিল তার ভালো সম্পর্ক। এ তিনজনই কম-বেশি বামঘেঁষা হলেও তারা ছিল নীতিবান অফিসার। পরবর্তীতে জিয়ার সাথেও তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শ্রেণিহীন সেনাবাহিনীর প্রবক্তা কর্নেল তাহেরই ছিলেন প্রকৃতপক্ষে নভেম্বর সেপাই বিপ্লবের প্রধান স্থপতি। কিন্তু জিয়ার সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পরাজিত হয়ে ফাঁসির দড়িতে ঝুলে তাকে প্রাণ দিতে হয়।

৭ নভেম্বর সেপাই বিদ্রোহের দিনগুলোই ছিল সবচেয়ে কঠিন সময়। সেপাইদের নিয়ন্ত্রণে ছিল ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট। তাদের দাপটে অফিসারদের পলায়ন ছিল অকল্পনাতীত ব্যাপার। এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। তিনটি অভ্যুত্থানের সময়ই আমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ক্যান্টনমেন্টের ভেতরেই সপরিবারে অবস্থান করে অরাজক অবস্থা স্বচক্ষে অবলোকন করি।

ঘটনাগুলো যেভাবে ঘটেছে এবং যেভাবে আমি প্রত্যক্ষ করেছি, সেভাবেই যথাযথ বর্ণনা দিয়েছি। তিনটি সেনা অভ্যুত্থানেরই বিভিন্ন দিক আমি আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে বিচার বিশ্লেষণ করেছি। আমার পক্ষ থেকে সত্য উদ্‌ঘাটনের কোনো ত্রুটি রাখিনি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যারা সরাসরি প্রত্যক্ষদর্শী, তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে সত্য উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করেছি।

যারা সাক্ষাৎকার দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন জেনারেল শফিউল্লাহ, জেনারেল খলিলুর রহমান, ব্রিগেডিয়ার আমিনুল হক, ব্রিগেডিয়ার খুরশিদ, কর্নেল মালেক, কর্নেল ফারুক, কর্নেল রশিদ, মেজর বজলুল হুদা, লেঃ কর্নেল মহিউদ্দিন, মেজর হাফিজ, কর্নেল মুনির, ব্রিগেডিয়ার হাবিবুর রহমান, মেজর কামরুল, ব্রিগেডিয়ার আতা, কর্নেল মান্নান, কর্নেল মতিন চৌধুরী, মেজর হাসমতউল্লাহ, জনাব সাইদুর রহমান, ডাঃ ফয়সল আহমেদ ও আরো অনেকে। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে ফারুক, রশিদ ও হুদা দীর্ঘ সময় ব্যয় করে আমাকে বিস্তারিত সাক্ষাৎকার দেয়ায় তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

আমি দৃঢ়কণ্ঠে বলছি, সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করেছি। সত্যের খাতিরে ঘটনাগুলোর যথার্থ বর্ণনা দিতে গিয়ে যদি কারো পক্ষে বা বিপক্ষে গিয়ে থাকে, তাহলে তা ঘটেছে আমার একান্ত অনিচ্ছায়। তাই তাদের কাছে আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

উনিশ 'শ পঁচাত্তরের তিনটি সেনা অভ্যুত্থানই রাজনৈতিক-সামরিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা।

এগুলো কেন সংঘটিত হলো? কী অবস্থার প্রেক্ষিতে সংঘটিত হলো? কেনইবা ব্যর্থ অথবা সফল হলো? জাতি কী পেলো এগুলো থেকে? বিস্তারিত গবেষণা করে জাতিকে এসব থেকে যথাযথ শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে অন্তত জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীতে এরকম রক্তক্ষয়ী ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটতে পারে।

আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ থেকে সামগ্রিক ঘটনার কিছুটা বিচার বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছি। আশা করি এগুলো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের গবেষকদের জন্যে মৌলিক উপাদান হিসেবে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৫১ ডিওএইচএস (বনানী)
স্ট্রীট নং-২
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট।

লেঃ কর্নেল (অবঃ) এম. এ. হামিদ, পি.এস.সি.
তারিখ : ২৫ মে, ১৯৯৩।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

'তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা' বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। পূর্বের সংস্করণে লিপিবদ্ধ ঘটনাবলিতে কোনো পরিবর্তন নেই, তবে এ সংস্করণে নতুন বেশ কিছু তথ্য সংযোজন করা হয়েছে, যেগুলো তাড়াহুড়োর মধ্যে প্রথম সংস্করণে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি।

১৫ অগাস্ট, ৩ নভেম্বর ও ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ অভ্যুত্থানের আরো কিছু ছোটখাটো ঘটনাবলি সংযোজিত হয়েছে এ সংস্করণে। সেই সঙ্গে বগুড়া ও চট্টগ্রাম বিদ্রোহের ঘটনাবলিও সন্নিবেশিত হয়েছে। চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানে প্রেসিডেন্ট জিয়া ও জেনারেল মঞ্জুর নিহত হন। এসব সেনাবিদ্রোহ ছিলো নভেম্বর অভ্যুত্থানেরই ফলোআপ ঘটনাবলি।

শেষোক্ত দুটি অভ্যুত্থানের সময় আমি নিজে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম না। তবে নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বইখানি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখায় সকল মহলে প্রশংসিত হয়েছে।

লেঃ কর্নেল (অবঃ) এম. এ. হামিদ, পি.এস.সি.

চতুর্থ সংস্করণ প্রসঙ্গে

বইটির তিনটি সংস্করণ বের হয়েছে। ইতিমধ্যে বাজারে বহু আগে বইখানি নিঃশেষ হয়ে গেছে, তবু পুরাতন প্রকাশকবৃন্দ আমার বিনা অনুমতিতে তাদের সংস্করণগুলো বাজারে বিক্রি করছেন। কেউ কেউ ফটোকপি করেও বইখানি বাজারে বিক্রয় করছেন। এতে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি।

আমি বইখানির নতুন চতুর্থ সংস্করণ হাওলাদার প্রকাশনীকে বের করে বাজারস্থ করার অনুমতি দিয়েছি। এখন থেকে অন্যান্য সকল পুরাতন সংস্করণের মুদ্রণ ও প্রকাশ বাতিল বলে গণ্য করা হবে। কেউ ঐগুলো বাজারস্থ করলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং ক্ষতিপূরণ দাবি করা হবে।

চতুর্থ সংস্করণটিতে বিশেষ কোনো পরিবর্তন নেই দু-একটি ঘটনা সংযোজন করে বর্ধিত আকারে পরিবেশন করা হয়েছে। বইটির মূল ঘটনাবলিতে কোনো রকম পরিবর্তন নেই। বইখানি পাঠক সমাজে একটি রেফারেন্স বই হিসেবে স্থান পেয়েছে। জাতীয় সংসদ বিতর্কে, মুজিব হত্যা মামলার বিচারে বইখানির রেফারেন্স বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। ইংল্যান্ড, আমেরিকাতেও বইখানির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। ঐসব দেশে প্রায় সকল বাংলা পত্রিকায় পুরো বইখানি ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়েছে, যদিও আমার অজ্ঞাতে। ৪র্থ সংস্করণেও মূল ঘটনাবলির কোনো পরিবর্তন নেই। শুধু ক্ষেত্র বিশেষে কিছুটা পরিবর্ধন করা হয়েছে।

আশা করি পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ পাঠক সমাজে সাদরে গৃহীত হবে। এর জন্য প্রকাশক মোঃ মাকসুদকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

লেঃ কর্নেল (অবঃ) এম. এ. হামিদ, পি.এস.সি.

এই লেখকের অন্য বইসমূহ–

- পাকিস্তান থেকে পলায়ন
- একাত্তরের যুদ্ধে জয়পরাজয়
- কোরানের ক'টি গরুত্বপূর্ণ আয়াত (যন্ত্রস্থ)

১৫ অগাস্ট, ১৯৭৫
রক্তাক্ত সেনা অভ্যুত্থান

১৯৭১ সাল।

উত্তাল বাংলাদেশ। সভা-মিছিল-বিক্ষোভ-প্রতিবাদ। উনসত্তরের গণ-আন্দোলন। বিক্ষুব্ধ জনতা। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খাঁর পতন, জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁর উত্থান। সারা দেশে 'মার্শাল ল'। ছয় দফার দাবি নিয়ে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয়। একাত্তর সাল। শেখ মুজিবুর রহমানের বিস্ময়কর উত্থান। উদ্বিগ্ন পাকিস্তান।

শুরু হলো সামরিক জান্তার গোপন ষড়যন্ত্র। ভুট্টো-ইয়াহিয়ার ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল মানতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন। মুষ্টিবদ্ধ বাঙালি। পথঘাট-অফিস-আদালত বন্ধ। আন্দোলন তুঙ্গে।

২৫শে মার্চ, ১৯৭১। রাতের অন্ধকারে ঢাকা সেনানিবাস থেকে কামান বন্দুক ট্যাংক নিয়ে বেরিয়ে এলো সশস্ত্র পাকবাহিনী। ভীমরুলের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে। চতুর্দিকে গুলি আর গুলি। আক্রমণ চললো নিরীহ বাঙালিদের ওপর। মারা পড়লো হাজার হাজার নিরীহ মানুষ। সর্বত্র জনতার লাশ আর লাশ।

এবার শুরু হলো মুক্তি সংগ্রাম। সামনে এগিয়ে চললো একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রাম। একদিকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত-সুশিক্ষিত পাকবাহিনী। অন্যদিকে লাঠি-ডাণ্ডা হাতে ভেতো বাঙালি। শুরু হলো স্বাধীনতার সংগ্রাম।

পলাশীর যুদ্ধের পর প্রায় দুশো বছর পার হয়ে গেল। কোনো সশস্ত্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি এই ভূ-খণ্ডে। সুদীর্ঘ বিরতির পর তরুণ বাঙালিদের অস্ত্র হাতে নতুন অভিজ্ঞতা। সৃষ্টি হলো নতুন ইতিহাস।

দীর্ঘকাল বৃটিশ আর পাকিস্তানি প্রভুরা অস্ত্রের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে ভেতো বাঙালিদের। শতাব্দীর ব্যবধানে এই প্রথমবার ব্যাপকভাবে অস্ত্র হাতে যুদ্ধের ময়দানে নেমে পড়ে বাঙালি তরুণরা। বন্দুকের উত্তপ্ত নল। তাজা বারুদের গন্ধ, টগবগে রক্ত। অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।

পুলিশ, আনসার, বিডিআর, বাঙালি পল্টন। সশস্ত্র বাঙালি সৈনিকদের পাশাপাশি হাত মিলিয়েছে হাজার হাজার তরুণ ছাত্র-যুবক-পেশাজীবী শ্রমিক। জনতার সশস্ত্র সংগ্রাম। হাতিয়ার পেলে লড়তে জানে বাঙালিরা। নাস্তানাবুদ খানসেনা। ঝিমিয়ে এলো তাদের লম্ফঝম্ফ। পরাজিত পাকবাহিনী।

একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বর। ছেঁড়া শার্ট, ছেঁড়া জুতা, পরনে ময়লা লুঙ্গি। কাঁধে ঝুলছে রাইফেল। ঢাকার রাস্তায় হাজার হাজার দ্বিগবিজয়ী বীর মুক্তিযোদ্ধা। তরুণদের বজ্রহুঙ্কার— 'জয় বাংলা'।

ট্যাংক, কামান, বন্দুক, ভারি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পরাজিত খানসেনা। তারা নত মস্তকে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান রেসকোর্স ময়দানের পশ্চিম প্রান্তে (বর্তমানে শহীদ সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)। প্রায় ৯৩ হাজার অক্ষত সৈন্য নিয়ে পাক জেনারেল আবদুল্লা খাঁ নিয়াজীর আত্মসমর্পণ। নিজ হাতে পিস্তল থেকে গুলি বের করে হাতিয়ার ঢেলে দেয় টাইগার নিয়াজী। কী লজ্জা! জয় হলো জনতার, বিধ্বস্ত পাকবাহিনী। চারিদিকে উল্লাস। গগন-বিদারী জয়ধ্বনি— 'জয় বাংলা। বাংলার জয়। শোষিত জনতার জয়।'

সৈনিক-জনতার সমন্বয়ে, জনতার সমর্থনে মাতৃভূমি রক্ষার্থে যে বাহিনী রুখে দাঁড়ায়, তাকে পরাস্ত করার ক্ষমতা পৃথিবীর কোনো আধুনিক সশস্ত্র বাহিনীর নেই। নদীমাতৃক বাংলার ভেজা মাটিতে তার প্রমাণ মিলল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে। এই ভূখণ্ডের ইতিহাসে সংযোজিত হলো এক নতুন অধ্যায়। সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে একটি সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাস। বাঙালির বিজয়গাথা।

স্বাধীন বাংলাদেশ। মুক্ত বাংলাদেশে গঠিত হলো স্বাধীন সরকার। স্বাধীনতা আন্দোলনের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ফিরে এলেন বাংলাদেশে।

১৯৭২ সাল। রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান হাল ধরলেন স্বাধীন সরকারের। শুরু হলো ঐতিহাসিক যাত্রা। উৎফুল্ল জনতা। একমাত্র তিনিই তখন সকল চেতনার কেন্দ্রবিন্দু। তাঁকে নিয়ে শুরু হলো বন্ধুর পথে কঠিন যাত্রা।

বিজয় ছিনিয়ে এনেছে বাঙালি। সবাই এবার বিজয়ের অংশীদার।

ভারতীয় বাহিনী বলে বিজয় আমাদের। মুক্তিবাহিনী বলে আমাদের। মুজিববাহিনী ভাবে আমাদের। সেনাবাহিনী বলে আমাদের। দেশের আনাচে কানাচে ছিটিয়ে পড়া নাম-না-জানা গেরিলারা বলে আমাদের। সেতু পাড়ার গেদু মিয়া কদম আলীরা ভাবে আমাদের। কারণ তারা নাকি বাড়িতে বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়েছিল আশ্রয়।

কবির ভাষায় :

> রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহা ধুমধাম–
> ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
> পথ ভাবে 'আমি দেব', রথ ভাবে 'আমি',
> মূর্তি ভাবে 'আমি দেব'– হাসে অন্তর্যামী।

সবাই বলে আমি বিজয় ছিনিয়ে এনেছি। এবার আমার প্রাপ্য আমাকে দাও। আমি কেন অবহেলিত। অন্যরা কেন আমার অগ্রভাগে?

শুরু হয়ে গেল চাওয়া-পাওয়ার 'ইঁদুর দৌড়। চাই, চাই, চাই ...। গাড়ি চাই, বাড়ি চাই, টাকা চাই, চাকরি চাই। চাকরিওয়ালাদের প্রমোশন চাই। নবগঠিত সেনাবাহিনীতেও একই আওয়াজ— প্রমোশন চাই। অনেক ত্যাগ হয়েছে, এবার চাই

প্রমোশন। আর অপেক্ষা নয়। নবগঠিত সেনাবাহিনী। চাওয়া-পাওয়ার হাওয়া লাগল এখানেও।

চারদিকে বিশৃঙ্খলা। চাওয়ার লোক বেশি। দেয়ার লোক নেই। নয় মাস যুদ্ধ শেষে অধৈর্য জাতি। কেউ আর জীবনযুদ্ধে এবার পিছিয়ে থাকতে রাজি নয়। ত্যাগ তিতিক্ষার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে ন'মাসেই। এই তো বাঙালি জাতি!

জাতীয় জীবনে সর্বত্র নেমে আসে হতাশা, নৈরাজ্য। চারদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে হিমশিম রাষ্ট্রপতি।

১৯৭৪ সাল।

আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি। চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাকিং। মিল কারখানায় উৎপাদন বন্ধ। দেখা দেয় খাদ্য ঘাটতি। শুরু হয় উত্তরবঙ্গে দুর্ভিক্ষ। রিলিফ নিয়ে কারচুপি। রিলিফের চাল খালাস না করে বন্দর ছেড়ে চলে যায় বিদেশি জাহাজ। আন্তর্জাতিক চক্রান্তের আবর্তে বাংলাদেশ।

যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ। এর তড়িৎ পুনর্গঠনে দরকার ছিল দক্ষ প্রশাসন, অভিজ্ঞ প্রশাসনিক অফিসারবৃন্দ, যা দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ছিল অনুপস্থিত। সর্বোপরি দরকার ছিল রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তির প্রশাসনিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা। শেখ সাহেবের দীর্ঘ দিনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থাকলেও রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসেবে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্রকে তিনি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা ও দিকনির্দেশনা দিতে পারেননি। রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অরাজকতা তাঁকে ঘিরে ধরে। দিশেহারা রাষ্ট্রপতি।

উন্মুক্ত সীমান্ত। বৃদ্ধি পায় চোরাচালান। অর্থনৈতিক অবস্থার চরম অবনতি। চারিদিকে লুটপাট জাতীয় সমস্যা মোকাবেলায় ব্যর্থ অদক্ষ অনভিজ্ঞ দুর্নীতিবাজ প্রশাসন। অসহায় রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু। তাকে ঘিরে 'চাটার দল'।

সমস্যা মোকাবেলায় ডাকা হয় সেনাবাহিনী। সীমান্তের চোরাচালান বন্ধ করতে হবে। রাষ্ট্রপতির নির্দেশ। অপ্রীতিকর সংঘর্ষে লিপ্ত হয় সেনাবাহিনীর অফিসার আর রাজনৈতিক নেতা-পাতিনেতারা। তারা একে অন্যকে দোষ দেয়। ক্ষুব্ধ রাষ্ট্রপতি। সেনাবাহিনীর কিছু অফিসারের বাড়াবাড়ি তাঁর পছন্দ হয় না। একূল-ওকূল দুকূল রক্ষার্থে প্রাণান্ত রাষ্ট্রপতি। দেশের অভ্যন্তরে প্রকাশ্যে বিরোধিতায় মাঠে নামে রব-জলিলের জাসদ পার্টি। সর্বত্র জোর প্রতিবাদ।

১৯৭৫ সাল।

উত্তপ্ত ঢাকা সেনানিবাস। বেশক'টি বিচ্ছিন্ন ঘটনাও ঘটে গেল একের পর এক। গাজী গোলাম মোস্তফার ছেলে কর্তৃক মেজর ডালিম লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা। বিয়ের পার্টিতে উপস্থিত নব-বিবাহিত ডালিম ও তার স্ত্রী। গাজীর ছেলে ডালিমকে অপমান করে। এ নিয়ে কথা কাটাকাটি। ডালিম কর্তৃক গাজীর ছেলেকে চপেটাঘাত। কিছুক্ষণের মধ্যে গাজীর ছেলে দলবল নিয়ে হাজির। ডালিম ও

তার স্ত্রীকে একটি গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে অজ্ঞাত স্থানে যাত্রা। ক্যান্টনমেন্টে খবর শুনে ডালিমের বন্ধু মেজর নূর এক গাড়ি সৈন্য নিয়ে গাজী গোলাম মোস্তফার বাড়ি ঘেরাও করে এবং ডালিমকে ফেরত দেয়ার দাবি জানায়।

তাকে বঙ্গবন্ধুর সামনে হাজির করা হলো। ডালিমের ফরিয়াদ, 'বঙ্গবন্ধু, আমরা আপনার ডাকে লড়াই করেছি। আর এই ছেলেরা তখন ফুর্তি করেছে। আজ তারা আমাকে অপমান করছে। আপনি বিচার করুন।' শার্ট খুলে সে দেখায় পিঠের আঘাত।

বঙ্গবন্ধু বিচার করলেন!

তিনি সেনাশৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে মেজর ডালিম ও মেজর নূরকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করলেন। এসব নিয়ে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে দারুণ উত্তেজনা। সেনাপ্রধান জেনারেল শফিউল্লাহ এই দুই তরুণ অফিসারকে বরখাস্ত না করার পক্ষে জোর সুপারিশ করলেও শেখ সাহেব তা প্রত্যাহার করতে অস্বীকার করেন। ঘটনাটি ক্ষুদ্র হলেও এর প্রতিক্রিয়া ছিল সুদূরপ্রসারী।

এ সময় বিভিন্ন কারণে আরো কিছু অফিসার বহিস্কৃত হলো। কর্নেল জিয়াউদ্দিন ইতিপূর্বেই একটি পত্রিকায় সরকারের তীব্র সমালোচনা করে প্রবন্ধ লেখার অজুহাতে বহিস্কৃত। জিয়াউদ্দিনকে তার লেখনীর জন্য ক্ষমা চাইতে বলা হলে তিনি তা করতে অপারগতা জ্ঞাপন করেন ।

কর্নেল তাহেরকে পঙ্গু হওয়ার অজুহাতে অবসর দেয়া হয়। বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর জলিলকে তিন বছর আগেই বহিষ্কার করা হয়েছে। ভারতীয় বাহিনীর সদস্যরা মালামাল লুট করে দেশে নিয়ে যাওয়ার সময় মেজর জলিল জোর প্রতিবাদ জানালে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। পরে অসম্মানজনকভাবে সেনাবাহিনী থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়।

সিনিয়র অফিসারদের মধ্যে ঐ সময় জেনারেল শফিউল্লাহ, খালেদ মোশাররফ শেখ সাহেবের অনুগতদের মধ্যে ছিলেন। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে শেখ সাহেবের অধিক নিকটবর্তী মনে করা হতো। তিনি ঘন ঘন শেখ সাহেবের কাছে যেতে পারতেন। কিন্তু জিয়াকে লাইনে অপেক্ষা করতে হতো। এতে ধারণা করা হয়, শফিউল্লাহর পর খালেদকেই সেনাপ্রধান বানানো হবে। এ ধারণা মোটেই অমূলক ছিল না। জিয়া ব্যাপারটা ঠিকই অনুধাবন করেছিলেন।

যে কোনো কারণেই হোক, শেখ সাহেব ও আওয়ামী লীগ ব্যক্তিবর্গরা জিয়াকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী বলে মনে করতেন। জেনারেল ওসমানীও জিয়াকে ভালো চোখে দেখতেন না। এমনকি ঐ সময় জিয়াকে পূর্ব-জার্মানিতে রাষ্ট্রদূত করে পাঠিয়ে আর্মি থেকে সরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা প্রায় পাকাপাকি হয়ে যায়। এসব জেনে জিয়া কর্নেল (পরবর্তীতে ব্রিগেডিয়ার) খুরশীদের মাধ্যমে শেখ সাহেবকে বুঝাবার চেষ্টা করেন। কর্নেল খুরশীদ আগরতলা কেইসে শেখ সাহেবের সহযোগী ছিলেন। তাই তিনি তাঁর খুব কাছের লোক ছিলেন। কিন্তু তিনি জিয়ার প্রতি শেখ সাহেবের মনোভাব কিছুটা পরিবর্তন করাতে সক্ষম হলেও তা পর্যাপ্ত ছিল না। তোফায়েল আহমদের সাথেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেন জিয়া, শেখ সাহেবের সহানুভূতি অর্জনের জন্যে।

এ নিয়ে পঁচাত্তর সালে জিয়ার মন মেজাজ ভালো ছিল না। এ সময় তিনি প্রায় একঘরে দিন কাটান। বিশেষ কেউ তাঁর কাছে আসা-যাওয়া করতো না। আমি তখন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের স্টেশন কমান্ডার। ঐ সময় তাঁর সাথে যতবারই দেখা হয়েছে, তাঁর উগ্রতা প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি। তবে বলতেন, শেখকে ঐ ব্যাটারাই (শফিউল্লাহ, খালেদ) আমার বিরুদ্ধে খেপিয়েছে। জেনারেল ওসমানীকেও গালাগালি করতেন। আমি তাঁকে শান্ত থাকার অনুরোধ করতাম। জিয়ার সাথে বরাবর আমার ছিল ভালো সম্পর্ক। তাঁর সাথে আমার সুসম্পর্ক শফিউল্লাহ ও খালেদ ভালো চোখে দেখেননি।

জিয়াউর রহমানকে রাষ্ট্রদূত করে পূর্ব-জার্মানি অথবা বেলজিয়ামে পাঠাবার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। একদিন জিয়া তাঁর অফিসে আমাকে ডেকে বলল : হামিদ, তুমি ওসমানীকে ধরে এখনই কিছু একটা না করলে চিঠি বেরিয়ে যাবে। প্লিজ ডু সামথিং। জনাব সাইদুর রহমান, একজন প্রভাবশালী মুক্তিযোদ্ধা। তার সাথে আমার পরিচয় ছিল। তোফায়েল ও রাজ্জাকের সাথে উনার ছিল গভীর সংযোগ। আমি জিয়াকে আশ্বাস দিলাম, তাঁর মারফত আমি কিছু একটা করব।

জনাব সাইদকে আমি বন্ধুবর জিয়াউর রহমানের ব্যাপারটি বললাম। তিনি কিছু একটা করবেন বলে আমাকে আশ্বাস দিলেন। আমি বরং জিয়াকেই তাঁর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম, যেন জিয়া নিজেই তাঁকে দিয়ে কাজটা করিয়ে নিতে পারে। পরে জনাব সাইদ, তোফায়েল আহমদ ও রাজ্জাককে ধরে বহু কষ্টে প্রায় শেষমুহূর্তে জিয়ার সিভিল পোস্টিং ধামাচাপা দেয়ার ব্যবস্থা করেন।

ব্যাপারটা আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ বহু বছর পর সেদিন জনাব সাইদ আমার টেলিফোন নাম্বার সংগ্রহ করে ফোন করে বললেন : কর্নেল সাহেব, আপনার জন্যেই ১৫ অগাস্ট, ৩ নভেম্বর এবং ৭ নভেম্বর সংগঠিত হলো। ব্যাপারটি আমি বুঝতে না পারায় তিনি এবার পরিষ্কার করে বললেন, আপনি সেই যে জিয়াউর রহমানের পোস্টিং ক্যানসেল করানোর জন্যে আমাদের কাজে লাগিয়েছিলেন, সেটাইতো কাল হলো। জিয়া না থাকলে তো এ তিনটা অভ্যুত্থানের কোনোটাই হতো না।

বলা বাহুল্য, জনাব সাইদুর রহমানের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার পর আমার অজান্তেই জিয়ার সাথে তাঁদের বহু গুরুত্বপূর্ণ মিটিং হয়, খালেদা জিয়ার বড় বোন চকলেট আপার বাসায়, যা অভ্যুত্থানের বিষয়বস্তু ছিল।

পঁচাত্তর সালে মাঝে মধ্যে ক্যু'র গুজব উঠলেও শেখ সাহেবের ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব এতই বিশাল ছিল যে তাঁর অনুগত সেনাবাহিনীর দিক থেকে কোনো রকম আক্রমণ-আশঙ্কা আঁচ করা যায়নি। ঐ সময় ফারুক, রশিদ অথবা অন্য ক'জন জুনিয়র অফিসার ছোটখাট কিছু একটা করতে পারে, এমন অস্পষ্ট আভাস ডি জি এফ আই-এর কাছে থাকলেও তারা যথোপযুক্ত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়। তারা সবাই বরং মেজর জলিলের জাসদের দিক থেকে সরাসরি চোরাগুপ্তা আক্রমণের আশঙ্কা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কয়েকটি স্থানে সর্বহারা এবং জাসদ আর্মস গ্রুপের সাথে পুলিশের গুলি বিনিময়ও হয়।

খুব সম্ভব মাসটি ছিল পঁচাত্তরের জানুয়ারি অথবা ফেব্রুয়ারি। ঐ সময় আমি একবার শেখ সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই। ঘটনাটি ছিল নেহাৎ আকস্মিক। একটু খোলাসা করে বলেই নেয়া যাক—

সেনানিবাস টেনিস কোর্টে একদিন খেলা শেষে খুরিশদ আমাকে ডেকে কানে কানে বলল : হামিদ ভাই, আপনার ওপর বঙ্গবন্ধু দারুণ ক্ষেপে আছেন। আপনি শীঘ্র তাঁর সাথে দেখা করে পজিশন ঠিক করুন। আমি আকাশ থেকে পড়লাম। 'কাহা রাজা ভোজ, কাহা গঙ্গারাম তেলি।' খুরশিদ বলল, মনে হচ্ছে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বুল ডোজার লাগিয়ে কচুক্ষেত মার্কেট আপনার নির্দেশে উচ্ছেদ করা হয়। স্থানীয় এম.পি এবং ডি জি এফ আই রউফ আপনার বিরুদ্ধে এ নিয়ে বঙ্গবন্ধুর কান ভারি করেছে।

এবার মনে পড়লো, হ্যাঁ, কচুক্ষেত বড় মার্কেটটি ক্যান্টনমেন্টের ভেতর থেকে উচ্ছেদ করে আমি বর্তমান জায়গায় স্থাপন করেছিলাম। এতে স্থানীয় লোকজন আমার উপর নাখোশ ছিল। বলেছিল নতুন জায়গায় মার্কেটটি চলবে না।

আমি খুরশিদকে বললাম, আমি কীভাবে প্রটোকল ভেঙে একজন রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করতে পারি?

খুরশিদ বলল : দেখুন, এতোকিছু বলবেন না। আজই আপনি খেলা শেষে রাত দশটার দিকে সোজা তাঁর বাসায় দেখা করতে চলে যান।

বললাম— তিনি আমার সাথে দেখা করবেন কী?

'অবশ্যই।'

'তিনি কী আমাকে চিনবেন?'

'অবশ্যই। আপনার নাম মুখস্থ হয়ে গেছে উনার। আজই যান।'

রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাৎ

বাসায় ফিরে গোসল করে এশার নামাজ পড়ে আমি যাত্রার জন্য সত্যি সত্যি তৈরি হয়ে গেলাম। দশটা বাজতে তখন পনেরো মিনিট বাকি। আমি আমার প্রাইভেট কার নিয়ে সরাসরি ৩২নং রোডের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। বাড়ির গেইটে পৌঁছে গাড়ি থেকে নেমে তাঁর বাসায় প্রবেশ করতে আমার একটুও কষ্ট হলো না। একটি মাত্র পুলিশ সান্ত্রী নম্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, ভাই সাহেব আপনার পরিচয়? আমি কর্নেল হামিদ। শেখ সাহেবের সাথে দেখা করতে এসেছি।

বিনীত কণ্ঠে সে বলল : স্যার, এই কিছুক্ষণ আগে তিনি উপরে শুইতে গেছেন। সবাই চলে গেছে। এখন তো তাঁকে ডাকা যাবে না।

বললাম, তুমি শুধু উপরে আমার নামটা বলে খবর পাঠাও। তিনি দেখা না করলে আমি চলে যাব।

আমার দৃঢ়তা দেখে সে খবর পাঠাতে গেল। আমি ড্রইং রুমে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তিনি এই সময় দেখা করবেন না বলেই নিশ্চিত ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে সম্পূর্ণ অবাক করে দিয়ে হঠাৎ দেখি রাষ্ট্রপতি একেবারে আমার সামনে দাঁড়িয়ে। আমি বেশ ঘাবড়ে গেলাম। এত কাছে থেকে তাঁকে আমার এই প্রথম দেখা।

তিনি উষ্ণ করমর্দন করলেন। সোফায় আমাকে বসতে বলে চা আনতে নির্দেশ দিলেন। অত্যন্ত আন্তরিকতা ও বন্ধুসুলভ মনোভাব নিয়ে তিনি কথা বলতে শুরু করলেন। বললেন, আপনার নামতো অনেক শুনেছি। এতদিন আসেননি কেন? এখন কী কোনো সমস্যা হয়েছি নাকি?

বললাম, স্যার, আমি কোনো সমস্যা নিয়ে আসিনি, স্রেফ প্রথমবার আপনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে এসেছি। আর কিছুই না।

আমার সরল জবাব শুনে তিনি ক্লান্ত দেহটি চেয়ারে এলিয়ে দিলেন। উচ্চকণ্ঠে আবার হাঁক দিয়ে চা আনতে বললেন। এবার তিনি কথা বলতে শুরু করলেন। অনেক কথা যেন বুকে আটকা পড়েছিল কতদিন ধরে।

বললেন, 'কর্নেল সাহেব কী বলবো, আপনার আর্মির কথা। অফিসাররা শুধু আসে আর একে অন্যের বিরুদ্ধে কমপ্লেইন করে। অমুক এই করেছে, সেই করেছে। আমার প্রমোশন, আমার পোস্টিং। বলুন তো কী হবে এসব আর্মি দিয়ে? অফিসাররা এভাবে কামড়া-কামড়ি করলে, ডিসিপ্লিন না রাখলে এই আর্মি দিয়ে আমি কী করবো? আমি এদের ঠেলাঠেলি সামলাবো, না দেশ চালাবো?'

এসব কথা বলতে গিয়ে তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন। তিনি শিশুর মতো বলেই চললেন, বাঙালিদের স্বাধীনতার জন্য আমি কি-না করলাম। আইয়ুব খাঁ, ইয়াহিয়া খাঁর সাথে জীবনভর লড়াই করলাম। আমাকে কতবার জেলে দিল। বাঙালি সেনা পল্টনের জন্য লড়লাম। স্বাধীনতা যুদ্ধে আপনার লন্ডনি-সিলেটিরা আমাকে কত সাহায্য করল। আগরতলা কেইসে আমার জন্য উকিল পাঠালো। আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে। সবাই খাই খাই শুরু করছে। কোথা থেকে আমি দেবো, কেউ ভাবতে চায় না—তিনি বলেই চললেন। এভাবে ৪৫ মিনিট কেটে গেল। তিনি এত কথা, এত ব্যথা নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন, আমিতো ভেবে অবাক।

রাত গভীর হয়ে যাচ্ছে দেখে এক সময় আমিই তাঁর কথার ফাঁকে ছেদ দিয়ে বললাম, স্যার মাফ করবেন, আপনি ক্লান্ত। আমি যাই।

তিনি চমকে উঠলেন। অনেকক্ষণ কেটে যাওয়ায় তিনিও খেয়াল করেননি। তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন। আমাকে গভীরভাবে আলিঙ্গন করে বিদায় দিলেন। বললেন, আপনি যখন চাইবেন সোজা চলে আসবেন। বিদায় নেয়ার প্রাক্কালে তাঁকে শুধু একটি কথা বললাম, স্যার, আপনার বাসায় সিকিউরিটি বলতে কিছুই নেই। আমি সরাসরি ঢুকে পড়লাম। বদ মতলবেও তো কেউ ঢুকে পড়তে পারতো।

আমার কথা শুনে তাঁর বিরাট হাসি পেল। আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন : দেখুন আমি হলাম পাবলিক লিডার। জনগণের মধ্যেই আমাকে থাকতে হয়। মারতে হলে আমাকে রাস্তাঘাটেও মারতে পারে। তবে কোনো বাঙালি আমাকে মারতে পারে না। তাঁর প্রবল আত্মবিশ্বাস।

সালাম দিয়ে আমি বিদায় নিলাম। তাঁর সাথে আমার আর কোনোদিন দেখা হয়নি।

ক্যান্টনমেন্টে ফিরে এসে আমি সঙ্গে সঙ্গে কর্নেল খুরশিদকে ফোন করে সব বললাম। শুনে সে তো অবাক; বলেন কী, এতোটা সময় তিনি মন্ত্রীদেরও দেন না। আমি বলেছিলাম না। তিনি চাচ্ছিলেন, আপনি দেখা করুন।

আমি আজও ভেবে পাই না, প্রথম সাক্ষাতেই তিনি আমার সাথে এতো কথা বলতে গেলেন কেন? বিশালদেহী শেখ সাহেবকে তখন কেন জানি আমার বড় অসহায় মনে হচ্ছিল। চারিদিকে সমস্যা তাঁকে ঘিরে ধরেছিল। চারিপাশে চাটুকারের দল। তিনি পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তাঁর পাশে হাল ধরার মতো নিঃস্বার্থ একটি লোকও বুঝি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। সেনাবাহিনীর অফিসারদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রমোশন ইত্যাদি নিয়ে অতিরিক্ত মাতামাতি তাঁকে খুবই পীড়া দিচ্ছিল। এতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সম্বন্ধে তাঁর মনে বিরূপ ধারণাই দানা বেঁধে উঠছিল, তা স্পষ্ট বুঝতে পারি। বোধকরি এজন্যই রক্ষীবাহিনী শক্তিশালী করার দিকে তিনি মনোযোগ দেন।

১৯৭৫ সাল শেখ সাহেবের জন্য খুবই দুর্যোগপূর্ণ বছর। এ সময় আইন-শৃঙ্খলার দারুণ অবনতি ঘটে। চোরাচালান ও বর্ডার সিল করতে সেনাবাহিনী নিয়োগ করা হয়। তরুণ অফিসাররা এ সময় ক্ষমতাসীন পার্টির বেশকিছু প্রভাবশালী নেতার সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। পার্টির নেতারা সেনাবাহিনীর আচরণের বিরুদ্ধে শেখ সাহেবের কাছে ক্রমাগত অভিযোগ তুলতে থাকে। তাঁর দলীয় রাজনৈতিক নেতারা শুরু থেকেই সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ছিলেন। তাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও শেখ সাহেব চোরাচালান, অস্ত্র উদ্ধার ও দুর্নীতি দমন করতে সেনাবাহিনীকে মাঠে নামান। এসব অপারেশনে বেশকিছু ক্ষমতাসীন এম.পি. বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হন। টাংগাইলে কাদেরিয়া বাহিনীর কাছ থেকে অস্ত্র উদ্ধার করতে ৪৬ ব্রিগেড নিয়ে অভিযান চালান কর্নেল শাফায়েত জামিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দলীয় চাপের মুখে তিনি সেনাবাহিনীকে মাঠ থেকে প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। বৃদ্ধি পেলো তিক্ততা।

ক্ষুব্ধ, বিভ্রান্ত রাষ্ট্রপতি।

এই সময় তরুণ মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের কিছু অংশ দারুণ ক্ষেপে ওঠে। তারা ভেতরে ভেতরে দল পাকাতে থাকে। ঊর্ধ্বতন অফিসারদের মধ্যে এমনিতেই রেষারেষি চলছিল। মুক্তিযোদ্ধা অফিসাররা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত ছিল। শফিউল্লাহ 'এস ফোর্স', জিয়াউর রহমানের 'জেড ফোর্স' এবং খালেদ মোশাররফের 'কে ফোর্স'। জিয়াউর রহমানের সাথে শফিউল্লাহ ও খালেদ মোশাররফের বনিবনা ছিল না। তবে শফিউল্লাহ ও খালেদের গ্রুপ ভারি হওয়াতে ঐ সময় জিয়াউর রহমানকে কিছুটা কোণঠাসা অবস্থায় থাকতে হয়। যে সব তরুণ অফিসারদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাদের প্রতি জিয়ার সহানুভূতি ছিল। জিয়ার স্টাফ অফিসার ছিল মেজর নূর। তার কামরাতে প্রায়ই এসব অফিসারদের আনাগোনা চলতো।

সেনাবাহিনীতে দুটি বড় গ্রুপ ছিল। মুক্তিবাহনী গ্রুপ এবং পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত অফিসার ও সৈনিকবৃন্দ। শেষোক্ত গ্রুপ বড় হলেও মুক্তিবাহিনী–অফিসারদের ক্ষমতা ও দাপট ছিল অপ্রতিহত। ক্ষুদ্র হলেও প্রকৃতপক্ষে সেনাবাহিনীর পরিবেশ ও মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করছিল মুক্তিবাহিনী অফিসাররাই। পাকিস্তান প্রত্যাগত অফিসার ও সৈনিকরা তখন চুপচাপই দিন কাটাচ্ছিল, যদিও মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপের সাথে

সিনিয়রিটি ও প্রমোশন ইত্যাদির অসামঞ্জস্যতা নিয়ে তারা ছিল অসন্তুষ্ট। শেখ সাহেব মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের অধিক স্নেহ করতেন। বেশি সুবিধা দিতেন। এসব নিয়ে তারা নাখোশ ছিলেন। বিশেষ করে তাদের দু'বছর সিনিয়রিটি দেয়ায় প্রত্যাগতরা মনে মনে অপমানবোধ করেন। আমি ছিলাম তখন মিলিটারি সেক্রেটারি। এভাবে ঢালাও সিনিয়রিটি প্রদানের সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা জেনারেল শফিউল্লাহ, জিয়া, খালেদ, মঞ্জুর সবাইকে স্পষ্ট করে বলেছিলাম। কিন্তু তাদের কেউ আমার সাথে একমত হননি। শেখ সাহেবও রাজি ছিলেন না। ওসমানীও না। কিন্তু প্রবল চাপের মুখে তাঁরা রাজি হন। ফলে তাঁর অজ্ঞাতেই সেনাবাহিনীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ পাকিস্তান ফেরত গ্রুপের সহানুভূতি হারান।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন কারণে সেনাবাহিনীর মধ্যে ভারত বিরোধী মনোভাবও প্রকট হয়ে ওঠে। মাত্র চার বছর আগে ভারতীয় বাহিনীর সহায়তায় বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও কি আশ্চর্য, প্রায় সব মুক্তিযোদ্ধা অফিসারই এরই মধ্যে ভারতকে নাক সিঁটকাতে শুরু করেছে। জেনারেল শফিউল্লাহ, জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশাররফ এরা কেউ ভারতকে ভালো চোখে দেখতেন না। জেনারেল ওসমানী তো ইন্দিরা গান্ধীর নামই শুনতে পারতেন না। যুদ্ধের পর তাদের মাতব্বরি ও লুটপাট সবাইকে ক্ষেপিয়ে তোলে। তবুও সার্বিকভাবে বলা যায়, দেশে ঐ সময় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা অস্থির থাকলেও সেনাবাহিনীর দ্বারা বড় রকমের একটা অভ্যুত্থান ঘটবে, তেমন কোনো আলামতই ছিলো না। এ কারণে সারা দেশবাসীর জন্য ১৫ অগাস্ট অভ্যুত্থান সঠিক অর্থে সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থান ছিল না। কিছু জুনিয়র অফিসারের নেতৃত্বে ওটা ছিল ঢাকায় অবস্থিত মাত্র দুটি ইউনিটের একটি আকস্মিক ঝটিকা অভিযান। ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম, যশোর, রংপুর, বগুড়া প্রভৃতি ক্যান্টনমেন্টের সকল ইউনিট ফরমেশনগুলো ছিল নীরব, শান্ত। তারা কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি।

ধূমায়িত অসন্তোষ

চুয়াত্তর-পঁচাত্তর সালে বিভিন্ন কারণে শেখ সাহেবের প্রতি জনগণের আস্থা কমতে থাকে। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে বহুলোকের প্রাণহানি ঘটতে থাকে। রিলিফের মাল দুঃস্থ মানুষের কাছে পৌঁছতে পারে না। চলে গম চুরি, চাল চুরি, কম্বল চুরি। জাসদ, সর্বহারা, কমিউনিস্ট প্রভৃতি দল গোপনে সহিংস আত্মপ্রকাশের গোপন প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এসব কথা শেখ সাহেবের একেবারে অজানা ছিল না। তাঁর প্রাণনাশের হুমকিও বেড়ে যায়, কিন্তু তিনি এ নিয়ে খুব বেশি একটা উদ্বিগ্ন ছিলেন বলে মনে হয় না। আজীবন রাজনৈতিক স্রোতের বিপরীতে সংগ্রাম করে তিনি এসব হুমকিকে বিশেষ আমলও দেননি।

অগাস্ট ১৯৭৫

রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অস্থিরতা বিশৃঙ্খলা বেড়েই চলল। ধূমায়িত অসন্তোষ দমনে বেসামাল শেখ সাহেব অকস্মাৎ সব দল ভেঙে দেশে একদলীয় শাসন পদ্ধতির প্রবর্তন করে 'বাকশাল' সৃষ্টি করেন। যে ব্যক্তি সারা জীবন বহুমুখী গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম

করলেন, তিনিই নিজে এখন বহুমুখী গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করে এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার সৃষ্টি করলেন। একই সাথে সংবাদপত্রের ওপর নেমে এলো খড়গ।

উত্তপ্ত রাজনৈতিক অঙ্গন। আতঙ্কিত জনগণ। তিনি যত দ্রুত বাকশাল প্রবর্তন করে রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্তৃত্বভার কঠোর হস্তে গ্রহণ করার পরিকল্পনা করছিলেন, বিরুদ্ধবাদীরাও ততোধিক দ্রুততার সাথে শেষ কামড় দিতে প্রস্তুত হতে থাকে। শেখ সাহেব এই সময় বাকশাল ছাড়া আর কিছুই শুনতে রাজি ছিলেন না। ওদিকে ক্যান্টনমেন্টে সেনাব্যারাকেও বাকশাল গঠনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে। অন্তত 'একদল পদ্ধতি' অফিসার বা সৈনিকদের কারোও পছন্দ হয়নি। তবে অসন্তোষ থাকলেও এ নিয়ে কেউ প্রকাশ্যে বিরোধিতার মধ্যেও যায়নি। আর্মি, নেভী, এয়ারফোর্স প্রধানদের বাকশাল কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ডেপুটি চীফ জিয়াউর রহমানকেও সদস্য করা হয়। বলা বাহুল্য, নতুন ব্যবস্থা রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে নতুন করে অস্থিরতা সৃষ্টি করল।

ক্যান্টনমেন্টে গুজব ছড়িয়ে পড়ল, শেখ সাহেব সেনাবাহিনীকে বিলুপ্ত করে ভারতীয় সহযোগিতায় রক্ষীবাহিনীকে গড়ে তুলছেন। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে রক্ষীবাহিনীকে সাজিয়ে দিচ্ছেন। রক্ষীবাহিনীর জন্য নতুন নতুন ব্যারাক, নতুন গাড়ি, নতুন ইউনিফরম সেনাবাহিনীর সন্দেহ আরো বাড়িয়ে তোলে। এসব অসন্তোষজনক অবস্থা থাকলেও সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন সকল অফিসারই শেখ সাহেবের অনুগত ছিলেন। শফিউল্লাহ, খালেদ মোশাররফ তো শেখ সাহেবের কাছের লোক ছিলেন। একমাত্র জিয়াউর রহমানের বিশ্বস্ততা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও ডেপুটি চীফ হিসাবে তাঁর ক্ষমতা ছিল সীমিত এবং তখনকার সময় প্রায় ক্ষমতাহীন ও একঘরে। এ ছাড়া তাঁর ওপর টিকটিকিদের ছিল কড়া নজর।

জিয়ার পোস্টিং

আরেকটি ব্যাপার উল্লেখযোগ্য। সেনা প্রধান হিসেবে জেনারেল শফিউল্লাহর মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় পঁচাত্তরের মে মাসে আরো তিন বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি তার মেয়াদ বাড়িয়ে দেন। এতে জিয়া খুবই অসন্তুষ্ট হয় এবং দেন দরবার শুরু করে। ঐ সময় রাষ্ট্রপতি তাকে সোজা বলে দেন, তুমি চাইলে রিজাইন করতে পারো। জিয়া চুপচাপ অপেক্ষা করতে থাকে। এই সময় তাকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়ারও চেষ্টা চলতে থাকে।

তদানিন্তন ডেপুটি প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর ভাষ্যমতে তাকে শেষমেশ সময় দেয়া হয় সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত। ডেড লাইন পার হওয়ার আগেই ১৫ আগস্ট সেনা অভ্যুত্থান সব সমস্যার সমাধান করে দেয়।

তবে একথা সত্য, মুক্তিযোদ্ধা জুনিয়র অফিসারদের মধ্যে বেশকিছু তরুণ বিক্ষুব্ধ অফিসার প্রকাশ্যে আওয়ামী লীগ সরকারের সমালোচনায় মুখর ছিল। অনেকেই গোপনে গোপনে কিছু একটা করার পথ খুঁজছিল, তবে এসব অভ্যুত্থান ঘটার মতো বড় বিপদ হিসেবে ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয়নি। শেষ পর্যন্ত ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তেই বিদ্রোহের কালোমেঘ দানা বেঁধে উঠল।

ঘটনার মূল নায়ক ১ম বেঙ্গল ল্যান্সার রেজিমেন্টের মেজর সৈয়দ ফারুক রহমান এবং তার সহযোগী টু-ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার মেজর খন্দকার আবদুর রশিদ— ফারুকেরই নিকট আত্মীয়, ভায়রা ভাই।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের দুইপ্রান্তে অবস্থিত দুই ইউনিট। মেজর ফারুকের বেঙ্গল ল্যান্সার ট্যাংক রেজিমেন্ট ছিল ক্যান্টনমেন্টের উত্তর প্রান্তে। ইউনিটের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন লে. কর্নেল মোমেন, একজন্ন পাকিস্তান প্রত্যাগত অফিসার। ফারুক রহমান ছিলেন 'সেকেন্ড ইন কমান্ড'। রেজিমেন্টটি তারই হাতে গড়া। স্বভাবতই রেজিমেন্টের সৈনিকবৃন্দ সবাই ছিল তারই অনুগত। এছাড়া ফারুক ছিল মুক্তিযোদ্ধা অফিসার। অত্যন্ত স্পিরিটেড, ড্যাশিং, প্রবল আবেগপ্রবণ— রেজিমেন্টের গৌরব ও পতাকা সমুন্নত রাখতে সদা সচেতন। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত বেঙ্গল ল্যান্সার ট্যাংক রেজিমেন্টে ৩০টি ট্যাংক। শেখ মুজিবকে ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের দেয়া টি-৫৪ ট্যাংক, যাদের বিধ্বংসী ক্ষমতা ভয়াবহ। কিন্তু ফারুক যে ট্যাংকগুলো নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছিল, তার একটিতেও কামানের গোলা ছিল না। ট্যাংকে শুধু ছিল মেশিনগান।

প্রশ্ন জাগে, ফারুক কেন হঠাৎ শেখ সাহেবের প্রতি এত বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠল?

আগেই বলেছি ফারুক ছিল বড়ই আবেগপ্রবণ। দেশের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দুর্ভিক্ষ, ক্ষমতাসীন দলের ক্ষমতার অপব্যবহার, খুন, হাইজ্যাকিং ইত্যাদি অবলোকন করে সে ভীষণভাবে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। দেশ ক্রমাগত ভারতের কুক্ষিগত হয়ে পড়ছে, শেখ মুজিব দেশকে ভারতের সেবাদাস বানিয়ে ফেলছেন—ফারুকের ভেতরে এই ধারণা প্রবল মানসিক যন্ত্রণার উদ্রেক করে। পাকিস্তানের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে আমরা ভারতের শৃঙ্খল পরতে রাজি নই— এই ছিল ফারুকের কথা।

সর্বোপরি এতবড় ট্যাংক ফায়ার পাওয়ার নিয়ে ক্ষমতার কাছাকাছি বসে ফারুকের মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষী মিলিটারি অফিসার শান্তশিষ্ট হয়ে বসে থাকবে, তা কিছুতেই আশা করা যায় না। তবে অনেকের প্রশ্ন, ফারুকের মতো জুনিয়র অফিসারের শক্তির উৎস ছিল কোথায়? জবাবটা সবার জানা নেই। তার সকল শক্তির উৎস ছিল ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ। পারিবারিক সম্পর্কেও ফারুক ছিল খালেদের ভাগিনা। নেপথ্যে খালেদ মোশাররফই ফারুককে সবরকম নিরাপত্তা ও সহযোগিতা দিয়েছেন। ফারুক যে কিছু একটা করবে, তা খালেদ জানতেন। তবে শেখ সাহেবকে হত্যা করার জন্য অবশ্যই তিনি ইন্ধন যোগাননি। ফারুক তার নিজস্ব ধ্যানধারণা, প্ল্যান প্রোগ্রাম নিয়েই চলছিল। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের ছত্রছায়ায় ফারুক জুনিয়র হলেও ক্যান্টনমেন্টে তার ছিল শক্তিশালী বিচরণ।

ফারুক কী মুক্তিযোদ্ধা ছিল? এক সময় এ নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় ফারুক আবুধাবী থেকে পাকবাহিনী পরিত্যাগ করে পালিয়ে একাত্তরের ২১ নভেম্বর লন্ডন হয়ে নয়া দিল্লীতে উপস্থিত হয়। বিতর্ক অবসানের জন্য দুই সদস্যবিশিষ্ট এক কমিটি গঠন করা হয়। ব্রিগেডিয়ার মইনুল হোসেন ও আমি ছিলাম ঐ কমিটির সদস্য। আমরা ফারুকের এয়ার টিকিট ইত্যাদি চেক করে প্রায় ৮ ঘণ্টার ঘাটতি পাই। আমাদের রিপোর্ট পর্যালোচনা নিয়ে বৈঠক বসে। জেনারেল শফিউল্লাহ,

জিয়া, খালেদ, মঞ্জুর, মইনুল হোসেন ও আমি উপস্থিত ছিলাম। মিটিং-এ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ফারুকের পক্ষ সমর্থন করে অত্যন্ত জোরালো বক্তব্য রাখলে কয়েক ঘণ্টার ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও তাকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তবে তাকে দুই বছর সিনিয়রিটি দেয়া হয়নি।

ফারুকের অপর প্রধান সহযোগী মেজর আবদুর রশিদ ছিলেন টু-ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার। ধীরস্থির নরম সুরে কথাবার্তার মানুষ। আমার অফিসের পাশেই ছিল রশিদের টু-ফিল্ড রেজিমেন্ট। প্রায়ই দেখা হতো। বলা যায় মেজর ফারুকের সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের মানুষ। শান্ত ভদ্র এই অফিসারটি যে একটি অভ্যুত্থানের মতো ঘটনা ঘটাতে পারে, তা কোনো সময়ই আমার মাথায় আসেনি। পঁচাত্তরের মার্চ মাসে রশিদ ভারতে গানারী স্টাফ কোর্স শেষে ঢাকা ফিরলে তাকে যশোহরে আর্টিলারি স্কুলে পোস্টিং দেয়া হয়। পরে ফারুক আমাকে বলেন, তিনিই তার ভবিষ্যৎ মহাপরিকল্পনার কথা চিন্তা করে, তার গুরু CGS খালেদ মোশাররফকে ধরে রশিদের পোস্টিং ঢাকায় টু-ফিল্ড রেজিমেন্টে বদলি করান। অন্যান্য যে সব আলোচিত অফিসার, তারা ছিলেন উক্ত দুই ইউনিটের বাইরের। তাদের মধ্যে ছিলেন মেজর ডালিম, নূর, শাহরিয়ার, হুদা, পাশা ও রাশেদ প্রমুখ। বাকি জুনিয়ার অফিসাররা উভয় ইউনিটেরই ছিলেন। সবাই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অফিসার, বিভিন্ন কারণে বহিস্কৃত, অপসারিত, ক্ষুব্ধ।

অভ্যুত্থানের মূল নায়ক মেজর ফারুকুর রহমান অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তাঁর গোপন পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন। অবাক হলেও সত্যি, তিনি তার পরিকল্পনার কথা ১২ অগাস্টের আগে পর্যন্ত কাউকে জানাননি, অথবা কারো সাথে পাকাপাকি আলোচনাও করেননি। কারণ বাইরে ভেতরে যে অবস্থা ছিল, তাতে কাউকে বিশ্বাস করার উপায় ছিল না। যদিও ঐ সময়ে বেশকিছু বিক্ষুব্ধ তরুণ অফিসার প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ খুঁজছিল। এদের মধ্যে কর্নেল আমিন, মেজর হাফিজ, গাফফার, নাসের, ডালিম, নূর প্রমুখ ছিলেন। মেজর রশিদ অবশ্য এতে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন, ফারুকের মন্তব্য সঠিক নয়; তিনি নিজেই আলাদাভাবে বহু আগে থেকেই বিভিন্ন সমমনা আর্মি অফিসার এবং কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তির সাথে গোপন আলোচনা চালিয়ে আসছিলেন।

•

১২ ই অগাস্ট ১৯৭৫

দিনটি ছিল মেজর ফারুকের বিবাহ বার্ষিকী। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের অফিসার মেসে বেশ বড় রকমের পার্টির আয়োজন করে মেজর ফারুক। অন্যান্যের মধ্যে আমিও উপস্থিত ছিলাম। সবার অজ্ঞাতে ঐ দিনই প্রথম ফারুক তার ভায়রা মেজর রশিদকে তার গোপন পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করে। রশিদ প্রথমে চমকে যায়, কিন্তু পরে ফারুকের সাথে একাত্ম হয়। বলা যেতে পারে ফারুকের প্রস্তাব কিছুটা বাধ্য হয়েই তাকে গ্রহণ করতে হয়। ফারুকের ভাষ্য অনুযায়ী; আমি যখন রশিদকে প্রস্তাব দেই তখন কিছুটা চমকে উঠলেও যখন তাকে বলি, দেখ রশিদ, আমি ঘটনা ঘটাতে যাচ্ছিই, মরি আর বাঁচি। তখন ধরা পড়লে আমি তোমার নাম বলবোই কারণ তোমার সাথে এ নিয়ে কথা

বলেছি। অতএব ভালো হয় যদি তুমিও যোগ দাও তোমার ইউনিট নিয়ে, তাহলে সাফল্য নিশ্চিত হবে। পার্টি শেষে অনেকক্ষণ তাদের মধ্যে আলোচনা হয়। রশিদের কথা ছিল, এ কাজে আরো কিছু অফিসার দরকার এবং তা গ্রহণ করতে হবে। ফারুক তাতে রাজি হয়। সরকার উৎখাত অপারেশন পরিকল্পনার পুরো দায়িত্বভার মেজর ফারুকের হাতে থাকে এবং রাজনৈতিক দিক মেজর রশিদের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়। এটা অবশ্য মেজর ফারুকের ভাষ্য।

রশিদ কিন্তু বলেন, এসব বাজে কথা। আসলে ১২ই অগাস্ট তারিখে আমরা দুজন মিলে আলোচনা করে ১৫ তারিখ চূড়ান্ত আঘাত হানার দিনক্ষণটি ঠিক করি বটে, কিন্তু আমি এ ব্যাপার নিয়ে বেশ আগে থেকেই বিভিন্ন জনের সাথে সতর্ক কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার মাধ্যমেই ডালিম, নূর, হুদা, রাশেদ, পাশা, শাহরিয়ার এদেরকে দলে আনা সম্ভব হয়। ডালিম, নূর তখন আর্মি থেকে বরখাস্তকৃত। শাহরিয়ারও অবসরপ্রাপ্ত। বজলুল হুদা মিলিটারি ইনটেলিজেন্সের অফিসার ছিল। মেজর পাশা এবং মেজর রাশেদ চৌধুরীকেও অবসর দেয়া হয়। বলাবাহুল্য এরা সবাই ব্যক্তিগত কারণে শেখ সাহেবের ওপর ছিল বীতশ্রদ্ধ। সিনিয়ার অফিসার বেশ কজনের সাথেও কথা হয়। তারা দোদুল্যমান থাকলেও মৌন সমর্থন দেন। সবার ছিল একটি সমস্যা– 'বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধিবে কে?'

মেজর রশিদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল একজন রাজনৈতিক নেতা অনুসন্ধান করা। এ কাজটি রশিদ অত্যন্ত নিপুণতার সাথে সম্পন্ন করে। আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতা খন্দকার মোশতাক আহমদ ছিলেন রশিদের পাশের গ্রামের লোক। রশিদ তার কাছে গিয়ে বিভিন্নভাবে কথাটা পাড়ে। তাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ২রা অগাস্ট। রশিদ আমার কাছে একগাল হেসে স্বীকার করেন, মোশতাক সাহেব বহুত চালাক লোক। তিনি তার কথার ইশারা ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলেন।

মোশতাক আহমদ শেখ সাহেবের সর্বশেষ কার্যকলাপে সন্তুষ্ট ছিলেন না। মুক্তির উপায় খুঁজছিলেন। অতএব রশিদ তার সাথে কথাবার্তা বলে সহজেই বুঝতে পারে, প্রয়োজন মুহূর্তে এই বুড়োকে ব্যবহার করা যাবে। অবশ্য রশিদ শুধু মোশতাক নয়, অগাস্টের আগে থেকে আরও কজন আওয়ামী লীগ নেতার সাথে এ নিয়ে কৌশলে আলাপ করে। তাদের অনেকেই শেখ সাহেবের সর্বশেষ রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। জনাব তাজউদ্দিন তাদের অন্যতম। তারা অবশ্য শেখ সাহেবের উৎখাত চাননি। তারা তাঁকে একটি বিশেষ গ্রুপের খপ্পর থেকে বের করে আনতে আগ্রহী ছিলেন। ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তি ছিলেন মোশতাক আহমেদ। সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে, তিনি পঁচাত্তরের শুরু থেকেই শেখ মুজিবকে উৎখাতের জন্য সমমনা সামরিক ও বেসামরিক কিছু ব্যক্তির সাথে গোপন বৈঠক ও শলা-পরামর্শ করেছিলেন।

অভ্যুত্থান প্ল্যান

চরম রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে ১৫ অগাস্ট দ্রুত ঘনিয়ে আসে। জাসদ, সর্বহারা প্রভৃতি গ্রুপ আঘাত হানার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। ক্যান্টনমেন্টে ফারুক-রশিদ চক্র সবাইকে টেক্কা দিয়ে 'রেডি মেইড' মিলিটারি গ্রুপ নিয়ে গোপন সশস্ত্র অভিযানে নেমে

পড়ে। ফারুক-রশিদের অপারেশনের প্ল্যান মোটেই বিস্তারিত কিছু ছিল না। অনেকটা ফ্রি ল্যান্সার কার্যক্রমের মতো। আক্রমণ প্ল্যান শুধু ফারুকই জানতো। রশিদের সাথে শুধু আলোচনা হতো। ১৪/১৫ তারিখের মধ্যরাতে ফারুক প্রথমবার অফিসারদের গন্তব্যস্থল, টার্গেট ইত্যাদি দেখিয়ে দেয়। অফিসারদের নিয়ে এটাই ছিল ফারুকের প্রথম অপারেশন্যাল বৈঠক এবং ব্রিফিং। এর আগে কখনো তাদের মধ্যে প্ল্যান প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা হয়নি, কোনো রিহার্সেলও হয়নি। এমন ধরনের আক্রমণ প্ল্যানকে 'তড়িঘড়ির পিকনিক' প্ল্যানই বলা যেতে পারে। তবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের আক্রমণ প্ল্যান গোপন থাকায় কেউ কিছুই জানতে পারেনি। এটাই ছিল তাদের সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ।

১৪ অগাস্ট মধ্যরাতে ব্রিফিং এবং কিছুক্ষণ পরই সৈন্যসামন্ত নিয়ে সরাসরি যুদ্ধ যাত্রা। এধরনের অপারেশন যে কীভাবে সফল হলো, তা রীতিমতো অবাক ব্যাপার।

মূল টার্গেট ছিল ৩২ নম্বর রোডে শেখ সাহেবের ৬৭৭ নং বাসা। আসলে টার্গেটে আঘাত হানাটাই বড় কথা নয়। এ ধরনের সরকার উৎখাত অভ্যুত্থানে, আক্রমণ পরবর্তী ধকল সামলানোটাই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, তা না হলে অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়।

ফারুক-রশিদ তাদের অপারেশনে অন্তত একটি ইনফেন্ট্রি বেঙ্গল রেজিমেন্ট ইউনিটও সাথে নেয়ার জন্য খুবই আগ্রহী ছিল কিন্তু ঢাকায় অবস্থিত বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইউনিটগুলোর অফিসারদের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছিল না। এছাড়া গোপন প্ল্যান ফাঁস হয়ে যাওয়ারও ভয় ছিল। শেষ মুহূর্তে দূরে জয়দেবপুরে অবস্থিত ১৬ বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক মেজর শাহজাহান কথা দেয় ১৪/১৫ অগাস্ট মধ্যরাতে মূল দলের সাথে মিলিত হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শাহজাহান কথা রাখতে পারেনি। ফারুক অবশ্য তাদের জন্য অপেক্ষা করার দরকারও মনে করেনি। ইঞ্জিনিয়ার্স এবং ৩৮ লাইট এ্যাক্ এ্যাক্ ইউনিটের সাথেও যোগাযোগ করা হয়েছিল বলে তারা জানিয়েছে।

অপারেশন পরবর্তী কার্যক্রমের যাবতীয় প্ল্যান ছিল মেজর রশিদের। রশিদ ছিল ধীর স্থির, নিখুঁত। রেডিও দখল, নতুন রাষ্ট্রপ্রধানকে ধরে আনা, সশস্ত্র বাহিনী প্রধানদের একত্রকরণ এসবই সম্ভব হয়েছিল মেজর রশিদের পরিকল্পনায়। মেজর ফারুক টার্গেট দখল ও বিধ্বস্ত করেই খালাস, কিন্তু পরবর্তী দুরূহ কাজটি যে ব্যক্তি অত্যন্ত নিপুণভাবে সামাল দেয়, সে হল মেজর রশিদ।

এ কথা বলাই বাহুল্য, যদি প্রথম পর্ব সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন না হতো, অর্থাৎ শেখ সাহেব যদি মারা না যেতেন, তাহলে এ অভ্যুত্থান নির্ঘাত ব্যর্থ হতো। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

ফারুক-রশিদের অভ্যুত্থান-প্ল্যান যেভাবে হালকাভাবে প্রণয়ন করা হয়, তাতে বাস্তবায়নের পথে কোথাও সামান্যতম বাধা পেলে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতো। এ ধরনের অভ্যুত্থান পরিকল্পনায় ফারুক-রশিদ মারাত্মক ঝুঁকি নিয়েছিলেন। মাত্র দুটি ইউনিট নিয়ে তাদের সার্বিক সাফল্যের আশা মোটেই পাঁচ শতাংশের বেশি ছিল বলে আমি মনে করি না।

ফারুক রশিদের লক্ষ্য এক থাকলেও চিন্তাধারার মধ্যে কিছুটা ফারাক ছিল। মূল হোতা মেজর ফারুকের মতে, তার প্ল্যান ছিল শেখ সাহেবকে বন্দি করে ক্যান্টনমেন্টে এনে তার 'বস' ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের সামনে হাজির করা এবং বিচারের ব্যবস্থা করা। অথবা প্রেসিডেন্ট সুকর্নের মতো বন্দি করে রাখা। মেজর রশিদ বলেছে, তাঁকে ধরে এনে রেসকোর্স ময়দানে সংক্ষিপ্ত বিচার মহড়ার মাধ্যমে প্রাণদণ্ড প্রদান করে সাথে সাথেই তা ফায়ারিং স্কোয়াডের মাধ্যমে কার্যকর করা হতো। তিনি আত্মসমর্পণ করলে হয়তো পরিবারের সবার প্রাণ রক্ষা পেতো, এই যা তফাৎ।

এ ধরনের প্ল্যান প্রোগ্রাম যে কতো বড় ভয়াবহ ও ঝুঁকিপূর্ণ ছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ঘটনা প্রবাহ যেভাবে গড়িয়ে যায় তাতে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিব, শেখ মনি ও জনাব সেরনিয়াবাতের বাসভবনে আক্রমণ ও হত্যা করা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প পন্থা ছিল বলে মনে হয় না।

১৫ অগাস্ট ভোর চারটায় ক্যান্টনমেন্টের উত্তর প্রান্ত থেকে অপারেশন শুরু হওয়ার পর বিভিন্ন গ্রুপের অফিসাররা নিজেরাই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং কোন নির্দেশের অপেক্ষা না করে তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছে তারা নিজেরাই। যেমন—রেডিওতে মুজিব হত্যার তাৎক্ষণিক ঘোষণা তাদের মূল প্রোগ্রামে না থাকলেও মেজর ডালিম তার নিজ উদ্যোগে সকালবেলা রেডিও থেকে ঘোষণা দেয়, যার মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ছিল তাৎক্ষণিক এবং ব্যাপক।

১২ অগাস্ট মেজর ফারুক ও রশিদের মধ্যে অভ্যুত্থান নিয়ে চূড়ান্ত আলোচনার পর ঘটনা অতি দ্রুত গড়িয়ে চলে। ১৪/১৫ অগাস্ট তারিখটি ছিল নৈমিত্তিক নৈশকালীন ট্রেনিং। ফারুক ঐ রাতেই আঘাত হানার পরিকল্পনা করে। তা না হলে পরবর্তী ট্রেনিং রাত পেতে দেরি হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতিবার রাত 'নৈশকালীন ট্রেনিং'-এর জন্য নির্ধারিত ছিল। এছাড়া ঐ সময় ল্যান্সার ইউনিট কমান্ডার কর্নেল মোমেন কয়েকদিনের ছুটিতে ছিলেন। সুতরাং ফারুক ছিল বন্ধনহীন পাখি। সে রশিদকে মেসেজ পাঠায়, 'তুমি প্রস্তুত?'

'হ্যাঁ, প্রস্তুত।'

'আজ রাত দশটায় তোমার সাথে দেখা হবে।'

'ওকে!'

১৪ অগাস্ট, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট

দিনটি খুব ভালো ছিল না। শহরের বিভিন্ন স্থানে ছিল খামাখাই উত্তেজনা। রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করার কথা ১৫ অগাস্ট। এ নিয়ে ভার্সিটি ক্যাম্পাসে বিপুল প্রস্তুতি। বিরোধীরাও বসে নেই। কয়েকটা শক্তিশালী বোমা ফাটায় ক্যাম্পাসে। নিরাপত্তা বাহিনীর কর্তারা উদ্বিগ্ন। নিশ্চয় জাসদের কাণ্ড। এদের দৌরাত্ম্যে টিকটিকিদের ঘুম নেই। তখন বেশ বোমাবাজি চলছে এখানে ওখানে। ১৪ অগাস্ট রাতে সিভিল মিলিটারির সব টিকটিকি সংস্থার দৃষ্টি পড়েছিল ঐদিকেই।

ওদিকে নোয়াখালীর কাছে একটি ভারতীয় সামরিক হেলিকপ্টার দেশে ফেরার পথে পাখির সাথে ধাক্কা খেয়ে বিধ্বস্ত হয়ে গেল। মারা গেল ভারতীয় পাইলট ও

ক'জন বিমান আরোহী। এ নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে কিছু ব্যস্ততা। ঘটনাটি কোনো স্যাবোটাজ নয়। নেহায়েতই দুর্ঘটনা। তবু ঘটনা ঘটলো দিন বেছে একেবারে ১৪ অগাস্ট! ১৪/১৫ অগাস্ট রাতে শেখ সাহেবের বড় ছেলে কামাল প্রমুখ এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাবাহিনী সংস্থার লোকজন ভার্সিটির নিরাপত্তা নিয়েই ছিল মহাব্যস্ত।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অবশ্য ঐ দিন অর্থাৎ ১৪ অগাস্ট স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছিল। কোথাও কোনো অস্বাভাবিক নড়াচড়া নজরে পড়েনি। সব ইউনিটে, হেডকোয়ার্টারে, অফিসে স্বাভাবিক কাজকর্ম চলেছে। বিকালে আর্মি টেনিসকোর্টে নিত্যদিনকার মতো সিনিয়ার অফিসারদের টেনিস জমে উঠেছিল। জেনারেল শফিউল্লাহ, জিয়া, মামুন, কর্নেল খুরশিদ ও আমি সেখানে নিয়মিত টেনিস খেলতাম।- ১৪ অগাস্টের বিকালেও এর কোনো ব্যতিক্রম ছিল না। আমাদের টেনিস জমে উঠেছিল। তবে শফিউল্লাহ বোধহয় ঐদিন আসেননি। আমার মনে হয়, মেজর ডালিম ও নূরকেও সেদিন টেনিস কোর্টের আশেপাশে পায়চারি করতে দেখেছিলাম।

প্রকৃতপক্ষে অগাস্টের কিছুদিন আগে থেকে হঠাৎ করে ডালিম ও নূর মাঝে মধ্যে টেনিসকোর্টে আসতে শুরু করে। জেনারেল শফিউল্লাহ একদিন আমাকে খেলার সময় জিজ্ঞাসা করলেন, এসব জুনিয়ার অফিসাররা কেন এখানে খেলতে আসছে? এ দু'জনকে আসতে মানা করে দাও। আমি খেলার পর নূরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, কার অনুমতি নিয়ে তোমরা এখানে খেলতে এসেছো? সে জানালো, তারা জেনারেল জিয়ার অনুমতি নিয়েছে। আমি কথাটা শফিউল্লাহকে জানালে সে রাগে গরগর করতে লাগল। জিয়ার সাথে এদের যোগাযোগ তার পছন্দ হয়নি, কিন্তু মুখের ওপর মানাও করতে পারছিলো না।

১৪ অগাস্টের সূর্য অস্ত গেল। আমরা টেনিস কোর্ট থেকে যথারীতি বিদায় নিলাম। ক্যান্টনমেন্টের সর্বত্র স্বাভাবিক অবস্থা। ঘুমন্ত সেনানিবাসে নেমে এলো রাতের অন্ধকার।

ঘটনাবহুল রাত

১৪/১৫ অগাস্টের কালোরাত্রি!

ঘড়! ঘড়! ঘড়!

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে সক্রিয় হয়ে উঠল টু-ফিল্ড রেজিমেন্টের কামানবাহী শকট যানগুলো। ক্যান্টনমেন্টের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত ইউনিট লাইন থেকে ১০৫ এম এম কামানগুলো টেনে নিয়ে চলল ভারি ট্রাকগুলো নতুন এয়ারপোর্ট অর্থাৎ জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের দিকে (পরবর্তীতে হযরত শাহ জালাল (র) আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। এয়ারপোর্টটি তখন চালু হয়নি। সবাই মনে করল কর্তব্যপালনে নিষ্ঠাবান দুটি ইউনিট রাত্রিকালীন ট্রেনিং-এ কর্তব্য পালনে এগিয়ে যাচ্ছে।

রাত দশটা। ক্যান্টনমেন্টের উত্তর প্রান্ত। বেঙ্গল ল্যান্সারের টি-৫৪ ট্যাংকগুলো রাজকীয় স্টাইলে একটি একটি করে গড়িয়ে গড়িয়ে ইউনিট লাইন থেকে বেরিয়ে

পড়ল। তারা এয়ারপোর্টের কাছে মিলিত হল টু-ফিল্ড রেজিমেন্টের সাথে। এয়ারপোর্টের বিরান বিস্তীর্ণ মাঠে সমবেত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দুই শক্তিশালী যান্ত্রিক ইউনিট। ১৮টি কামান, আর ২৮টি ট্যাংকের সংযোগ ঘটেছে ক্যান্টনমেন্টের দক্ষিণ-প্রান্তে। মহা দুর্যোগের ঘনঘটা ঘনিয়ে এলো।

কালো ঘন অন্ধকারে ঢাকা পড়েছে এয়ারপোর্ট। কোথাও এক টুকরো আলো নেই। অন্ধকারে জমে উঠল উর্দীপরা নটরাজদের রক্তাক্ত নাটক। কমান্ডাররা দ্রুত পদে এদিক ওদিক ছুটছে। সৈনিকরা ভালো করে বুঝে উঠতে পারছে না—কী ঘটতে যাচ্ছে? রাত সাড়ে এগারোটার দিকে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলো অভ্যুত্থানের অন্যান্য নায়ক মেজর ডালিম, মেজর নূর, মেজর হুদা, মেজর শাহরিয়ার, মেজর পাশা, মেজর রাশেদ চৌধুরী প্রমুখ। এরা সবাই ছিল উক্ত ইউনিট দুটোর বাইরের অফিসার। বিকাল থেকেই তারা পায়চারি করছে ক্যান্টনমেন্টের আশেপাশে। তারা একে অন্যের সাথে সংযোগ রক্ষা করে চলছিল। সবুজ সংকেত পাওয়া মাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রুপে বিভক্ত হয়ে অপারেশন এরিয়াতে সময় মতোই তারা মিলিত হলো। রাত গড়িয়ে চলল। অন্ধকারে মহাব্যস্ত ফারুক, রশিদ। সৈনিকরা সুশৃঙ্খলভাবে জড়ো হয়ে নির্দেশের অপেক্ষায়। আসল ব্যাপার তারা কিছুই জানে না। ফারুক-রশিদ এখানে ওখানে ছুটাছুটি করে সৈনিকদের উৎসাহ দিচ্ছে—এবার হয় করবো, নয় মরবো। সাবাস গোলন্দাজ। সাবাস ট্যাংকার। তোরাই তো শ্রেষ্ঠ সৈনিক। তোরাই তো দেশের সূর্য সন্তান। দেশ আজ রসাতলে। বিক্রিত ভারতের কাছে। উর্দীপরা গর্বিত সৈনিকরা সব চক্রান্ত নসাৎ করবেই।

ফারুক-রশিদ উভয়েই স্পিরিটেড অফিসার। সৈনিকরা হলো রক্ত মাংসের 'রবোট'। তারা চলে কমান্ডারের নির্দেশে, কোনো যুক্তিতে নয়। কমান্ডারদের নির্দেশে তারা শুধু এগিয়ে যায়, অন্ধভাবে আগুনেও ঝাঁপ দেয়। এক্ষেত্রেও হলো তাই।

রাত সাড়ে বারোটা। আক্রমণ গ্রুপিং।

পনেরো অগাস্টের প্রথম প্রহর। মেজর ফারুক রহমান সকল অফিসারকে এয়ারপোর্টের পাশে অবস্থিত হেড কোয়ার্টার স্কোয়াড্রন অফিসে সমবেত হতে নির্দেশ দিলেন।

অভিযানের চূড়ান্ত ব্রিফিং।

এই প্রথমবার শেখ সাহেবকে উৎখাত করার অভিযান-পরিকল্পনা অংশগ্রহণকারী অফিসারদের সামনে প্রকাশ করা হলো। কমান্ডার মেজর ফারুক টেবিলের ওপর ছড়িয়ে দিলেন ঢাকা শহরের ম্যাপ। কালো ইউনিফরম পরা ফারুক রহমান। পিঠে ঝুলছে স্টেনগান, দৃঢ় চেহারা নিয়ে অভিজ্ঞ কমান্ডারের মতো তিনি তার অপারেশন অর্ডার শুনালেন অফিসারদের। ম্যাপে টার্গেট চিহ্নিত করাই ছিল।

প্রধান টার্গেট ৩২ নম্বর রোডে শেখ সাহেবের বাড়ি সরাসরি আক্রমণ করা হবে। আক্রমণের দায়িত্বে তারই ইউনিটের বিশ্বস্ত অফিসার মেজর মহিউদ্দিন। বাসাকে ঘিরে ধরা হবে দুটো বৃত্তে। (Inner circle and Outer circle)। ইনার বৃত্তের গ্রুপ বাসার উপরে সরাসরি আক্রমণে অংশ নেবে। আউটার বৃত্তের গ্রুপ রক্ষীবাহিনী ও বাইরের যে

কোনো আক্রমণ ঠেকাবে। আউটার বৃত্তের অফিসার থাকবে মেজর নূর ও মেজর হুদা। ২৭ নম্বর রোড, সোবহানবাগ মসজিদ, লেক ব্রিজ এরিয়ায় রোড-ব্লক সৃষ্টি করা হবে। প্রধান টার্গেট শেখ সাহেবের বাসায় আক্রমণের সাথে সাথে একই সময় আক্রমণ চালানো হবে ধানমণ্ডিতে অবস্থিত শেখ ফজলুল হক মনি এবং শেখ সেরনিয়াবাতের বাসায়। ফারুক মেজর ডালিমকে শেখ সাহেবের বাসার আক্রমণে উপস্থিত থাকতে বললেন কিন্তু ডালিম পূর্ব সম্পর্কের অজুহাতে সেই আক্রমণ গ্রুপে না থেকে স্বেচ্ছায় শেখ সেরনিয়াবাতের বাসায় আক্রমণের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন।

গ্রুপ-কমান্ডার মেজর ডালিমকে একটি হেভি মেশিনগান সংযোজিত দ্রুতগতির জিপ দেয়া হলো। সাথে দেয়া হলো প্রচুর অ্যামুনিশন ও গুলি এবং এক প্লাটুন ল্যান্সার সৈন্যসহ একটি বড় ট্রাক।

শেখ মনির বাসায় আক্রমণের দায়িত্বে থাকলেন ফারুকের পরম বিশ্বস্ত রিসালদার মোসলেম উদ্দিন। রেডিও স্টেশন ও ইউনিভার্সিটি, নিউমার্কেট এরিয়ার নিরাপত্তা গ্রহণে থাকেন মেজর শাহরিয়ার। এই গ্রুপটি সম্ভাব্য বি. ডি. আর. আক্রমণ মোকাবেলা করবে। তার সাথে রইলো এক কোম্পানি সৈন্য।

অপারেশনের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল রক্ষীবাহিনীকে প্রতিহত করা। শেখ সাহেবের বাসা যখন আক্রান্ত হবে, তখন প্রবল প্রতি-আক্রমণের আশংকা ছিল সাভার ও শেরেবাংলা নগরে অবস্থিত কয়েক হাজার রক্ষীবাহিনী থেকে। অপারেশন কমান্ডার মেজর ফারুক তার ট্যাংক বাহিনী নিয়ে রক্ষীবাহিনীকে প্রতিহত করার দায়িত্ব স্বয়ং তার কাঁধে গ্রহণ করলেন। ২৮টি ট্যাংক এবং ৩৫০ জন সৈনিক নিয়ে লড়বেন রক্ষীবাহিনীর সাথে, যদিও ট্যাংকের কামানের গোলা তার কাছে ছিল না। তবে তার ট্যাংকগুলোর মেশিনগানগুলোতে মৌজুদ ছিল পর্যাপ্ত গুলি। Dismounted পদাতিক ট্রুপস্ ৩৫০ জন রাইফেলধারী সৈন্যকে সাজালেন রশিদের ইউনিট থেকে ধার নেয়া ১২টি ট্রাকে। তারা মেজর মহিউদ্দিনের নেতৃত্বে প্রধান টার্গেট অভিযানে অংশ নেবে। শেখ মনির বাসায় অভিযানেও তার দুই ট্রাকে দুই প্লাটুন সৈন্য অংশ নেবে।

মেজর রশিদের অবস্থান ছিলো কোথায়? মেজর রশিদের প্রধান কাজ ছিল অপারেশন পরবর্তী অবস্থার সামাল দেয়া ও সার্বিক রাজনৈতিক সমন্বয় সাধন। সে সরাসরি কোনো টার্গেট আক্রমণের দায়িত্বে ছিল না। তার ১৮টি কামান এয়ারপোর্টেই যথারীতি গোলা ভর্তি করে যুদ্ধাবস্থায় তৈরি করে রাখা হলো। কামানগুলোর ব্যারেল রক্ষীবাহিনী হেড কোয়ার্টার ও প্রধান টার্গেট শেখ সাহেবের বাসার দিকে তাক করা। প্রয়োজনমতো কমান্ডারের নির্দেশে টার্গেটের ওপর সেই অবস্থান থেকে ভারি গোলা নিক্ষেপ করা হবে। ৩২ নং রোড এবং রক্ষীবাহিনী হেডকোয়ার্টার রইল দূরপাল্লার কামানগুলোর রেঞ্জের মধ্যেই। শুধু একটি ১০৫ এমএম হাউইটজার কামান আর্টিলারির মেজর মহিউদ্দিনের অধীনে প্রধান টার্গেটের পাশে লেকের ওপারে পজিশন করা হবে। ল্যান্সার ও টু-ফিল্ডের অন্যান্য জুনিয়র অফিসার বসদের নির্দেশে বিভিন্ন গ্রুপে অবস্থান নেয়।

রক্তঝরা অপারেশনের সার্বিক দায়িত্বে বেঙ্গল ল্যান্সারের মেজর সৈয়দ ফারুক রহমান।

অবাক ব্যাপার, ঐ রাতে সমস্ত ঘটনার প্রস্তুতি চলছিল আর্মি ফিল্ড ইনটেলিজেন্স ইউনিটের পাশেই মাত্র কয়েকশ' গজ দূরে। তারা সবাই তখন ব্যারাকে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে।

অভিযান শুরু

রাতের অন্ধকারে সবাইকে তাজা বুলেট ইস্যু করা হলো। সবাই যার যার অস্ত্র নিয়ে তৈরি। 'স্টার্ট টাইম' সকাল ৪টা। ল্যান্সারের সৈন্যদের অ্যামুনিশন ইস্যু করতে দেরি হচ্ছিল। ফারুক ছুটে গিয়ে ধমক দিয়ে কাজ ত্বরান্বিত করালো। ইতিমধ্যে বিভিন্ন গ্রুপ নিজ নিজ কমান্ডারের অধীনে আপন আপন টার্গেটের উদ্দেশ্যে ধানমণ্ডির দিকে যাত্রা শুরু করে দিয়েছে। সৈনিকরা গড্ডালিকার মতো তাদের লিডারদের অনুসরণ করছে। তারা সামনে কি ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে, তখনো কিছুই জানে না। শঙ্কা উত্তেজনায় সবাই কাঁপছে।

ভোর সাড়ে ৪টা

মেজর ফারুক রহমান তার ট্যাংক বাহিনীর ২৮টি ট্যাংক নিয়ে এয়ারপোর্ট রোড ধরে যাত্রা শুরু করলেন। ট্যাংকের ঘড় ঘড় শব্দে সমগ্র ক্যান্টনমেন্ট ও বনানী এলাকা প্রকম্পিত হয়ে উঠল। মসজিদ থেকে তখন মোয়াজ্জিনের আজান-ধ্বনি ভেসে আসছে। বনানীর এম পি চেক পোস্টের কাছে এসে মেজর ফারুক তার লিডিং ট্যাংক নিয়ে ক্যান্টনমেন্টের ভেতর ঢুকে পড়লেন। তিনি ৪৬-তম ব্রিগেডের ইউনিট লাইনের একেবারে ভেতর দিয়ে সংকীর্ণ 'বাইপাস' রোড ধরে শাফায়েত জামিলের পদাতিক ব্রিগেডের আশেপাশের এলাকা কাঁপিয়ে সদর্পে সামনে এগিয়ে চললেন। এতগুলো ট্যাংকের বিকট শব্দে কমান্ডার শাফায়েত জামিলের নিদ্রা ভঙ্গ হওয়ার কথা! কারণ ট্যাংকগুলো এগিয়ে যাচ্ছিল তার বাসার ঠিক পিছন দিকেই।

মাঠে জমায়েত বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকরা পি পি প্যারেডে ছুটাছুটি করছিল। তারা অবাক বিস্ময়ে তাদের লাইনের একেবারে ভেতর দিয়ে ট্যাংকগুলোর সদর্প যাত্রা অবলোকন করছিল। কেউ কেউ হাত নাড়ল, কিন্তু কেউ বুঝতে পারল না মাত্র কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের দ্বারা কী ভয়াবহ ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। ফারুক তার লিডিং ট্যাংক নিয়ে ক্যান্টনমেন্টের বড় রাস্তায় এসে এয়ারফোর্স হেলিপ্যাডের উল্টোদিকে একটি খোলা গেইট দিয়ে অকস্মাৎ ডানদিকে মোড় নিয়ে পুরাতন এয়ারপোর্টে ঢুকে পড়লেন। তাকে অনুসরণ করছিল মাত্র দুটি ট্যাংক। বাকিরা পথ হারিয়ে কমান্ডারকে দেখতে না পেয়ে কিছুক্ষণ ইতস্তত করে সোজা এয়ারপোর্ট রোড ধরে ফার্মগেইটের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

কমান্ডার ফারুক দ্রুত গতিতে যখন পুরাতন এয়ারপোর্টের পশ্চিমপ্রান্তে উপনীত হন, তখন তাকে মাত্র একটি ট্যাংক অনুসরণ করছে। সেটাও বিকল হয়ে থমকে

পড়লো। এতে ফারুক মোটেই ভীত হলেন না। তিনি এয়ারপোর্টের দেয়াল ভেঙে তার ট্যাংক নিয়ে রক্ষীবাহিনী হেডকোয়ার্টারের সামনে উপস্থিত হলেন। সেখানে সারি বেঁধে কয়েকশত রক্ষীবাহিনী সৈন্য অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। একটি ট্যাংকের যুদ্ধংদেহী উপস্থিতি দেখে তারা বেশ ঘাবড়ে গেল। তারা ফ্যাল ফ্যাল করে ট্যাংকের দিকে তাকিয়ে থাকলো। পরেরটুকু ফারুকের ভাষায়ই শোনা যাক :

"আমি আমার ট্যাংক চালককে নির্দেশ দিলাম ধীরে ধীরে সামনে দিয়ে চলতে থাকো। ওরা আক্রমণ করলে সোজা ট্যাংক তাদের উপর তুলে গুঁড়িয়ে দেবে। এছাড়া আমার আর কিছু করবার ছিল না, কারণ ট্যাংকের কামানে গোলা ছিল না। আমি অসহায়, কিন্তু ঘাবড়ে যাইনি। দেখলাম রক্ষীদের তরফ থেকে কোনো আক্রমণাত্মক রিঅ্যাকশন নেই। তারা ভয় পেয়ে গেছে। আমি নিশ্চিন্তে এগিয়ে গেলাম মিরপুর রোড ধরে সাভারের দিকে। কারণ আমার ট্যাংকগুলোকে সাভারের দিক থেকে রক্ষীবাহিনীর আক্রমণ রোধের জন্য মিরপুর ব্রিজের কাছে পজিশন নিতে বলেছিলাম।

আমি দ্রুত ব্রিজের কাছে পৌঁছে কিছু ট্যাংক ওখানেই দেখতে পাই। কিন্তু রক্ষীবাহিনীর কোনো নড়াচড়া দেখতে পাই না। অগত্যা আমি আবার ট্যাংকগুলো নিয়ে শেরেবাংলা নগরের দিকে ফিরে আসলাম। আবার রক্ষীবাহিনী হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে দেখি সেখানে রক্ষী বাহিনীর অফিসাররা কনফারেন্স করছে। আমি সব ট্যাংককে তাদের দিকে ব্যারেল তাক করে রেখে আমি নিজে ট্যাংক থেকে নেমে গেলাম এবং তাদের দিকে অগ্রসর হলাম। এতগুলো ট্যাংক তাদের ঘেরাও করে ফেলেছে দেখে রক্ষী-অফিসাররা ভীষণভাবে ভীত হয়ে পড়লো। তাদের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল হাসান তো রীতিমতো কাঁপছিল। এমনিতেই বেচারা ছিল দুর্বল প্রকৃতির মানুষ।

আমি রক্ষী-কমান্ডার কর্নেল হাসানকে বললাম, সরকার পরিবর্তন হয়ে গেছে, আপনাদের এখন থেকে আর্মিতে ট্রান্সফার করা হয়েছে। আপনারা এখনো নির্দেশ পান নাই? কর্নেল হাসান বললেন : ভাইসাব, আমি তো এসব কিছুই জানি না। তখন আমি তাদের টেলিফোন থেকে তাদের সামনেই সিজিএস ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে ফোন করলাম। তাকে না পেয়ে ডাইরেক্টর মিলিটারি অপারেশন কর্নেল নূরুদ্দিনকে ফোন করলাম। ততক্ষণে অবশ্য রেডিওতে ঘোষণা শুরু হয়ে গেছে। নূরউদ্দীন সাহেবকে বললাম, এদেরকে অবস্থাটা বুঝিয়ে দিতে। তার সাথে কর্নেল হাসানের কথা হলো। তিনি বুঝিয়ে বললেন, এখন অপেক্ষা করুন। চীফের কামরায় মিটিং চলছে। নির্দেশ পরে জানাবো। তখন প্রায় সাড়ে ৮টা বেজে গেছে। আমি রক্ষীবাহিনী ও তার অফিসারদের ঐভাবে আতঙ্কগ্রস্ত রেখে ট্যাংক নিয়ে ৩২ নম্বর রোডের দিকে ছুটে গেলাম।"

৩২নং রোডে আক্রমণ, ট্যাঁ-ট্যাঁ-ট্যাঁ গুডুম গুডুম!

ভোর সোয়া ৫টা।

আক্রান্ত হয়েছে ধানমণ্ডি এলাকায় বিভিন্ন টারগেট পয়েন্ট। চারিদিকে ছুটছে বুলেট। গোলাগুলির শব্দে সমগ্র এলাকা প্রকম্পিত। আক্রান্ত হয়েছে শেখ মনি ও সেরনিয়াবাতের বাসা। মেজর ডালিম ও রিসালদার মোসলেম উদ্দিনের নেতৃত্বে প্রায়

একই সময়ে দুটি বাসা আক্রান্ত হয়েছে। তবে মূল টারগেট শেখ সাহেবের ৩২ নং রোডের বাসার ওপর আক্রমণ শুরু করতে কিছুটা বিলম্ব ঘটছিল। ট্যাকটিক্যাল প্ল্যান অনুযায়ী সৈন্যদের পজিশন করতে এবং কামান, মেশিনগান স্থাপন করতে সময় লাগছিল। হামলাকারীদের নিজেদের মধ্যে কথা কাটাকাটি ও বিভ্রান্তির জন্যও কিছুটা সময় নষ্ট হয়।

আনুমানিক সাড়ে ৫টার দিকে রাষ্ট্রপতি ভবনে আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। প্রথমে গেইটে ঢুকতে গিয়েই গোলাগুলির সূত্রপাত হয়। তারপর তা প্রবল আকার ধারণ করে।

রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে পুলিশ গার্ডরা অবিরাম গুলি চালিয়ে সেনাদের আক্রমণে বাধা দিতে থাকে। এই সময় শেখ সাহেব নিচে বারান্দায় বেরিয়ে আসেন এবং পুলিশদের ফায়ার বন্ধ করতে বলেন। এতে আক্রমণকারী সৈন্যরা বিনা বাধায় বাড়িতে ঢুকার সহজ সুযোগ পেয়ে যায়।

শেখ সাহেব যখন গোলাগুলির মধ্যে আক্রান্ত ছিলেন, তখন তিনি বাসা থেকে বিভিন্ন দিকে ফোন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি তার মিলিটারি সেক্রেটারি কর্নেল জামিলকে ফোনে পেয়েছিলেন। তাকে বলেন, জামিল তুমি তাড়াতাড়ি আসো। আর্মির লোক আমার বাসা আক্রমণ করেছে। শফিউল্লাহকে ফোর্স পাঠাতে বলো। জামিল ফোন পেয়ে তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে তার প্রাইভেট লাল কার হাঁকিয়ে ছুটে যান ৩২ নং রোডে, কিন্তু সৈন্যদের গুলিতে বাসার কাছেই তিনি নিহত হন।

জেনারেল শফিউল্লাহকেও তিনি ফোন করেছিলেন। হয়তো পাচ্ছিলেন না। এক সময় শফিউল্লাহই তাকে পেয়ে যান। শেখ সাহেব বললেন, 'শফিউল্লাহ, আমার বাসা তোমার ফোর্স অ্যাটাক করেছে। কামালকে হয়তো মেরেই ফেলেছে। তুমি তাড়াতাড়ি ফোর্স পাঠাও।'

শফিউল্লাহ বললেন, 'স্যার, Can you get-out, I am doing something.' এরপর তাঁর ফোনে আর তাঁর সাড়া পাওয়া যায়নি। শফিউল্লাহ ফোনে গোলাগুলির শব্দ শুনতে পান। তখনো বেলা আনুমানিক ৫-৫০ মিনিট।

শফিউল্লাহ বিভিন্ন দিকে ফোন করতে থাকেন। প্রথমেই তিনি ফোন করেন ৪৬ ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়েত জামিলকে। তাকে ১ম বেঙ্গল ও ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট মুভ করতে বলেন। শফিউল্লাহ অবশ্য শাফায়েত জামিলকে বেশ কিছুক্ষণ আগেই সোয়া পাঁচটার দিকেই ট্রুপস মুভ করতে বলেছিলেন। কারণ ধানমণ্ডির দিকে ট্যাংক মুভমেন্টের খবর তিনি আনুমানিক সোয়া ৫টার দিকে গোয়েন্দা প্রধান কর্নেল সালাহউদ্দিন মারফত প্রথম অবগত হন। কিন্তু তার নির্দেশ সত্ত্বেও শাফায়েত জামিল তখন কোনো এ্যাকশন নেয়নি।

অন্যদিকে শাফায়েত জামিল বলেছে, 'শফিউল্লাহ আমাকে কোনো নির্দেশ দেননি। তিনি শুধু বিড়বিড় করেছেন, কেঁদেছেন। কোনো এ্যাকশন নিতে বলেননি।'

শেখ সাহেবের ফোন পাওয়ার পর আবার তিনি শাফায়েতকে ফোন করেন, কিন্তু তাকে আর ফোনে পাওয়া যায়নি। ফোনের রিসিভার তুলে রাখা হয়েছিল। অগত্যা

শফিউল্লাহ খালেদ মোশাররফকে ফোন করে তাকে তাড়াতাড়ি তার বাসায় চলে আসতে বলেন, খালেদ পায়জামা পরেই তার গাড়ি নিয়ে ছুটে আসেন। শফিউল্লাহ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে ৪৬ ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে পাঠালেন শাফায়েত জামিলকে দেখতে, সে কী করছে? ৪৬ ব্রিগেড থেকে কেন কোনো ট্রুপ মুভ করছে না শফিউল্লাহও বুঝতে পারছিলেন না, যদিও তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। এরপর শফিউল্লাহ বিভিন্ন দিকে উদভ্রান্তের মতো বিভিন্নজনকে ফোন করতে থাকেন। এয়ার চীফকে, নেভাল চীফকে, জিয়াউর রহমানকে, আমাকেও তিনি ফোন করেন। সময় দ্রুত গড়িয়ে যায়।

মোদ্দা কথা, তিনি সবকিছুই করলেন বটে কিন্তু রাষ্ট্রপতির সাহায্যার্থে একটি সৈন্যও মুভ করাতে পারলেন না। সকাল ৬ ঘটিকা। রেডিও বাংলাদেশ। ভেসে আসল মেজর ডালিমের বজ্রকণ্ঠের ঘোষণা—স্বৈরাচারি শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। হতভম্ব বাংলাদেশ। বিনা মেঘে বজ্রপাত।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় শফিউল্লাহ। তাহলে কী তার নির্দেশ কেউ মানলো না? তিনি কী সংবাদ শুনে ভেঙে পড়েছিলেন? তিনি কী নির্দেশ দিতে ইচ্ছেকৃতভাবে দেরি করছিলেন? নাকি তিনি ছিলেন অসহায়!

মুজিব হত্যাকাণ্ড

মেজর ফারুক যখন রক্ষীবাহিনীকে ঠেকাতে ব্যস্ত, ততক্ষণে সবকটি টার্গেটে বিভিন্ন গ্রুপের ঝটিকা অপারেশন শুরু হয়ে গেছে। মেজর ফারুকের পরিকল্পনা অনুযায়ী আক্রমণকারীরা তিনটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে ভোর পাঁচটার মধ্যেই তিনটি টার্গেট ঘেরাও করে ফেলেছে।

১২টি ট্রাক ও কয়েকটি জিপে করে আক্রমণকারী ল্যান্সার ও আর্টিলারির প্রায় ৫০০ জন রাইফেল ট্রুপস্ ধানমণ্ডির আশেপাশে ছেয়ে গেছে। প্রধান টার্গেট ৩২নং রোডে শেখ সাহেবের বাড়ি। মেজর মহিউদ্দিন, মেজর হুদা, মেজর পাশা, মেজর নূরের নেতৃত্বে আউটার ও ইনার দুটি বৃত্তে ঘেরাও করে ফেলা হয়েছে। মেজর রশিদের নির্দেশে একটি হাউইটজার কামান এনে শেখ সাহেবের বাসার বিপরীতে মাত্র ১০০ গজ দূরে লেকের ওপারে স্থাপন করা হলো। বাসার ওপর আক্রমণকারী ল্যান্সারের সৈন্যরা ৫টি ট্রাকে করে এসে একেবারে বাড়ির প্রধান গেইটের কাছে সশব্দে নামতে শুরু করল। গেইটে ঢুকতে গেলে আর্টিলারীর প্রহরারত সৈনিকরা তাদের বাধা দিয়ে বসল। এ নিয়ে ঐ সময় নিজেদের মধ্যে উত্তপ্ত বাদানুবাদ শুরু হয়ে যায়। একটু আগে মেজর হুদা তার অনুমতি ব্যতীত কাউকে ভেতরে ঢুকতে না দেয়ার নির্দেশ দেয়ায় এই গণ্ডগোল বাঁধে।

গেইটের কাছে গার্ডদের হট্টগোলে শেখ কামাল জেগে যান। তিনি কিছু একটা গণ্ডগোলের আভাস পেয়ে ওপর থেকে স্টেনগান হাতে নিচে রিসিপশন রুমের দিকে ছুটে যান। সেখানে পুলিশের একজন ডিউটিরত অফিসারও ছিলেন। প্রথমে কামাল ভেবেছিলেন হয়তো জাসদ অথবা সর্বহারা গ্রুপের হামলা। কামাল সেখান থেকে সেনারক্ষীদের ব্যবস্থা নিতে বলেন, কিন্তু তারা নিরব থাকে। কামাল এবার আসল

ব্যাপার বুঝতে পারেন। তিনি আক্রমণকারী সৈন্যদের উপর গুলি ছুড়েনে। একজন সেপাই সঙ্গে সঙ্গে নিহত হয়। এরপরই উভয় পক্ষে শুরু হয়ে যায় তুমুল গোলাগুলি, মুহূর্তেই পুরো এলাকা পরিণত হয় রণক্ষেত্রে।

এই সব হট্টগোলে শেখ সাহেব জেগে যান। তিনি এই সময় কারো কারো সাথে ফোনেও কথা বলেন। এমন সময় বাসা লক্ষ্য করে বাইরে থেকে আক্রমণকারী সৈন্যরা গুলি বর্ষণ শুরু করে দেয়। তখন সময় আনুমানিক পাঁচটা। বাসা আক্রান্ত হয়েছে দেখে কর্তব্যরত পুলিশরাও পাল্টা গুলি চালাতে থাকে। ঐ সময় ছাদের উপর থেকেও গুলির প্রত্যুত্তর দেয়া হয়। উভয় পক্ষে তুমুল গোলাগুলিতে মুহূর্তেই পুরো এলাকা পরিণত হয় রণক্ষেত্রে। এ রকম গোলাগুলির মধ্যে শেখ সাহেব অসম সাহসে সশরীরে নিচে নেমে আসেন এবং কর্তব্যরত পুলিশের সাথে কথা বলতে থাকেন। তিনি ধরে নেন এগুলো জাসদ বা সর্বহারা দলের চোরা আক্রমণ। ডিউটিতে রত পুলিশ অফিসার নুরুল ইসলামের ভাষ্য অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু মনে করেছিলেন এবার হয়তো তার সাহায্যার্থে আর্মির লোকজন এসে গেছে তাই। তিনি 'সেম সাইড' হয়ে যাবে মনে করে পুলিশকে ফায়ারিং বন্ধ করতে বলেন। এরপর তিনি উপরে চলে যান।

পর মুহূর্তেই স্টেনগান হাতে শেখ কামাল উপর থেকে নিচে ছুটে আসেন। তিনি গেটের দিকে এগিয়ে গিয়ে আর্মির লোকজনদের ডাকতে থাকেন। হঠাৎ করে আর্মির ৫/৬ জন লোক গেট ঠেলে ছুটে এসে মাত্র কয়েক গজ দূর থেকে কামালের ওপর গুলি বর্ষণ করে। গুলিবিদ্ধ হয়ে 'ওরে বাবারে' বলে ছুটে গিয়ে তিনি রিসিপশন রুমে পড়ে যান। সেখানেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

হামলাকারীরা ডিউটিতে রত ১৪/১৫ জন পুলিশ ও বাড়ির কিছু লোকজনদের ধরে এনে লাইন করে দাঁড় করায় এবং বিক্ষিপ্তভাবে তাদের ওপর গুলি চালায়। একজন পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর ঘটনাস্থলেই নিহত হন। পি.এস. মুহিত গুলিতে আহত হন। এ সময় বাড়ির উপরের তলায় ভীষণ গোলাগুলি ও মেয়েদের আর্ত চিৎকার শুনা যাচ্ছিল। একজন ঘাতক শেখ নাসেরকে ধরে উপর থেকে নিচে নিয়ে আসে। তাকে প্রথমে লাইনে দাঁড় করায়। তিনি কাতর কণ্ঠে বলেন, 'স্যার, আমি রাজনীতি করিনা। কোন রকম ব্যবসা-বাণিজ্য করে খাই। 'তারা তাকে পাশের বাথরুমে নিয়ে যায় এবং গুলি করে। তিনি 'পানি পানি' করে চিৎকার করছিলেন। তখন ঘাতক আবার তার কাছে যায় এবং পানির বদলে বুলেট বর্ষণ করে। এরপর সব স্তব্ধ হয়ে যায়।

এই সময় একজন ঘাতক শিশু রাসেলকে ধরে নিচে নিয়ে আসে। ভীত বিহ্বল রাসেল পি.এস. মুহিতকে চিনতে পেরে ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, 'ভাইয়া, ওরা আমাকে মারবে নাতো?'

'না ভাইয়া মারবে না।'

শিশু রাসেল মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য কাঁদতে থাকে। অতঃপর একজন ঘাতক তাকে উপরে নিয়ে যায় মায়ের কাছে। কিছুক্ষণ পরই বুলেটের একটি বিকট শব্দ। চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায় শিশু রাসেলের সকল কাকুতি মিনতি। সৈনিকরা এত নির্দয় হতে পারে, তা ভাবতেও মনটা বিষিয়ে উঠে।

আধ ঘণ্টার ওপর বাসার উপরে নিচে থেমে থেমে ওখানে বিক্ষিপ্ত গোলাগুলি চলতে থাকে। বহু খাকি ও কালো পোশাকধারী সৈন্য বাড়িতে ঢুকে পড়ে। তারা ছিল আর্টিলারি ও আরমার্ড কোরের সৈনিক। তারা যার যার মতো আইন হাতে তুলে নেয়। তারা যত্রতত্র ইচ্ছামত গুলি চালাতে থাকে।

উপরের তলায় শেখ সাহেবের সাথে সিঁড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঘাতকদের তর্ক বিতর্ক হচ্ছিল। হামলাকারী অফিসারদের নেতা মেজর মহিউদ্দিনকে বঙ্গবন্ধু চড়া সুরে ধমকাচ্ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে মেজর মহিউদ্দিন দারুণ ঘাবড়ে যায়। আক্রমণ অভিযান ঝিমিয়ে আসে। সে আসলে রাষ্ট্রপতিকে ধরে বন্দি করে বাইরে নিয়ে যেতে চাইছিল। এই সময় মেজর হুদাও এসে হাজির হয়। সে কড়া সুরে শেখ সাহেবের সাথে কথা বলে এবং রাষ্ট্রপতিকে তার সাথে নিচে নেমে আসতে বাধ্য করে। তিনি বারান্দার মুখে এসে দাঁড়ান। ঠিক এই সময় মেজর নুর সিঁড়ির গোড়ায় এসে উপস্থিত হলে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। সম্ভবতঃ শেখ মনিকে হত্যা করে রক্তমাখা হাতে ঘাতক মোসলেম উদ্দিনও এই মুহূর্তে মেজর নূরের পাশে উপস্থিত হয়। দুজনই উত্তপ্ত, উত্তেজিত। নিচে পড়ে আছে গুলিবিদ্ধ কামালের মৃত দেহ। এবার আর রক্ষা নাই। একজন ঘাতক উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে উঠে 'Get aside Huda, why are you wasting time?'

পর মুহূর্তেই ঘাতকের স্টেনগান থেকে বেরিয়ে এলো এক ঝাঁক বুলেট। সিঁড়ির ধাপে গড়িয়ে পড়লেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো সিঁড়ি বেয়ে। সিঁড়ির ধাপেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান।

এরপর ঘাতকরা দিশেহারা হয়ে উঠে। তারা ছুটে বাড়ির প্রতিটি কক্ষে কক্ষে পাগলের মতো গুলি ছুড়তে থাকে। নিহত হন বাড়ির প্রতিটি সদস্য। বেগম মুজিব, শেখ নাসের, শেখ কামাল, মিসেস কামাল, শেখ জামাল, মিসেস জামাল, মাস্টার রাসেল। ঘরের ভেতর পরিবারের কেউ আর জীবিত রইল না।

৩২নং রোডের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে বাড়ির উপরের তলায় নিহত হন বেগম মুজিবসহ ৫ জন। সিঁড়িতে রাষ্ট্রপতি মুজিব। নিচ তলায় শেখ নাসের, শেখ কামাল ও জনৈক পুলিশ ইন্সপেক্টর। এদের সবাইকে সরাসরি গুলি করে হত্যা করার পিছনে মেজর নূর, মেজর হুদা ও মেজর পাশা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং মোসলেম উদ্দিনও। কর্নেল জামিলকে গুলি করা হয় বাসার বাইরে। জওয়ানরা হত্যাকাণ্ডে বিশেষ আগ্রহী ছিল না। তারা বাসার ওপর ঢালাও ফায়ারিং-এ অংশ নেয় এবং হুকুম তামিল করে।

অভ্যুত্থানের প্রধান নায়ক মেজর ফারুক এবং মেজর রশিদ মুজিব হত্যাকাণ্ডের ঐ মুহূর্তের প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যেতে চান। তারা বলেন, যেহেতু বাসায় আক্রমণের সময় আমরা সশরীরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম না, সেহেতু স্বচক্ষে কিছু প্রত্যক্ষ না করে প্রকৃত ঘটনার বিবরণ দেয়া বোকামিরই নামান্তর। শোনা কথা সব সময়ই অতিরঞ্জিত হবে। আমরা সবাইকে একই কথা বলেছি, কিন্তু তবু কিছু লেখক আমাদের উদ্ধৃতি দিয়ে মিথ্যা খবর তৈরি করেছে।

তবে মেজর ফারুক আমাকে জানালেন, মেজর মহিউদ্দিন শেখ সাহেবকে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়ে বারবার অনুরোধ করে, কিন্তু তিনি বড় বড় কথা বলে

সময় ক্ষেপণ করতে থাকেন। মহিউদ্দিন তাঁকে কয়েকটি টেলিফোন করারও সুযোগ দেয়। কিন্তু কামাল খামাখা উত্তেজিত হয়ে হঠাৎ গুলি বর্ষণ শুরু করে। এতে আমার একজন সোলজার নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। এরপর আমাদের লোকজন তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করে যোগ্য জবাব দিতে বাধ্য হয়। এই পরিস্থিতিতে শেখ সাহেব গুলিতে নিহত হন।

বাসার ভেতরে অনুষ্ঠিত রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ইতিমধ্যে বিভিন্নজন বিভিন্নসূত্র থেকে নিয়ে বিভিন্নভাবে পত্র-পত্রিকায় আবেগময় ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু প্রায় সব অতিরঞ্জিত বর্ণনায় ভরপুর। শেখ সাহেবের বাসার ভেতরে অভিযানে দু'জন অফিসার জড়িত ছিলেন। মেজর মহিউদ্দিন আরমার্ড এবং মেজর হুদা। মেজর হুদা আক্রমণের প্রথম থেকেই প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। তার সাথে আমার আন্তরিক পরিবেশে কথাবার্তা হয়। তিনি এইভাবে ঘটনার বিবরণ দিলেন। আসুন ঐ শ্বাসরুদ্ধকর মুহূর্ত থেকে ঘটনা কীভাবে গড়িয়ে গেল, প্রত্যক্ষদর্শী মেজর হুদার মুখ থেকেই শোনা যাক :

"মধ্যরাতে মেজর ফারুক আমাদের অপারেশন ব্রিফিং দেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা ভোর ৫টার মধ্যে ৩২ নং রোডের বাসার চতুর্দিকে অবস্থান নেই। তবে আমি একটু আগেই পৌঁছে যাই গার্ডদের সাথে কথা বলার জন্য। বাসার গেইটের সেন্ট্রি-ডিউটি করছিল ফার্স্ট ফিল্ড আর্টিলারির সৈনিকরা। তারা আমাকে চিনতো। আমি অগ্রসর হয়ে তাদের বললাম, দেখ ভাইরা, সরকার পরিবর্তন হয়েছে। শেখ মুজিব এখন আর প্রেসিডেন্ট নন। তাকে আমরা বন্দি করে নিয়ে যাবো। আমাদের সাথে মেজর ডালিম, মেজর পাশাও আছে। বলাবাহুল্য আমরা তিনজনই ঐ রেজিমেন্টের পুরানো অফিসার। ডালিম কমান্ডিং অফিসার ছিলেন, আমি ছিলাম এ্যাডজুটেন্ট। আমার কথায় তারা সবাই রাজি হয়ে গেল। আমি তাদের শান্ত থাকতে নির্দেশ দিলাম, আমার অনুমতি ছাড়া এখন থেকে কেউ যেন বাসার ভেতরে না ঢুকে। এই বলে আমি রোডের পাশে একটি মেশিনগান স্থাপন করতে যাই। এরিমধ্যে মেজর মহিউদ্দিনের নেতৃত্বে বেঙ্গল ল্যান্সারের সৈন্যরা বাসায় পৌঁছে ভেতরে ঢুকতে চেষ্টা করলে তাদের মধ্যে জোর কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে যায়। তাদের চিৎকারে শেখ কামাল সতর্ক হয়ে ওঠেন এবং দোতলা থেকে ছুটে নিচে রিসিপশন রুমে অটোমেটিক রাইফেল নিয়ে অবস্থান নেন, সৈন্যরা বাসা আক্রমণ করতে এসেছে টের পেয়ে তিনি তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করেন। এতে সৈন্যদের একজন নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। দোতলার ওপর থেকেও একই সময় প্রবল গুলিবর্ষণ হতে থাকে। তাদের গুলির প্রত্যুত্তরে উপস্থিত সৈন্যরা সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে অবিরাম গুলিবর্ষণ শুরু করে। এই সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। প্রবল গুলিবর্ষণে রিসিপশন রুমে শেখ কামাল মারা পড়েন। তার সাথে একজন পুলিশ ডি.এস.পি.-ও মারা যান। প্রবল গোলাগুলিতে উভয় পক্ষে লোকজন হতাহত হয়। গোলাগুলি বন্ধ হলে আমি ঘটনাস্থলে ছুটে আসি এবং খোলা গেইট দিয়ে দোতলায় বাসার ভেতর প্রবেশ করি। আমি দোতলার সিঁড়ির ধাপে এসে দেখি শেখ মুজিবুর রহমান সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন। আমাকে দেখেই তিনি চিৎকার দিয়ে ওঠেন, 'তোরা কী চাস, তোরা কী করতে চাস্?'

'আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

শেখ সাহেব আরো রেগে যান, তুই আমাকে মারতে চাস। কামাল কোথায়? তোরা কামালকে কী করেছিস?'

'স্যার, কামাল তার জায়গায়ই আছে। আর আপনি 'তুই তুই' করে বলবেন না। আপনি বন্দি। আপনি চলুন।'

এবার শেখ সাহেব গর্জন করে উঠলেন, কী, তোদের এত সাহস! পাকিস্তান আর্মি আমাকে মারতে পারেনি। আমি জাতির পিতা। আমি বাঙালি জাতিকে ভালোবাসি। বাঙালি আমাকে ভালোবাসে। কেউ আমাকে মারতে পারে না। বেশ কিছুক্ষণ তিনি আবোল-তাবোল বকতে থাকেন।

তখন আমি বললাম, "স্যার, এসব নাটকীয় কথাবার্তা রাখুন। আপনি চলুন আমার সাথে। আপনি বন্দি।"

শেখ সাহেব এবার নরম হয়ে আসেন। বলেন, তোরা আমাকে এইভাবে নিয়ে যেতে চাস। আমার তামাক আর পাইপটা নিতে দে।

এই বলে তিনি তাঁর শয়নকক্ষের দিকে পা বাড়ান। আমিও তাঁর পেছন পেছন যাই। মেজর মহিউদ্দিনও সাথে। আমার হাতে তার তামাকের টিন ও দিয়াশলাই নেই। তখন তাঁকে আর কোনো টেলিফোন করতে বা সময় ক্ষেপণ করতে দেই নাই। কথাবার্তায় মাত্র মিনিট তিনেক সময় নষ্ট হয়। কামরা থেকে বেরিয়ে তাকে নিয়ে আমি সিঁড়ির বারান্দার মুখে উপস্থিত হই। তিনি সামনে, আমি তার একটু পিছনে বাঁ পাশে। মেজর মহিউদ্দিন ও দু'তিনজন সেপাই আমার পিছনে। বারান্দায় নামতে এক পা দিতেই পেছন দিকের সিঁড়ি সংলগ্ন রুমের করিডোরে ঘরের ভেতর থেকে কেউ রাইফেল থেকে আচমকা গুলি ছোঁড়ে। আমার ঠিক পেছনে দাঁড়ানো সেপাই আহত হয়ে পড়ে যায়। আমি মেঝেতে শুয়ে পড়ে পজিশন নেই। শেখ সাহেব দাঁড়িয়েই থাকেন। সিঁড়ির নিচে ৬/৭ ফুট দূরে দাঁড়িয়েছিল কয়েকজন কালো উর্দীপরা সৈনিক। তারাও সঙ্গে সঙ্গে সামনে থেকে এক ঝাঁক গুলিবর্ষণ করে। গুলি শেখ সাহেবের বুকে আঘাত হানে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ধপাস করে সিঁড়ির ওপর পড়ে যান। সৈন্যরা কামরা লক্ষ্য করে আরো গুলি ছুড়ল। এর পরপরই ঘরের ভেতরে বাইরে এলোপাতাড়ি বেশ কিছুক্ষণ গোলাগুলি চলে।

ঘটনাটা ঘটে গেল আমার চোখের সামনে একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে। আমি নিজেই ঘটনার আকস্মিতায় হতভম্ব হয়ে যাই।

শেখ সাহেব তখন মৃত। তার বুক থেকে সিঁড়ি বেয়ে প্রচুর রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। তাকে ঐ অবস্থায় রেখে আমি নিচের দিকে যাই। দেখি সবাই ভয়ে উত্তেজনায় কাঁপছে। আমি তখন কি করি বুঝে উঠতে পারছিলাম না। যে সৈনিকটি আহত হয়েছিল তাকে ধরাধরি করে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করলাম। ঐ সময় বাসার একজন কাজের ছেলের গায়েও গুলি লাগে। তাকেও হাসপাতালে পাঠালাম।

আমি নিচের দিকে তাদের একটু দেখতে গেলাম। এমন সময় দোতলার ঐ রুমের জানালা থেকে হঠাৎ আবার এক ঝাঁক গুলিবর্ষণ করা হলো। এতে গেইটের কাছে দাঁড়ানো বেশ ক'জন সৈনিক আহত হলো। সঙ্গে সঙ্গে আবার চতুর্দিকে গুলিবর্ষণ শুরু

হয়ে গেল। সৈন্যরা উত্তেজিত হয়ে উঠল। একজন সৈনিক সাহসে ভর করে দোতলায় শয়নকক্ষের ঐ কামরার জানালার ধারে পৌঁছে তাজা গ্রেনেড নিক্ষেপ করল। এরপর সব শান্ত হয়ে এলো। কিছুক্ষণ পর আমরা কামরাটির দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলাম। সেখানে দেখি গ্রেনেডের আঘাতে কামরার ভেতরে জড়ো হওয়া সবাই নিহত হয়েছে। তাদের মধ্যে ছিলেন বেগম মুজিব, শেখ জামাল, শেখ রাসেল, বেগম কামাল ও বেগম জামাল।

জামাল গুলিবর্ষণ না করলে এরা সবাই রক্ষা পেয়ে যেতো, কারণ শেখ সাহেব মারা যাওয়ার পর এরা সবাই কামরার ভেতর জীবিতই ছিলেন। গোলাগুলিও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

আমার চোখের সামনে এভাবে ঘটনাগুলো ঘটে গেল। বলা যেতে পারে সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে এবং কামাল, জামালের হঠকারিতায়। আমরা এভাবে তাদেরকে মারতে চাইনি।

হুদা আরো বললেন, মেজর নূর সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা মাথায় শেখ সাহেবকে গুলি করেছে বলে যেসব সংবাদ আমাকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রচার করা হচ্ছে, এসবই সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। মেজর নূর বাসার বাইরে মিরপুর রোডের রক্ষা ব্যবস্থায় ছিলেন। তাকে ঐ সময় ঘটনাস্থলে দেখেছি বলে মনে হয় না। এমনকি কোনো কোনো বইতে রিসালদার মোসলেম উদ্দিন শেখ সাহেবকে গুলি করেছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে সেও ঐ সময় ঘটনাস্থলে ছিল না। মৃত্যুর সময় আমিই শেখ সাহেবের পাশে ছিলাম, ওরা থাকলে তো আমার চোখে পড়া উচিত ছিল। যারা সিঁড়ির নিচ থেকে গুলি বর্ষণ করে তারা আরমার্ড কোরের সৈনিক ছিল। একজন NCO ছিল। তবে তাকে আমি চিনি না। তারা সিঁড়ির উপর করিডোর থেকে গুলি হওয়ায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ব্যালান্স হারিয়ে শেখ সাহেবের প্রতি গুলি বর্ষণ করে বলেই আমার মনে হয়। আমি শেখ সাহেবের বাঁ পাশে ছিলাম। ব্রাস ফায়ারে আমরাও মারা যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল।

শেখ সাহেবের বাসায় অপারেশনের সময় মোট তিন দফায় গোলাগুলি হয়। প্রথমবার গেইটে ঢুকবার সময় শেখ কামালের সাথে। দ্বিতীয়বার দোতলার সিঁড়ির মুখে যখন শেখ সাহেব নিচে নেমে আসছিলেন। তৃতীয়বার দোতলার রুম থেকে যখন শেখ জামাল গুলিবর্ষণ করে। এতে বেশ ক'জন সেপাই হতাহত হয়। তখন আবার গোলাগুলি শুরু হয়। রুমের ভেতর গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়।

শেখ নাসের মারা যান নিচে অন্য একটি কামরায় আলাদাভাবে। তিনি কামরা থেকে বোধহয় মুখ বের করেন। সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর গুলি বর্ষণ করা হয়। আমি দেখিনি। মনে হয় তিনি পরে বাথরুমে ছুটে গিয়ে সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। ঐ মুহূর্তে যুদ্ধ উন্মাদনায় সৈন্যরা বিভিন্ন রুমে ছুটে গিয়ে গুলি ছোঁড়ে, কিন্তু একটি রুম ছাড়া অন্যগুলোতে কেউ ছিলেন না।

কর্নেল জামিল মারা যান বাসা থেকে সামান্য দূরে সোবহানবাগের দিকে যে রোড ব্লক ছিল সেখানে। তাকে বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর না হওয়ার জন্য সৈন্যরা নির্দেশ দেয়। তিনি না-থেমে গাড়ি থেকে নেমে বরং উত্তেজিত হয়ে গালাগালি দেন।

এমতাবস্থায় তার মাথায় গুলি করা হয়। পরে গাড়িটি ঠেলে শেখ সাহেবের বাসায় আনা হয়। কেউ কেউ বলেছে, মেজর নূর তাকে গুলি করেছে। তবে আমার তা মনে হয় না।"

শেখ সাহেবের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হত্যাকাণ্ডের যারা প্রত্যক্ষদর্শী তারা কেউ ভালোভাবে মুখ খুলতে নারাজ। অভ্যুত্থানের অন্যতম নায়ক ও প্রধান প্রত্যক্ষদর্শী মেজর বজলুল হুদা বুকে হাত দিয়ে আমাকে ঐ সময় ঘটনা যেভাবে ঘটেছে তার সঠিক তথ্যই দিয়েছেন বলে আবেগভরে জানালেন।

হত্যাকাণ্ডের ভিন্ন ভাষ্য

হত্যাকাণ্ড— ঘটনার বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত অন্য রকম ভাষ্যও রয়েছে।

"আমিই শেখকে হত্যা করেছি"— উত্তেজনা ও অসতর্ক মুহূর্তে অভ্যুত্থানের অন্যতম নায়ক মেজর নূরকে বঙ্গভবনে তার নিজ মুখেই গর্ব করে একথা বলতে শুনেছেন বেশ ক'জন। ১৫ অগাস্টের পর বঙ্গভবনে নূররা তখন মহা প্রতাপশালী। সবাই তাদের তোয়াজ করতে তৎপর। তখন তারা রেখে ঢেকে কথা বলার তোয়াক্কা করেনি।

বলাবাহুল্য হত্যাকাণ্ডের সাথে বারবার মেজর নূর ও হুদার নাম সরাসরি জড়িত করে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে উল্লিখিত ধরনের সংবাদ পরিবেশিত হলেও তারা কোনোদিন এসবের প্রতিবাদ করেননি।

'আমার নির্দেশে সৈন্যরা চতুর্দিকে ছুটাছুটি করে কামরায় কামরায় গিয়ে হত্যাকাণ্ড ঘটায়।'— এসবই ডাহা মিথ্যা মনগড়া কাহিনী, জানালেন বজলুল হুদা।

দু'-একটি বইতে শেখ সাহেবের হত্যাকারী হিসেবে মোসলেম উদ্দিনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। মেজর হুদা জানান, রিসালদার মোসলেম উদ্দিন সেখানে উপস্থিত ছিল না বরং গোলাগুলি হওয়ার পর রিসালদার সারওয়ারকে তিনি সেখানে দেখেছিলেন।

প্রকৃত অবস্থা হলো, তিনটি বাসাতেই প্রায় একই সময় আক্রমণ শুরু হয়। তবে শেখ মনির বাসার অপারেশন তাড়াতাড়ি সমাপ্ত করে মোসলেম উদ্দিন ৩২ নং রোডে শেখ সাহেবের বাসায় উপস্থিত থাকা মোটেই উড়িয়ে দেয়া যায় না। বরং অনেকেই তাকে সেখানে দেখেছে।

ম্যাসকার্নহাস তার 'লিগেসি অব ব্লাড' গ্রন্থে মুহূর্তটা এইভাবে বর্ণনা করেছেন :

"ফারুক আমাকে বললো, শেখ মুজিবের ব্যক্তিত্ব ছিল অত্যন্ত প্রবল। মেজর মহিউদ্দিন তার ব্যক্তিত্বের কাছে একেবারে নতজানু হয়ে পড়েছিল। ঐ মুহূর্তে নূর চলে না আসলে কি যে ঘটতো, তা আমার আন্দাজের বাইরে।

মহিউদ্দিন তখনো ঐ একই কথা বলে চলছিলো 'স্যার আপনি আসুন'। অন্যদিকে শেখ মুজিব তাকে কড়া ভাষায় ধমকিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় নূর এসে পড়ে। তার হাতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। সে বুঝে ফেলে মুজিব সময় কাটাতে চাইছেন। মহিউদ্দিনকে

একপাশে সরিয়ে দিয়ে নূর চিৎকার করে আবোল তাবোল বকতে বকতে তার স্টেনগান থেকে মুজিবের প্রতি ব্রাসফায়ার করে। শেখ মুজিব তাকে কিছু বলার আর সুযোগ পেলেন না। স্টেনগানের গুলি তার বুকের ডানদিকে একটা বিরাট ছিদ্র করে বেরিয়ে গেল।"

অধ্যাপক আবু সাইয়িদ তার 'বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড' বইতে লিখেছেন, যতদূর জানা যায় সুবেদার মোসলেমউদ্দিন শেখ মণিকে খুন করে এসে সাথে সাথেই বঙ্গবন্ধুকে লক্ষ করে গুলি ছোঁড়ে। বঙ্গবন্ধু থমকে দাঁড়ান, তারপর পড়ে যান সিঁড়ির ওপর। সময় ৫-৪০ মিনিট। পড়ে যাওয়া দেহটার ওপর চলে ব্রাশ ফায়ার।

লেঃ কর্নেল এম. এ. মান্নান ছিলেন একসময় মেজর মহিউদ্দিনের কমান্ডার। তিনি বলেন, বঙ্গভবনে তার কাছে মহিউদ্দিন হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটা ঐ দিন অর্থাৎ ১৫ অগাস্ট দুপুরের দিকে এইভাবে বর্ণনা দেয়—

'মেজর ফারুক আমার ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেন শেখ সাহেবকে গ্রেফতার করে তার কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমি বাসার দোতলায় গিয়ে তাঁকে পেলাম। তখন ফায়ারিং থেমে গেছে। তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, তোমরা কী আমাকে মারতে চাও? আমাকে পাকিস্তানিরা মারতে পারে নাই। বাঙালিরা আমাকে মারতে পারে না। আমি বিনীতভাবে বললাম, না স্যার, আপনাকে শুধু নিতে এসেছি। আপনি চলুন। তিনি খুবই রেগে গেলেন। তিনি কামরায় গিয়ে কয়েক জায়গায় টেলিফোন করলেন। আমি আবার তাকে বললাম, স্যার, এবার প্লিজ চলুন।

তিনি একটু নরম হলেন।

আমরা তাঁকে নিয়ে তাঁর কামরার বাইরে যাই। তিনি তাঁর পাইপ হাতে নিয়ে বারান্দা হয়ে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ান। আমরা তাঁর সাথে একটু পেছনে। ঠিক ঐ সময় নিচে দাঁড়িয়েছিল মেজর নূর ও আরো কয়েকজন সৈনিক, সম্ভবত মোসলেম উদ্দিনও।

হঠাৎ মেজর নূর আবোল তাবোল বলে চিৎকার দিয়ে ওঠে, 'Stop, This bustard has not right to live. Get aside.' সঙ্গে সঙ্গে নূর তার স্টেনগান উঁচু করে শেখ সাহেবের ওপর এক ঝাঁক গুলিবর্ষণ করে। তাঁর বিশাল দেহ সিঁড়ির উপর লুটিয়ে পড়ে।'

রক্তাক্ত ঘটনার আর এক প্রত্যক্ষদর্শী ডাঃ ফয়সল। শেখ জামালের সহপাঠী বন্ধু। যে মুহূর্তে শেখ সাহেবের উপর গুলিবর্ষণ করা হয়, ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি ঘটনাস্থল থেকে মাত্র ১০/১৫ গজ দূরে। চরম মুহূর্তটি তিনি আমার কাছে এইভাবে বর্ণনা করেন:

"ঐ রাতে আমি, শেখ জামাল ও আরো দু'জন বন্ধু পাশের বাড়ির দোতলার বারান্দায় বসে গভীর রাত পর্যন্ত গল্পগুজব করছিলাম আর ক্যারাম খেলছিলাম। এমন সময় ভোররাত আনুমানিক চারটার সময় শেখ সাহেবের বাসার গেইটে হট্টগোল শুরু হয়। ঐ সময় আমাদের নিষেধ সত্ত্বেও জামাল পিছন দিকের দেয়াল টপকে তার বাসার

ভেতরে ছুটে যায়। আমরা বললাম, জামাল যাসনা, সিরিয়াস গণ্ডগোল হচ্ছে। যেতে যেতে সে বলল, বাসায় বউ রেখে আসছি। ও একা ভয় পাবে। সে বাসায় পৌঁছতে না পৌঁছতেই তুমুল গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল।

প্রথমে দোতলার ছাদের ওপর থেকে গেইটের কাছে হামলাকারীদের ওপর গুলিবর্ষণ করার আওয়াজ আসল। সঙ্গে সঙ্গে গেইটের কাছে দু'তিনজন সৈন্য মাটিতে পড়ে যেতে দেখলাম। ব্যাস, এর পরপরই চতুর্দিকে গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। হামলাকারীদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। বাসার উপর বৃষ্টিধারার মতো গুলি আসতে লাগল। যখন গোলাগুলি চলছিল তখনই দেখলাম বাসার পেছন দিকে দোতলায় উঠার সিঁড়ির দরজার কাছে তাদের বেশ ক'জন সৈনিক জড়ো হয়ে উপরে উঠার পাঁয়তারা করছে। সিঁড়িঘরের দরজা খোলা ছিল। পাশের বাসার দোতলার বারান্দা থেকে মাত্র কয়েকগজ দূর থেকে আমি সবকিছুই পরিষ্কার দেখতে পারছিলাম, হঠাৎ লক্ষ করলাম হামলাকারীদের ক'জন সিঁড়ি দিয়ে বাসার ভেতর ঢুকে পড়েছে এবং শেখ সাহেবের সাথে সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়েই তুমুল বাকবিতণ্ডা করছে। শেখ সাহেব চড়া সুরে উত্তেজিত কণ্ঠে তাদের সাথে ধমক দিয়ে কথা বলছিলেন। উত্তপ্ত কথাবার্তা থেকে প্রথমে আমার ধারণা হয়, হয়তো হামলাকারীরা শেখ সাহেবকে কোথাও বন্দি করে নিয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু অকস্মাৎ গোলাগুলি শুরু হয়ে গেলে ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে গেল।

শেখ সাহেব বারান্দায় সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি কামিজ দিয়ে তার চশমা মুছছিলেন। তাঁর মুখে সিঁড়ি ঘরের বাতির আলো পড়ছিল। সিঁড়ি ঘরের লম্বা প্রশস্ত কাচের জানালা দিয়ে আমি তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। তাঁর পাশে পেছনে দু'জন পোশাকধারী লোকও ছিল। তার বাসার একটি চাকরকেও একপাশে দেখলাম। একটু নিচে সিঁড়ির মাঝখানের ধাপে ২/৩ জন পোশাকধারী লোক অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে ছিল। ঐ সময় গোলাগুলি একটু থেমেছে মাত্র। নিচের একজন হঠাৎ উত্তেজিতভাবে শেখ সাহেবকে গালাগালি দিয়ে বকতে শুরু করল। একটি আওয়াজ স্পষ্ট শুনলাম .... Get aside. সঙ্গে সঙ্গে ট্যাঁ-র-র-র! বিকট শব্দে একটি ব্রাস ফায়ার! আমার চোখের সামনেই দাঁড়িয়ে থাকা শেখ সাহেব সিঁড়ির ওপর লুটিয়ে পড়লেন।

পরমুহূর্তেই কয়েকজন সৈন্য বাসার ভেতর পাগলের মতো এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে কামরায় কামরায় গিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়তে শুরু করল। ভয়াবহ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে আমি দারুণ ভয় পেয়ে গেলাম। আমি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে ছুটে বাসার পেছনদিক দিয়ে পালিয়ে গেলাম।

আমার দুঃখ হয়, আমরা ঐ রাতে মজা করে মুরগির রোস্ট খাব বলে চাঁদা করে মুরগি কিনেছিলাম। রোস্ট খাওয়ার ঠিক পূর্বমুহূর্তেই গণ্ডগোল শুরু হলে জামাল ছুটে চলে গেল বাসায়। তার আর রোস্ট খাওয়া হলো না। কে জানতো, সে আর ফিরে আসবে না!" সে ঘরে না গেলে হয়ত বেঁচে যেত।

শেখ সাহেবের বাসায় যখন গোলাগুলি শুরু হয় তখন ভোরের আলো পরিষ্কার।

গোলাগুলির কারণে সমগ্র এরিয়াতে যুদ্ধাবস্থার সৃষ্টি হয়। যে যেদিকে পারে গুলি ছুড়ছিল। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে শেখ সাহেবের বাসা লক্ষ্য করে মেজর মহিউদ্দিন (আর্টিলারি) কামান থেকে মাত্র ১০০ গজ দূরে থেকে সরাসরি প্রথম গোলা নিক্ষেপ করে। গোলা সৌভাগ্যবশত বাসায় আঘাত না করে লেকের পারে এসে সশব্দে আঘাত করে। কামানের গোলার শব্দে সমস্ত এলাকা কেঁপে ওঠে। দ্বিতীয় গোলার ব্যারেল একটু উঁচু করে ছোঁড়া হলো। এবার কামানের গোলা সশব্দে বাসার ছাদের ওপর দিয়ে ছুটে গিয়ে মোহাম্মদপুরে নিক্ষিপ্ত হয়। ওখানে কিছু হতাহত হয়। আরো তিনটি গোলা নিক্ষেপ করা হলো। গোলার শব্দে সৈন্যগণ আরো উত্তেজিত হয়ে উঠল। তারা বাসার ভেতরও ছুটাছুটি করে পাগলের মতো গুলি ছুড়তে লাগল। আশেপাশের লোকজন, পুলিশ, রক্ষীবাহিনীরা মনে করল ট্যাংক থেকে গোলাবর্ষণ করা হচ্ছে।

আমি আর্টিলারীর মেজর মহিউদ্দিনকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা যে কামানের গোলা শেখ সাহেবের বাসা লক্ষ্য করে নিকট থেকে ছোঁড়লে, তার বাড়িতে আঘাত করলে সেখানেতো বেশির ভাগ তোমাদেরই লোকজন গিজগিজ করছিল। ওরাইতো সবাই মারা পড়তো। সে বলল, 'স্যার, এ রকম উত্তেজনার সময় আমাদের কারোমাথায় তখন কী হুঁশ ছিল? নির্দেশ পেয়েছি, ট্রিগার টিপেছি। কী হবে, কী হবে না, ভেবে দেখিনি।

অভিযান সমাপ্ত হলো। রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান মারা পড়লেন। সিঁড়ির ধাপে পড়ে রইল তাঁর রক্তাপ্লুত মৃতদেহ। অভিযানে মারা পড়লেন তাঁর পরিবারের ছোট-বড় সকল সদস্য। শুধু পরিবারের দু'জন সদস্য দেশের বাইরে থাকায় সৌভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে গেলেন। তাদের একজন শেখ হাসিনা অন্যজন শেখ রেহানা।

প্রকাশ্য দিবালোকে রাষ্ট্রপতির বাসভবনে অভিযান। অদূরে নীরব দাঁড়িয়ে রইল প্রস্তুত অবস্থায় তিন হাজার রক্ষীবাহিনী! পুলিশ, বিডিআর রইল ঘুমিয়ে! মজার ব্যাপার, রক্ষীবাহিনীর ৪০/৫০ জন গার্ড ছিল বাসার নিরাপত্তায়। তারা প্রথম সুযোগেই আত্মসমর্পণ করে। তাদের নিরস্ত্র করে ঐখানেই মাটিতে শুইয়ে রাখা হয়।

শেখ সাহেবের মৃত্যু ঠিক কয়টার সময় ঘটে?

সঠিক মুহূর্তটা কেউ বলতে পারছে না। তিনি সর্বশেষ কথা বলেন আর্মি চীফ জেনারেল শফিউল্লাহর সাথে ৫-৫০ থেকে ৬-০০টার মধ্যে। এর কিছুক্ষণ পরেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। অর্থাৎ তিনি ৫-৫৫ মিনিট থেকে ৬-০৫ মিনিটের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন বলে ধরে নেয়া যেতে পারে।

শেখ মুজিবের প্রকৃত হত্যাকারী কে?

ঘটনাবহুল ১৫ অগাস্টের সকালবেলা। দিনটি ছিল পবিত্র শুক্রবার। আক্রান্ত হলো ৩২ নং রোডের ৬৭৭ নং বাড়ি। আক্রমণকারীরা শেখ সাহেবকে বন্দি করে তাঁকে নিয়ে

নিচে নামতে থাকে। তার সাথে মেজর মহিউদ্দিন (আরমার্ড) ও মেজর হুদা। একজন তার বাঁ পাশে, অন্যজন একটু পেছনে। এমন সময় সিঁড়ির ধাপে একটু নিচে দাঁড়ানো ৩/৪ জন সৈনিক বন্দুক উঁচিয়ে বিনা উস্কানিতে সরাসরি রাষ্ট্রপতির উপর গুলিবর্ষণ করল। কারা ছিল ঐ Killer গ্রুপে? কে গুলিবর্ষণ করল শেখ সাহেবের বুক লক্ষ্য করে?

অগাস্ট হত্যাকাণ্ডের ঠিক পরপরই যার নাম মুজিব হত্যার সাথে সবার মুখে মুখে বঙ্গভবনে ও ক্যান্টনমেন্টে উচ্চারিত হলো সে হলো মেজর নূর চৌধুরী ও রিসালদার মোসলেম উদ্দিন। প্রথমত মেজর নূর ঐদিন শেখ সাহেবের বাসার ওপর আক্রমণ গ্রুপেরই অন্যতম সদস্য ছিল। দ্বিতীয়ত, শেখ সাহেব তাকে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়ায় তার ঘৃণা ও আক্রোশ ছিল স্বাভাবিক। উপরন্তু, দ্বিতীয় প্রত্যক্ষদর্শী মেজর মহিউদ্দিন সরাসরি উল্লেখ করেছেন, 'নূরই শেখ সাহেবের ওপর ঠাণ্ডা মাথায় গুলিবর্ষণ করে।'

আমি নিজে যখন শেখ সাহেবের বাসায় ১৫ তারিখ দুপুরে পরিদর্শনে যাই, তখন আমি মেজর পাশা এবং আরো দুজন ল্যান্সার সৈনিককে জিজ্ঞেস করি, শেখ সাহেবকে কে গুলি করেছিল? তারাও তখন মেজর নূর এবং মোসলেম উদ্দিনের কথাই আকারে ইঙ্গিতে উল্লেখ করে। একজন সৈনিক জনৈক এন.সি.ও'র নাম বলে। নামটি এখন স্মরণ করতে পারছি না। আরেকজন বলেছিল, একজন মেজর সাহেব ইংলিশে গালাগালি করে গুলি করেন।

'মোট কথা মোসলেমউদ্দীন অথবা মেজর নূর, এদুজনের একজনের স্টেনগান থেকে গুলি বর্ষিত হয়।'

জেনারেল শফিউল্লাহও মেজর নূরের নামই শুনেছেন বলে আমাকে জানালেন। রশিদ-ফারুক সরাসরি কারো নাম বলতে চায় না। তাদের কথা, আমরা তখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম না। সুতরাং না দেখে কারো নাম নেয়া উচিত হবে না। কিছুদিন আগে আমি যখন ফারুকের সাথে একান্ত সাক্ষাতে আলাপ করছিলাম, তখন আমি তাকে বললাম, দেখ ফারুক, মাস্‌কারেনহাস তার বইতে লিখেছে, তুমি তাকে ইন্টারভিউ দিয়ে বলেছো, মেজর নূরই গুলি করেছে। সঙ্গে সঙ্গে ফারুক উত্তেজিত হয়ে বললো, ও ব্যাটা মিথ্যাবাদী, আন্ধা হাফিজ এটা ওটা যা-তা গল্প বানিয়েছে। আমি তাকে বলেছিলাম, মহিউদ্দিন ছিল আক্রমণ গ্রুপের কমান্ডার। ঘটনার পরপরই সে আমাকে রিপোর্ট দেয় যে মেজর নূর শেখকে হত্যা করেছে। কারণ আমি তাকে যখন জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা উনাকে মেরে ফেললে কেন? তখন সে বলে, সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় হঠাৎ নূর উত্তেজিত হয়ে তার ওপর ফায়ার করে বসে।

এই ছিল ফারুকের স্পষ্ট কথা। দেখা যায় এখানেও মেজর নূরের নামের প্রতিধ্বনি।

প্রকৃত অবস্থা হলো, শেখ সাহেব যখন সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসছিলেন, তখনই তাঁকে থামিয়ে রীতিমতো 'তাক' করে মাত্র ৭ ফুট দূরত্ব থেকে তাঁর বুক লক্ষ্য করেই

গুলি করা হয়। তাঁর বুকে ১৮টি গুলির আঘাত পাওয়া যায়। সবকটিই তাঁর বুকে ও পাঁজরে প্রায় একই স্থানে কাছাকাছি আঘাত করে। কোন গুলিই তাঁর গলা বা মুখমণ্ডলে আঘাত করেনি। তা আমার নিজের চোখেই কাছ থেকে দেখা। এতে প্রতীয়মান হয় যে, একটি স্টেনগান থেকেই তাক করা একঝাঁক ব্রাস ফায়ার সরাসরি তাঁর বুকে আঘাত হানে—তা নূরের স্টেনগান থেকে হোক, আর মোসলেম উদ্দিনের স্টেনগান থেকেই হোক, অথবা হাবিলদারের। অন্যরা তার ওপর ফায়ার করলেও গুলি এদিক সেদিক যায়, শুধু দুটো গুলি তার পায়ে আঘাত করে। একটি গুলি উপরে একজন সৈনিকের গায়েও লাগে।

যাই হোক, যার 'তাক' করা ব্রাস ফায়ারে শেখ সাহেবের বুকে মৃত্যুবাণের মতো আঘাত হানল, সে কে হতে পারে? নিঃসন্দেহে সে ঐ তিন জনেরই একজন। ৮০% সম্ভাবনা মেজর নূর, যার কথা বিভিন্ন সূত্র থেকে বেশিরভাগ লোক উল্লেখ করেছেন। শেখ সাহেবকে ফায়ার করার মুহূর্তে তাঁকে ইংরেজিতে বকাবকি করা হয়। তিনজনের মধ্যে একমাত্র মেজর নূরের পক্ষেই ইংরেজিতে বকাবকি করা সম্ভব ছিল। সিঁড়ির যে স্থানে Killer গ্রুপটি দাঁড়িয়েছিল, সেখানে স্বল্প পরিসর জায়গায় সামনের ২/১ জন ছাড়া তাদের পেছনে অবস্থান গ্রহণকারী অন্যদের শুট করার প্রশ্নই আসে না। তাই ধরে নেয়া যায়, একজনই ঠাণ্ডা মাথায় স্টেনগান 'তাক করে' Get aside বলে ব্রাস ফায়ার করেছিল। বাকিরা বন্দুক উঁচিয়ে থাকলে তারা ফায়ার করতে পারে, নাও করে থাকতে পারে।

এখানে উল্লেখ্য যে প্রত্যক্ষদর্শী মেজর হুদা বলেছিলেন, সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন ঘাবড়ে গিয়ে একসাথে ফায়ার করে, একা কেউ নয়। তার কথা সঠিক বলে ধরে নিলে শেখ সাহেবের বিশাল দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে অসংখ্য গুলির আঘাত পাওয়া যেতো, কিন্তু তাতো ছিল না। শুধু বুকের একটি স্থানেই বুলেটের আঘাত কেন্দ্রীভূত ছিল। যা প্রমাণ করে একজনের 'তাক করা' (Aimed Fire) ব্রাস ফায়ার থেকেই ক্ষতের সৃষ্টি হয়, বহুজনের ফায়ার থেকে নয়।

অতএব বিভিন্ন তথ্য ও সূত্র এবং তাৎক্ষণিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর গুলি বর্ষণকারী ব্যক্তিদের দলে ছিল তিনজন— মেজর নূর চৌধুরী, রিসালদার মোসলেম উদ্দিন ও জনৈক ল্যান্সার NCO. এদের মধ্যে মেজর নূর চৌধুরীর নামই সর্বাগ্রে। তারই তাক করা স্টেনগান থেকে বর্ষিত ব্রাস ফায়ার থেকেই রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হন। এটা মোটামুটি নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া যায়।

শেখ মনি ও সেরনিয়াবাতের বাসায় আক্রমণ

শেখ সাহেবের বাসায় যখন আক্রমণ-প্রস্তুতি চলছিল, তখন অন্যান্য গ্রুপ শেখ সেরনিয়াবাত ও মনির বাসায় আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে।

মেজর ডালিম এক প্লাটুন ল্যান্সার সৈন্য নিয়ে আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাসা আক্রমণ করে ভোর ৫-১৫ মিনিটে। পাহারারত পুলিশকে নিরস্ত্র করার জন্য প্রথমেই এক ঝাঁক গুলিবর্ষণ করা হয় বাসা লক্ষ্য করে। গুলির শব্দে বাসার সবাই জেগে ওঠে। সেরনিয়াবাতের বড় ছেলে হাসনাত আবদুল্লাহ উর্দীপরা লোকজন দেখে দোতলা থেকে তার স্টেনগান দিয়ে গুলিবর্ষণ করে। সেরনিয়াবাত সাহেব জেগে উঠে শেখ সাহেবের বাসায় ফোন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ঠিক এমন সময় আক্রমণকারীরা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়ে এবং সেরনিয়াবাতকে সরাসরি গুলি করে হত্যা করে। ঘরের ভেতর সৈন্যরা নির্বিবাদে যত্রতত্র গুলি চালাতে থাকে। সবাইকে ধরে নিয়ে ড্রইংরুমে জড়ো করে। তারপর নির্দয়ভাবে সবার উপর ব্রাস ফায়ার করে। মারা যান সেরনিয়াবাতের স্ত্রী, পুত্রবধূ, পাঁচ বছরের নাতি, দুই নাতনি, তার ছোট ছেলে, ভাতিজা, আয়া, কাজের ছেলে। চারজন বাইরের অতিথি।

সেরনিয়াবাতের বড় ছেলে হাসনাত আবদুল্লাহ আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে যায়। তার স্টেনগানের গুলি শেষ হয়ে গেলে গোলাগুলির সময় সে লুকিয়ে থাকে। আক্রমণকারীরা তাদের হত্যাকাণ্ড শেষ করার পর প্রস্থান করলে হাসনাত বেরিয়ে এসে পেছনদিকের দেয়াল টপকে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচায়।

রিসালদার মোসলেম উদ্দিন দুই ট্রাক সৈন্য নিয়ে শেখ মনির বাসায় উপস্থিত হয়। তখন ভোর ৫-১০ মিনিট। নিত্যকার অভ্যাসমতো তিনি ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে ড্রইং রুমের দরজা খুলে দৈনিক পত্রিকা পড়ছিলেন, এমন সময় খোলা দরজা দিয়ে মোসলেম উদ্দিন সরাসরি ঘরে ঢুকে পড়ে। শেখ মনি তার দিকে তাকিয়ে তার আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করতে করতেই মোসলেম উদ্দিন সরাসরি অতি কাছ থেকে তার ওপর স্টেনগান থেকে ব্রাস ফায়ারে তাকে হত্যা করে। এই সময় শেখ মনির অন্তঃস্বত্ত্বা স্ত্রী তার সাহায্যার্থে ছুটে এলে মোসলেম তার ওপরও গুলিবর্ষণ করে। প্রচুর রক্তক্ষরণে ধীরে ধীরে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। অতি দ্রুততার সঙ্গে অপারেশন সমাপ্ত করে মোসলেম উদ্দিন আবার তার দলবলসহ শেখ সাহেবের বাসার দিকে রওয়ানা দেয়।

শেখ সাহেবের বাসায় পূর্ণ অপারেশন শুরু হতে কিছুটা দেরি হচ্ছিল। সম্ভবত শেখ মনির বাসায় তাড়াতাড়ি অপারেশন সেরে মোসলেম উদ্দিন ৩২ নং রোডে শেখ সাহেবের বাসায়ও অপারেশনে অংশগ্রহণ করেছিল। যদিও প্রত্যক্ষদর্শী মেজর হুদা তাকে সেখানে দেখতে পাননি বলে জানান।

শাফায়েতের ঘরে মেজর রশিদ

শেখ সাহেবের মৃত্যু সংবাদ আর্টিলারির ওয়্যারলেস সেটে সঙ্গে সঙ্গে জানানো হলো মেজর রশিদকে। সে এই সংবাদের জন্য গভীর উৎকণ্ঠায় সেট খুলে অপেক্ষা করছিল। এই মুহূর্ত থেকে শুরু হলো মেজর আবদুর রশিদের আসল অপারেশন। মিলিটারি

পরিভাষায় যাকে বলে অভিযান পরবর্তী 'Reorganisation and Consolidation phase.'

মেজর রশিদ প্রথমেই ছুটে গেল ৪৬তম ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল শাফায়েত জামিলের কাছে। তার বাসায় পৌঁছে তাকে জাগিয়ে সংবাদ দিল, স্যার 'We have done the job. Sheikh is Killed' তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। এখন আপনি সামলান। সংবাদ শুনে শাফায়েত হতভম্ব হয়ে গেল। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই এরকম একটি বিপজ্জনক সংবাদ শোনার জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

রশিদ মেজর হাফিজকেও সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল। হাফিজুদ্দিন ছিল কর্নেল শাফায়েতের স্টাফ অফিসার। তারা যখন ড্রইং রুমে বসে কথা বলছিল, তখন সেনাপ্রধান জেনারেল শফিউল্লাহর টেলিফোন আসে। একথা মেজর রশিদ আমাকে জানায়। যদিও বিভিন্ন পত্রিকার সাক্ষাৎকারে কর্নেল শাফায়েত বলেছে, শফিউল্লাহ আমাকে সবার শেষে টেলিফোন করেন এবং ফোনের অপর প্রান্তে ক্রন্দনরত অবস্থায় কেবল হা-হুতাশ করেন। সেনাবাহিনী প্রধান এতই ভেঙে পড়েছিলেন যে তিনি কোনো স্পষ্ট নির্দেশই দিতে পারলেন না। আসলে কী তাই? নাকি 'ডালমে কুচ্ কালা হ্যায়'। বলাবাহুল্য, আমার সাথে একান্ত আলোচনায় জেঃ শফিউল্লাহ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, এ সবকিছুই শাফায়েত মিথ্যা বলছে। আমি এর একটু আগেই টেলিফোন করে ট্রুপ মুভ করতে তাকে নির্দেশ দেই। কিন্তু কোনো এ্যাকশন নেয়নি।

কেন কমান্ডার শাফায়েত জামিল কোনো অ্যাকশন নিতে ব্যর্থ হলো? এটা কী ইচ্ছেকৃত, নাকি ভয় পেয়ে গিয়েছিল? নাকি নির্দেশের অভাবে? নাকি সেও ঘটনার সাথে নেপথ্যে জড়িত ছিল? ঘটনা প্রবাহ থেকেই এর প্রমাণ মিলবে।

ওদিকে রেডিও বাংলাদেশ থেকে সকাল ছয়টার অধিবেশন শুরু হতেই মেজর ডালিমের কণ্ঠস্বর ভেসে আসল, **'আমি মেজর ডালিম বলছি, স্বৈরাচারী শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে।'**

ঘটনা দ্রুত গড়িয়ে চলল। কর্নেল শাফায়েতের সাথে কথাবার্তা বলে রশিদ তার আপন ইউনিট লাইনে ছুটে গেল। সেখান থেকে টেলিফোনে বিভিন্ন দিকে যোগাযোগ করার চেষ্টা করল। ওদিকে শাফায়েত জামিল তার স্টাফ অফিসার হাফিজকে সঙ্গে নিয়ে ডেপুটি চীফ জেনারেল জিয়ার বাসায় হেঁটেই যান। উভয়ের বাসা কাছাকাছিই। জিয়া 'হাফ সেভ' অবস্থায় রেবিয়ে এলেন। শাফায়েত তাকে সকাল বেলার ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত করলেন; শুনে জিয়ার স্পষ্ট জবাব, President is dead, so what? Vice-President is there. You should uphold the constitution, Get your troops ready. মুজিব হত্যার সংবাদ শুনে এই ছিল জিয়ার প্রতিক্রিয়া!

জবাব শুনে কর্নেল শাফায়েত জামিল তাকে স্যালুট করে ফার্স্ট বেঙ্গল ইউনিট লাইনের দিকে ধীর পদক্ষেপে রওয়ানা দিলেন। তখন বেলা প্রায় সকাল সাড়ে ছয়টা। শাফায়েত জামিল বেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে কর্নেল রশিদ তড়িৎ গতিতে জিপ চালিয়ে ছুটে এলেন জেনারেল জিয়ার বাসায়। বারান্দায়ই তাদের দেখা হয়। তাদের মধ্যে

সংক্ষিপ্ত কথা হয়। জিয়া বললেন, তিনি এখন শফিউল্লাহর কাছে যাচ্ছেন। সে তাকে বাসায় যেতে ফোন করেছে।

রশিদ সেখান থেকে আবার শহরের দিকে রওয়ানা দিলেন। তিনি ওয়্যারলেসে বিভিন্নস্থানে যোগাযোগ রক্ষা করতে থাকেন। রশিদ আগামাসিহ লেনে খন্দকার মোশতাক আহমদের বাসায় উপস্থিত হন। রাস্তায় 'পথ হারা' একটি ট্যাংক ধরে তার সাথে নিয়ে যান। মোশতাকের সাথে তার আগেই কথাবার্তা হয়েছিল। প্রথমে তিনি রেডিও স্টেশনে যেতে অস্বীকার করেন, রশিদরা যে এরকম একটা কিছু ঘটনা ঘটাবে, তার ইশারা তাকে আগেই দেয়া হয়েছিল। রশিদ যখন জাব্বাজুব্বা পরিহিত অবস্থায় ট্যাংক বন্দুক নিয়ে তার কাছে হাজির হয়, তখন পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুধাবন করে তিনি প্রথমে রীতিমতো ঘাবড়ে যান, তাই তিনি রশিদের সাথে রেডিও স্টেশনে যেতে আমতা আমতা করতে থাকেন। কিন্তু অস্ত্রধারী মেজরের ধাতানিতে তাড়াতাড়ি চোস্ত পায়জামা, কামিজ, টুপি পরিধান করে আল্লাহর নাম জপতে জপতে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন।

ওদিকে মেজর ফারুক রক্ষীবাহিনীকে ঐভাবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় রেখে শেরেবাংলা নগর থেকে ৩২ নম্বর রোডে শেখ সাহেবের বাসায় সব ট্যাংক নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। ধানমণ্ডির বাসার গেইটে পৌঁছে ট্যাংকের উপর থেকেই সে মেজর নূরকে ডাকল। নূর এগিয়ে এসে ইয়াংকি কায়দায় বুড়ো আঙ্গুল উঁচিয়ে তাকে জানালো, 'টার্গেট ফিনিশ। শেখ ইজ ডেড'। ফারুক বলল 'ওকে'। তখন সময় সকাল নটা।

এবার ফারুক ট্যাংকগুলো নিয়ে শহরের দিকে রওয়ানা দিলো। সে বাড়ির ভেতর ঢুকে মৃত শেখ সাহেবকে এক নজর দেখবার কোনো দরকারই মনে করল না। রাস্তার পাশে লেকের ধারে দেখলো ব্রিগেডিয়ার মশহুরুল হক ও কর্নেল শরীফ আজিজকে হাত চোখ বেঁধে আটকে রেখেছে মারবার জন্য। ফারুক তাদের উদ্ধার করল। নিউমার্কেট, ইউনিভার্সিটি এলাকা হয়ে এবার সে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান এলাকায় এসে দেখল ট্যাংকগুলো কমাণ্ডারকে হারিয়ে তার খোঁজে এখানে সেখানে ঘোরাঘুরি করছে। ফারুক ওগুলোকে ধরে ধরে একত্র করে বঙ্গভবন মতিঝিল, কাকরাইল হয়ে সারা শহর কাঁপিয়ে আবার ক্যান্টনমেন্টে ৪৬ ব্রিগেডে ফিরে আসে। চলমান ট্যাংকগুলোর বিকট শব্দে সারা শহরে আতংক ছড়িয়ে পড়ে।

এর আগে মেজর শাহরিয়ার নিউমার্কেট, ইউনিভার্সিটি এলাকায় অবস্থিত রক্ষীবাহিনীর লোকজনদের সাথে আলোচনা করেন এবং তাদের শান্ত থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সরকার পরিবর্তন হয়েছে, আর্মি টেক ওভার করেছে। এখন আমরা সবাই এক। কিছু বুঝে না বুঝেই তারা সুবোধ বালকের মতো শান্ত থাকার প্রতিশ্রুতি দিলো। শাহরিয়ার কিছু সৈন্য নিয়ে নিউমার্কেট ও রেডিও স্টেশন এরিয়া নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। তিনি বেশ কৌশলেই তার দায়িত্ব পালন করলেন। রেডিও স্টেশন কন্ট্রোলে নিতে তার কোনো বেগ পেতে হয়নি। তবে রেডিওতে ঘোষণা দেয়া নিয়ে মেজর শাহরিয়ার ও ডালিমের মধ্যে কিছু বচসা হয়। শেষ পর্যন্ত ডালিম তার

নিজের দায়িত্বেই রেডিওতে মাইকের সামনে বসে শেখ মুজিব হত্যার ঘোষণা প্রচার করে। সেই বিখ্যাত ঘোষণা, 'আমি মেজর ডালিম বলছি, শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে'। সারা দেশ হতবাক!

সকালবেলা এই ঘোষণা দেয়ার জন্য ফারুক অথবা রশিদের কোনো পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। এ কাজটি করেছিল ডালিম তার নিজ উদ্যোগেই। বলাবাহুল্য, মেজর ডালিম কর্তৃক রেডিওতে এই অনির্ধারিত ঘোষণার প্রতিক্রিয়া হয় কামানের গোলার চেয়েও প্রচণ্ডতর। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে অজানা ভয়, ভীতি আর আতঙ্ক। মুজিব সমর্থকগণ দিশেহারা হয়ে এদিক ওদিক ছুটতে থাকে। তাসের ঘরের মতো তাদের সকল প্রতিরোধ ক্ষমতা একমুহূর্তে হাওয়ায় উড়ে গেল। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে তাৎক্ষণিকভাবে দেখা দেয় বিশাল শূন্যতা। রাস্তাঘাট জনশূন্য। কেউ ভয়ে ঘরের বাইরে পা বাড়াচ্ছে না। সবাই রেডিও 'অন' করে ক্রমাগত ডালিমের ঘোষণা শুনতে থাকল, আর পরবর্তী ঘোষণার জন্য উদগ্রীব রইলো। শূন্যতার এই ক্রান্তিলগ্নে প্রধান সমন্বয়কারী ব্যক্তির ভূমিকায় মঞ্চে আবির্ভূত মেজর আবদুর রশিদ। সে ক্যান্টনমেন্টের চতুর্দিকে চরকির মতো ঘুরছে। ওয়্যারলেস ও টেলিফোনে বিভিন্নস্থানে তিন বাহিনীর সাথে যোগাযোগ রাখছে। জেনারেল জিয়া, খালেদ মোশাররফ, শাফায়েত জামিল এদের সাথে কথা বলছে। সবাইকে সহযোগিতার আহ্বান জানাচ্ছে।

এই সময় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল শফিউল্লাহর 'রি-অ্যাকশন' এর ওপর দেশের ভাগ্য বহুলাংশে নির্ভর করছিল। কিন্তু জিয়া, খালেদ মোশাররফ, শাফায়েত জামিলের রহস্যজনক নীরবতাই জেনারেল শফিউল্লাহকে কোনো চরম ব্যবস্থা গ্রহণে নিবৃত রাখে। চরম সন্ধিক্ষণে জেনারেল শফিউল্লার 'নিষ্ক্রিয়তার' এটাই ছিল একমাত্র অজুহাত!

ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের সকালবেলা

সকাল সাড়ে সাতটা। শফিউল্লাহ আর্মি হেডকোয়ার্টারে তার অফিসে বসে মিটিং করছেন। পাশে জেনারেল জিয়া, খালেদ মোশাররফ, কর্নেল নাসিম। কিছুই সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। উদ্‌ভ্রান্ত সেনাপ্রধান।

আমি তখন ঢাকার স্টেশন কমান্ডার। সকাল সাড়ে ছ'টার দিকে তৈরি হচ্ছিলাম অফিসে যাওয়ার জন্য। চায়ের কাপে ধীরে সুস্থে চুমুক দিয়ে বুটের ফিতা বাঁধছিলাম। এমন সময় ক্রিং ক্রিং ক্রিং শব্দে টেলিফোন বেজে উঠলো। কর্নেল আব্দুল্লার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর, স্যার শুনেছেন কিছু?

'নাহ, কী ব্যাপার?'

'রেডিও আছে আপনার পাশে?'

'হ্যাঁ।'

'তাড়াতাড়ি 'অন্' করুন।'

আমি ছুটে গিয়ে রেডিও অন করতেই ভেসে এলো ডালিমের কণ্ঠস্বর 'স্বৈরাচারী শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে।'

আমি ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলাম। হ্যাঁ, কণ্ঠস্বর ডালিমেরই বটে। কিন্তু এটা কী করে সম্ভব! রাষ্ট্রপতি নিহত। এটা কী সেনা-অভ্যুত্থান?

আমি তৎক্ষণাৎ জেনারেল শফিউল্লাহকে ফোন করলাম। ফোন এনগেজ্‌ড। তারপর জেনারেল জিয়ার বাসায় রিং করলাম। ধরলেন বেগম জিয়া। বললাম, ভাবী জিয়াকে দেন। তিনি বললেন, ভাই একটু আগেই সে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেছে। বললাম, কিছু বলে গেছে ও।

"জ্বি না ভাই।"

শুনেই আমি ফোন রেখে তাড়াতাড়ি বুটের ফিতা বেঁধে ইউনিফরম পরে আমার অফিসে রওয়ানা দিতে উদ্যত হলাম। ক্রিং ক্রিং! আবার ফোন। ধরতেই সেনাপ্রধান শফিউল্লাহর কণ্ঠস্বর, হামিদ, তুমি ঘটনা কিছু জানো? বললাম, আমি রেডিওতে এসব কী শুনছি? কিছুই বুঝতে পারছি না। সে বলল, ট্যাংক আর্টিলারি ইউনিট স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে গেল, কেউ কিছু জানেনা। তুমি কিছু জানো? শফিউল্লাহর বিব্রত কণ্ঠস্বর। বললাম, আমি তো কিছুই জানি না, অফিসে যাচ্ছি, সেখানে কিছু খবর থাকলে শীঘ্র তোমাকে জানাচ্ছি। কিন্তু রেডিওতে তো ঘোষণা দিচ্ছে, এটা সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থান। এর মানে কী?

'ড্যাম ব্লাফ।' শফিউল্লাহ ফোন রেখে দিল। তাকে মনে হলো খুবই উত্তেজিত।

আমার জিপ বাইরে অপেক্ষা করছিল। আমি তাড়াতাড়ি অফিসে ছুটলাম। আমার স্টেশন হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে দেখি প্রচুর সৈনিকের ভিড়। তারা সবাই জড়ো হয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। জিপ থেকে নামতেই তারা আমাকে ঘিরে ধরলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, স্টেশন থেকে ট্যাংক ও আর্টিলারি ইউনিট কখন বেরিয়ে গেল, কেউ দেখেছো? আমার সুবেদার সাহেব জানালেন, স্যার ট্যাংক ভোরেই আমাদের পাশ দিয়ে ঐ রাস্তা ধরেই শহরে গেল। ৪৬ ব্রিগেডের ভেতর দিয়ে তো তারা গেল। কেউ তো কিছু বললো না। আর্টিলারি তো আমাদের পাশের ইউনিট। তারা রাতেই বেরিয়ে যায়। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য কেউ বুঝতে পারে নাই। ভোর বেলা ধানমণ্ডির দিক থেকে প্রচণ্ড গোলাগুলির আওয়াজ এসেছে। সকালে রেডিও খুলতেই এই খবর। এখন আমাদের করণীয় কী স্যার?

দেখলাম সবাই বিভ্রান্ত। বিস্মিত। এরকম ঘটনা সেনাবাহিনীতে এর আগে কখনো ঘটেনি। সবাইকে শান্ত থাকতে উপদেশ দিয়ে আমি জিপ নিয়ে আর্মি হেড কোয়ার্টারের দিকে ছুটলাম। ক্যান্টনমেন্টের বড় রাস্তা ধরে জিপ ছুটে চলেছে। অন্যান্য দিন এ সময় রাস্তাটি যথেষ্ট ব্যস্ত থাকে, আজ প্রায় ফাঁকা।

রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল শফিউল্লাহ এবং বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার মার্শাল এ কে খন্দকার।

সদ্য বিবাহিত পুত্র ও পুত্রবধূদের সাথে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান। আগস্ট অভ্যুত্থানের দিন সবাই নিহন হন। ইনসেটে নিহত রাসেল।

মেজর আব্দুর রশিদ

মেজর ফারুক

খন্দকার মোশতাক আহমদ

মেজর হুদা
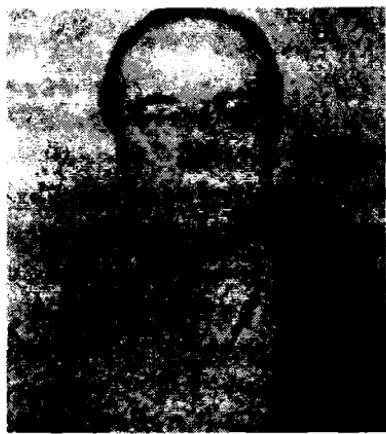
মেজর নূর

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে খন্দকার মোশতাক আহমেদের সাথে মেজর ডালিম

কর্ণেল জামিল

রাষ্ট্রপতি মুজিবুর রহমানের রক্তাক্ত মৃতদেহ

No Grave Yard BANANI

1. Begum Mujib ✓
2. Sheik Naser ✓
3. Sheik Kamal ✓
4. Mrs Kamal ✓
5. Sheikh Jamal ✓
6. Mrs Jamal ✓
7. Master Rasel ✓

---

8. Child no 1 aged 6 Unknown
9. Young Boy. aged 16 do Fair colour
10. child no 2 aged
11 Old lady 40/45
12 Young lady age 15/14
13 ~~Moni~~ Sh. Moni
14 Mrs Moni (?)
15. ~~Young~~ Boy Unknown Black age 25
16 Young Boy Fair age
17. Sarniabout
18 B/o Shikh Moni (?)

বনানী গোরস্থানে দাফনকৃত শেখ পরিবারের সদস্যদের যে ক্রমিক নাম্বার অনুসারে দাফন করা হয় তার অফিসিয়াল রেকর্ড। ঘটনাস্থলে স্টেশন কমান্ডারের নিজস্ব প্যাডে রেকর্ডকৃত পাতার ফটোকপি।

আমি আর্মি হেডকোয়ার্টারের প্রধান গেইটে উপস্থিত হলাম। রোজকার মতো গেইট খোলা। সেন্ট্রি স্যালুট করল। আমি হেডকোয়ার্টারে সরাসরি প্রবেশ করলাম। চীফ অব স্টাফ শফিউল্লাহর অফিসে প্রবেশ পথেই ডাইরেক্টর অব অপারেশন কর্নেল (পরে লেঃ জেনারেল) নূরউদ্দীনের অফিস। সেখানে ১৫/২০ জন সিনিয়র অফিসার জমায়েত হয়ে জটলা করছে। জিপ থেকে নেমে আমিও সেখানে উপস্থিত হলাম। নূরউদ্দীনের কামরায় ঢুকে দেখি তার টেবিলের ওপর একটি রেডিও বাজছে। অফিসাররা গভীর উৎকণ্ঠায় উপুড় হয়ে একই খবর শুনছে। আমি নূরউদ্দীনের কাছে খবর জানতে চাইলাম। সে জানালো, স্যার, আপনি যতোটুকু জানেন, ঠিক ততোটুকুই আমি জানি। আপাতত খবর ঐখানেই। সে তার টেবিলের ওপর রক্ষিত রেডিওটির দিকে ইঙ্গিত করল।

বেলা আটটার দিকে ক্যান্টনমেন্টের প্রায় সব বড় অফিসারই নিজ নিজ ইউনিট থেকে প্রকৃত অবস্থা জানবার জন্যে এক এক করে আর্মি হেডকোয়ার্টারে এসে জড়ো হচ্ছিলেন। আমি নূরউদ্দীনের কামরার বারান্দায় দাঁড়িয়ে বেঙ্গল ল্যান্সার ইউনিটের কমান্ডার কর্নেল মোমেনের (পরবর্তীতে ব্রিগেডিয়ার, রাষ্ট্রদূত) সাথে কথা বলছিলাম, তাকে বলছিলাম, তোমার ইউনিট সব ট্যাংক নিয়ে বেরিয়ে গেল অথচ তুমি কিছুই জানো না। সে বলল, স্যার আমি তো সাত দিনের ছুটিতে। ফারুক সব ট্যাংক নিয়ে শহরে বেরিয়ে গিয়ে এসব কাণ্ড ঘটিয়েছে। আমি তাকে বললাম, এখন তুমি শহরে একটি জিপ নিয়ে দেখে আসো তোমার ছেলেরা কী করছে? সে বলল, আপনার জিপটা দেননা। আমি এক্ষুণি গিয়ে অবস্থা দেখে আসছি। আমি তখন বারান্দায় দাঁড়িয়েই নূরউদ্দীনকে উদ্দেশ্য করে বললাম, আরে ভাই, ওকে একটি গাড়ি দেওনা .... বলতে বলতেই দেখলাম দুটি জিপ কালো ড্রেস পরা সেপাইদের নিয়ে মেইন গেইট দিয়ে শো শো করে দ্রুত বেগে এগিয়ে আসছে। আমি তৎক্ষণাৎ ওদিকে কর্নেল মোমেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, ঐ যে দেখ, তোমার কালো পোশাকওয়ালা লোকরা জিপ নিয়ে এইদিকেই আসছে। একটাকে ধরো। ততক্ষণে জিপটি দ্রুত বেগে বামদিকে মোড় নিয়ে একেবারে চীফ অব স্টাফের কামরার দিকেই ধেয়ে এসেছে।

কর্নেল মোমেন ওদের দেখে তৎক্ষণাৎ বারান্দা থেকে এক পা নেমে গিয়ে একটাকে ধরতে গেল। সে হাতের ইশারায় জিপকে থামতে বলল। আর যায় কোথায়! ব্রেক কষে সশব্দে জিপটি থামতেই এক লাফে উন্মুক্ত স্টেনগান হাতে গলাফাটা চিৎকার করে বেরিয়ে এলো মেজর ডালিম; Shut up, get away from here— বলেই লোডেড স্টেনগান একেবারে কর্নেল মোমেনের দিকে তাক করে ধরলো।

মোমেন তো একেবারে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল। সে আমতা আমতা করে কি যেন বলবার চেষ্টা করল। আমি দুই হাত দূরে থাকায় কোনোমতে বারান্দার ক্ষুদ্র পিলারের পেছনে নিজের শরীরটাকে আড়াল করতে পারলাম। তবুও মোমেনের ওপর ব্রাস ফায়ার করলে আমারও বাঁচার কোনো উপায় ছিল না।

ডালিমের চিৎকার আর স্টেনগানের কড়াক শব্দে এমন ভয়ংকর পরিবেশের সৃষ্টি হলো যে, যেসব অফিসার নূরউদ্দীনের কামরায় জড়ো হয়ে কান পেতে রেডিও শুনছিল,

তারা কোনো কিছু না বুঝেই মহাবিপদ আশঙ্কায় পড়িমরি করে যে যেদিকে পারল প্রাণ নিয়ে দিলো ছুট। এক নিমিষে ১৫/২০ জন অফিসারের জটলা সাফ! তড়িঘড়ি করতে গিয়ে কেউ চেয়ার উল্টালো, কেউ অন্যজনকে মাড়ালো, একজন তো আস্ত টেবিলই উল্টে ফেলে দিল। তোপের মুখে পড়ে মোমেন যখন আমতা আমতা করে কিছু বলছিল, সেই ফাঁকে সুযোগ বুঝে পিলারের আড়াল থেকে আমিও দিলাম ভোঁ দৌড়। বিপদে চাচা আগে আপনা প্রাণ বাঁচা।

সবাই এখানে ওখানে গুটি মেরে পজিশন নিলো। আমিও পজিশন নিয়ে যখন দেখলাম কিছু ঘটছে না, তখন আবার আড়ালে আড়ালে উঁকি ঝুঁকি দিয়ে ঘটনাস্থলে ফিরে এলাম। দেখলাম ল্যান্সারের জিপ দুটি সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। তার ওপর বসে আছে কয়েকজন সেপাই। উদ্যত রাইফেল। যে কোনো মুহূর্তে অনল বর্ষণ করতে প্রস্তুত।

চীফ অব স্টাফ হাইজ্যাক!

মেজর ডালিম চীফ অব স্টাফের কামরায় ঢুকেছে, হাতে তার উন্মুক্ত স্টেনগান। এমতাবস্থায় আমি বিপদের ঝুঁকি নিয়ে শফিউল্লাহর কামরায় ঢুকতে সাহস করলাম না। তখন সেনাপ্রধানের কক্ষে ছিল জেঃ শফিউল্লাহ, জেঃ জিয়া, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, কর্নেল নাসিম (পরে জেনারেল), মেজর হেলাল মোরশেদ (পরে জেনারেল)। ঐ কয়েক মুহূর্ত কামরার ভেতর কি ঘটলো, চীফ অব স্টাফ শফিউল্লাহর মুখেই শোনা যাক :

"আমার অফিসে বসে খালেদ মোশাররফ ও অন্যদের সাথে আলোচনা করছিলাম। তিনি একটু আগেই শাফায়েতের হেডকোয়ার্টার থেকে ফিরেছেন। এমন সময় দড়াম করে দরজা ঠেলে মেজর ডালিম আমার রুমে প্রবেশ করে। উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'চীফ কোথায়?' যদিও ঐসময় আমি তার সামনেই বসেছিলাম। তাকে মনে হলো যেন অপ্রকৃতস্থ। তখন কর্নেল নাসিম তাকে শান্ত কণ্ঠে বলল, তিনি তো তোমার সামনেই বসে আছেন, দেখছো না?

সে তৎক্ষণাৎ আমার দিকে সরাসরি স্টেনগান তাক করে বলে উঠলো, 'প্রেসিডেন্ট আপনার সাথে কথা বলবেন। আপনি আসুন।' আমি আমারই অফিস রুমের ভেতর তার এরকম উদ্ধত ব্যবহার পছন্দ করিনি। তাকে বললাম; দেখো ডালিম, আমি এইসব হাতিয়ার দেখে অভ্যস্ত। তুমি যদি এটা ব্যবহার করতে এসে থাকো, তাহলে ব্যবহারই করো। কিন্তু আমার দিকে এটা তাক করে রাখবে না। ঐ সময় জিয়াও পাশে দাঁড়িয়েছিল।

এরপর ডালিম তার স্টেনগান নিচে নামিয়ে ফেলল এবং বললো, স্যার, প্রেসিডেন্ট আপনার সাথে কথা বলতে চান। প্লিজ আসুন। আমি বললাম, কে প্রেসিডেন্ট?

ডালিম বলল, আপনি নিশ্চয় রেডিও শুনেছেন। আমি তখন তাকে বললাম, তিনি তোমার প্রেসিডেন্ট হতে পারেন, কিন্তু আমার প্রেসিডেন্ট নন। আমার যতক্ষণ পর্যন্ত না ৪৬ ব্রিগেডের শাফায়েত জামিলের সাথে দেখা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ওখানে যাবো না।

আমি তখন ৪৬ ব্রিগেডে তার সাথে যাওয়ার মনস্থ করলাম। জিয়া নিরুত্তর পাশেই দাঁড়িয়ে রইল। এটাই ছিল অফিসের ভেতর সংক্ষিপ্ত নাটক ও বাক্য বিনিময়।"

এবার অফিসের বাইরের ঘটনা দৃশ্যপটে আবার ফিরে আসা যাক। আমি ততক্ষণে উঁকিঝুঁকি মেরে ঘটনাস্থলে ফিরে এসেছি। কিন্তু শফিউল্লাহর অফিসের ভেতরে ঢুকবো কি ঢুকবো না, ইতস্তত করছিলাম। এমন সময় দেখি তার অফিসের দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এলেন জেনারেল শফিউল্লাহ। তার পেছনে পেছনে স্টেনগান হাতে মেজর ডালিম। শফিউল্লাহর মুখ কালো, গম্ভীর। স্পষ্ট বুঝা গেল একান্ত অনিচ্ছায় তিনি ডালিমের সাথে বেরিয়ে আসছেন। ডালিমের পেছনে জেনারেল জিয়া, ডেপুটি চীফ অব স্টাফ। শফিউল্লাহ নিজের স্টাফ কারেই উঠলেন। ডালিম পেছনে। জিয়া তাকে সহাস্যে বললেন, Come on Dalim, in my car.

No Sir, I don't go in General's car. ডালিমের সুস্পষ্ট জবাব, বলেই স্টেনগান উঁচিয়ে তার সশস্ত্র জিপে চড়ে বসলো। ডালিমের পেছনে চললেন জেঃ জিয়া। তার পেছনে ডালিমের দ্বিতীয় সশস্ত্র জিপ। শো শো করে বেরিয়ে গেল চার চারটি গাড়ি। রীতিমতো তোলপাড়! পুরো অপারেশন শেষ হতে সময় লাগলো ৫ থেকে ৭ মিনিট মাত্র।

খোদ আর্মি হেডকোয়ার্টার থেকে আর্মি চীফ অব স্টাফ হাইজ্যাক! অবিশ্বাস্য নাটকীয় ঘটনা। চীফ অব স্টাফকে নিয়ে কন্‌ভয় বেরিয়ে যাওয়ার পর আমরা একে অন্যের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম।

কিছু বুঝে উঠবার আগেই সত্যি কি অদ্ভুত ব্যাপারই না ঘটে গেল! ঘটনাটা নিজেদেরই বিশ্বাস হচ্ছিল না। এবার আমরা যারা ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে ছিলাম, একে অন্যের দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে উঠলাম। মজার ব্যাপার, রেডিওতে তখনও ক্রমাগত মেজর ডালিমের ঘোষণা চলছিল। অথচ ডালিম তখন আর্মি হেডকোয়ার্টারে।

আসলে সকাল থেকে সমস্ত ব্যাপারই ছিল অনিশ্চয়তা, উত্তেজনায় ভরপুর। প্রেসিডেন্টের হত্যাকাণ্ডের মতো আকস্মিক ঘটনায় সবাই ছিল কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তড়িৎ এ্যাকশনের বদলে চলছিল ক্লোজ ডোর মিটিং, সলাপরামর্শ। আর্মি হেডকোয়ার্টারে ঢুকে সবার চোখের সামনে একেবারে আর্মি চীফ অব স্টাফ হাইজ্যাক! তাজ্জব ব্যাপার! এসব দেখে আমার নিজেরই মাথা বন্‌বন্‌ করছিল। যেন বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়ে গিয়েছিল। আমি আর বিলম্ব না করে আমার জিপ ডেকে স্টেশন হেডকোয়ার্টারের দিকে রওয়ানা দিলাম।

আর্মি হেডকোয়ার্টার থেকে সেনাপ্রধানের কনভয় সোজা ৪৬ ব্রিগেডের ফার্স্ট বেঙ্গল ইউনিট লাইনসে গিয়ে উপস্থিত হলো। একজন জুনিয়ার অফিসার ক্যাপ্টেন হাফিজুল্লাহ সেখানে দাঁড়িয়েছিল। সে 'চীফ অব স্টাফকে' অভ্যর্থনা করে কমান্ডিং অফিসারের কামরায় বসাতে নিয়ে যায়।

ফার্স্ট বেঙ্গল লাইনে শফিউল্লাহ যখন পৌঁছেন, তখন সেখানে অভ্যুত্থানের নায়ক মেজর রশিদও উপস্থিত ছিল। তার সাথে আশেপাশে বিদ্রোহী সৈন্যদের কিছু অংশ এবং দুটি ট্যাংকও ছিল। শফিউল্লাহ দেখেন ৪৬ ব্রিগেডের সৈন্যরা আশেপাশে হৈ চৈ

করছে। তার সামনেই নাকি ৪৬ ব্রিগেডের একজন অফিসার রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবের ফটো নামিয়ে মাটিতে আছাড় মেরে ভেঙে ফেলল।

সেনা বাহিনী প্রধান কর্নেল শাফায়েত জামিলের হেডকোয়ার্টারে উপস্থিত। সেখানে উপস্থিত অভ্যুত্থানের নায়ক মেজর রশিদ, মেজর ডালিম। নেই শুধু ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়েত জামিল। শফিউল্লাহ টেলিফোনে এয়ার চীফ এবং নেভাল চীফকে বেঙ্গল লাইনে আসতে অনুরোধ করলেন। তার আশেপাশে তখন সব জুনিয়ার অফিসার। এমন সময় মেজর রশিদ অত্যন্ত বিনীতভাবে তার কাছে এগিয়ে এসে বলল, স্যার, রেডিও স্টেশনে চলুন। সবাই ওখানে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

কর্নেল শাফায়েতের ব্রিগেড মেজর হাফিজউদ্দিনও রশিদের সাথে যোগ দিয়ে তাকে রেডিও স্টেশনে যেতে অনুরোধ করতে শুরু করল। শাফায়াত কিন্তু তখনো ধারে কাছে আসছে না। ঠিক ঐ মুহূর্তে কোথায় ছিল তার অবস্থান? কার সাথে তখন সে পরামর্শ করছিল? এসব জানা যায়নি।

বিভ্রান্ত চীফ অব স্টাফ!

মজার ব্যাপার সেনাসদর থেকে শফিউল্লাহর পেছন পেছন একসাথে এলেও হঠাৎ ৪৬ ব্রিগেড লাইনে এসে জিয়া মোড় ঘুরে অন্যদিকে চলে যান, খুব সম্ভব শাফায়েতের কাছে। তিন বাহিনীর প্রধান সেখানে ফার্স্ট বেঙ্গল লাইনে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় লিপ্ত হলেও সেখানে জিয়া এবং শাফায়েত ছিলেন অনুপস্থিত। সেনাসদর থেকে শফিউল্লাহ ৪৬ ব্রিগেড লাইনসে আসেন শুধু শাফায়েতের সাথে কথা বলার জন্য, অথচ সেখানে পৌঁছে দেখেন শাফায়েত তার ধারে কাছেই আসছে না। দূরে দূরে পায়চারি করছে। পরে শফিউল্লাহ আমার কাছে স্বীকার করেন যে, আসলে ঐ গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে শাফায়েত জামিলের নিষ্ক্রিয়তাই তাকে কোনো এ্যাকশনে যেতে বিরত থাকতে বাধ্য করে। কেন ঐ সময় শাফায়েত জামিল নিষ্ক্রিয় থাকলো? ঘটনাপ্রবাহ থেকেই এর জবাব খুঁজে পেতে হবে। শুধু শাফায়েত নয়, ঐ নাজুক মুহূর্তে, প্রকৃতপক্ষে জিয়া, খালেদ মোশাররফ, শাফায়েত জামিল এই তিনজনের রহস্যজনক ভূমিকা শফিউল্লাহকে বিভ্রান্ত করে।

ইতিমধ্যে রিয়ার অ্যাডমিরাল এম এইচ খান এবং এয়ার মার্শাল খন্দকারও সেখানে পৌঁছে গেছেন। তিন বাহিনী প্রধান সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বসলেন।

অভ্যুত্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত সকাল ১০.০০ ঘটিকা। সারাদেশে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা।

সেনাপ্রধানের সামনে দুটি পথই খোলা ছিল। এক. ৪৬ ব্রিগেড ট্রুপস্ নিয়ে শহরে বিদ্রোহী দুটি ইউনিটের উপর আঘাত হানা এবং মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া।

দুই. পরিবর্তনশীল অবস্থা মেনে নেয়া।

রক্তপাত ও সংঘর্ষ এড়াতে জেনারেল শফিউল্লাহ দ্বিতীয় পথই বেছে নিলেন। আধ ঘণ্টার বেশি তিন বাহিনী প্রধান শাফায়েতের ৪৬ ব্রিগেড লাইনসে ছিলেন, এরপর তারা সেখান থেকে শাহবাগে অবস্থিত রেডিও অফিসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

ইতিমধ্যে মেজর রশিদ ডালিমকে সেখানে রেখে দ্রুতবেগে আগামাসিহ লেনে খন্দকার মোশতাক আহমদের বাসায় ছুটে গিয়েছে। তিন চীফ রেডিও স্টেশনে

পৌঁছবার আগেই তাকে নিয়ে রশিদ সেখানে পৌঁছে যায়। মোশতাক সেখানে তিন বাহিনী প্রধানের আগমনের অপেক্ষায় বসে রইলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মেজর ডালিম তাদের নিয়ে রেডিও স্টেশনে পৌঁছল। ঘড়ির কাঁটার সাথে তাল মিলিয়ে চলছে ঘটনাপ্রবাহ। প্রতি মিনিটে ধাপে ধাপে পরিস্থিতি পরিবর্তন।

রেডিও স্টেশনের অভ্যন্তরে খন্দকার মোশতাক আহমদ তিন বাহিনী প্রধানকে সাদর অভিনন্দন জানালেন। সেনাবাহিনীর বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য কন্‌গ্রাচুলেশন্স জানালেন। অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা চলল। ঝানু পলিটিশিয়ান খন্দকার মোশতাক। তিনি প্রেসিডেন্ট পদগ্রহণের পূর্বে শর্ত আরোপ করলেন। সশস্ত্র বাহিনী প্রধানরা তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবেন। তত্ত্বাবধায়ক বেসামরিক সরকার গঠন করা হবে। যথাশীঘ্র ইলেকশন দেয়া হবে। তবেই তিনি সিংহাসনে আরোহণ করবেন। ফারুক-রশিদের ট্যাংক ও আর্টিলারি সৈনিকবৃন্দ কর্তৃক ঘেরাও রেডিও স্টেশন। চারিদিকে অস্ত্রের ঝনঝনানি। ভেতরে ভীমরুলের ফাঁদে আটকে পড়া অসহায় সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধান। উন্মুক্ত অস্ত্র কাঁধে ক্যু-মেজরদের দ্রুত পদচারণা।

তিন প্রধান সব কিছুই মেনে নিলেন। ঐ পরিস্থিতিতে এছাড়া তাদের করবারও আর কিছু ছিলো না। তারা এক এক করে রেডিওতে রশিদ, ফারুক মনোনীত প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমেদ-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেন। মোশতাকের পক্ষে তাহেরউদ্দিন ঠাকুর খসড়া বানালেন। রেডিও বাংলাদেশ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সদর্পে বারবার তাদের আনুগত্য ঘোষণা প্রচার করে চললো। তখন বেলা সাড়ে ১১টা।

অভ্যুত্থানের সাফল্যের পথে এ মুহূর্তটা ছিল একটি বিরাট 'Turning Point'। এক অস্বস্তিকর অবস্থার অবসান। প্রকৃতপক্ষে ১৫ অগাস্টের সকাল ৫টা থেকে ১১টা, এই সময়টুকু ছিল অত্যন্ত নাজুক ক্রান্তিলগ্ন। এই সময়ের প্রতিটি সিদ্ধান্ত ঘটনার মোড় এক খাত থেকে অন্য খাতে প্রবাহিত করছিল। সারা দেশের ভাগ্য ঝুলছিল অতি ক্ষীণ সূতোয়!

৪৬ ব্রিগেডে উল্লাস

সময় ১১-৪৫ মিনিট। ৪৬ ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার। সি জি এস ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ সেখানে বসে সমস্ত অপারেশন পরিচালনা করছেন। তার টেলিফোন এলো আমার কাছে। সেখানে পৌঁছতে বললেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সেখানে পৌঁছে দেখি ৪৬ ব্রিগেডের প্রায় সব অফিসারই সেখানে উপস্থিত। জমজমাট ব্যাপার।

সবাই উল্লাস করছে। কর্নেল শাফায়েত জামিলও সেখানে। চোখেমুখে তার রিজয়ের হাসি। যেন তার ব্রিগেডই লঙ্কা জয় করেছে! আমার সাথে সজোরে হাত মিলিয়ে বলল, 'দেখলেন স্যার, ফ্রিডম ফাইটার্স হ্যাভ ডান ইট্ বিফোর, অ্যান্ড দে হ্যাভ ড্‌ান ইট এগেইন।'

আমি তার কাছ থেকে ব্রিগেডিয়ার খালেদের রুমে ঢুকলাম। তিনি ভীষণ ব্যস্ত। ইশারায় চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন। ফোনে রক্ষীবাহিনী কমান্ডারের সাথে সাভারে

কথা বলছেন, 'আরে বাবা সারেন্ডার নাও, কাম্ হিয়ার অ্যান্ড সী এভরি ওয়ান ইজ হিয়ার। ইট্ ইজ অল্ ওভার'। তিনি রক্ষীবাহিনীর একজন উর্ধ্বতন অফিসার সম্ভবত কর্নেল সাবেহ উদ্দিনের সাথে কথা বলছিলেন।

আমার সাথে একগাল হেসে খালেদ হাত মেলালেন। বললেন, হামিদ ভাই, স্টেশনের অবস্থা কেমন? বললাম, লেটেস্ট খবর তো দেখছি এখানেই। তিনি বললেন, ইট ইজ অল আন্ডার কন্ট্রোল। তবে সিচুয়েশন খুবই অনিশ্চিত। যে কোনো কিছু ঘটতে পারে। আপনি স্টেশন সিকিউরিটি প্ল্যান তাড়াতাড়ি তৈরি করে এসে আমার সাথে আলোচনা করুন। আবার টেলিফোন এলো। এবার তিনি এয়ার ফোর্সের সাথে কথা বলছিলেন, দুটি ফাইটার জেট পাঠিয়ে সাভারে রক্ষীবাহিনীর উপর 'Show of Force' করতে বললেন। একই সাথে ফ্লায়িং ক্লাবের সাথে যোগাযোগ করে মেজর আমসা আমিন (পরে জেনারেল) ও ক্যাপ্টেন মুনীরকে ফ্লায়িং ক্লাবের একটি প্লেনে উড়ে গিয়ে সাভারে রক্ষীবাহিনীর লোকজনদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে বললেন এবং বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন নির্দেশ দিলেন।

বারান্দায় তুমুল কোলাহল। তাঁর ব্যস্ততা দেখে আমি উঠে পড়লাম। শাফায়েতের অফিসে বসেই তিনি সার্বিক সিচুয়েশন কন্ট্রোল করছিলেন। কামরার বাইরে এসে বারান্দায় দেখি কালো ব্যাটল ড্রেসে মেজর ফারুক। কাঁধে তার স্টেনগান। মুখে তৃপ্তির হাসি। সবাই তার সাথে হাসিখুশিতে হাত মেলাচ্ছে। সবাই তার সাফল্যে অভিনন্দন জানাচ্ছে। কনগ্রাচুলেশন! কনগ্রাচুলেশন! আমার সামনে আসলো সে, হাত মেলালাম, বললাম, ফারুক, তোমার স্টেনগানটায় গুলি আছে বাবা, নাকি ফাঁকা? বিরাট হাসি দিয়ে বলল, স্যার, এটাতে অবশ্যই আছে। তবে বিশ্বাস করুন, সকালে যে ট্যাংক নিয়ে বেরিয়েছিলাম তাতে একটিও সেল ছিল না। একেবারে খালি। বলেই সে হাসতে থাকল। আমি বললাম, তোমার ট্যাংকগুলো এখন কোথায়? সে বলল, সব আমি ক্যান্টনমেন্টে ফিরিয়ে এনেছি। দেখুন গিয়ে।

ততক্ষণে রেডিওতে নিজ নিজ কণ্ঠে বারবার তিন বাহিনী প্রধানের আনুগত্য ঘোষণা হচ্ছে। তাদের সাথে বি.ডি.আর প্রধান মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান এবং পুলিশ প্রধানের আনুগত্য ঘোষণাও প্রচার হতে লাগল। সর্বত্র খুশির হিল্লোল।

হত্যা পরবর্তী সমস্ত প্রোগ্রামের দায়িত্বে ছিল মেজর আব্দুর রশিদ। চতুর্দিকে ছোটাছুটি করে সে তার দায়িত্ব সুচারুরূপেই পালন করল। এই সময় কোথাও সামান্যতম দুর্বলতা প্রকাশ পেলে তাদের অভ্যুত্থান ব্যর্থ হতো। অভ্যুত্থানের মূল নেতা মেজর ফারুক রহমান টার্গেট আক্রমণ করে ধ্বংস করেই খালাস। মেজর রশিদ যখন স্থিতিশীল অবস্থা ফিরিয়ে আনতে গলদঘর্ম হয়ে ছুটছিল, ফারুক তখন তার পিছনে এক ডজন ট্যাংক নিয়ে হাঁকিয়ে সারা শহর চষে বেড়াচ্ছে। ট্যাংকের ঘড়ঘড় শব্দে সারা শহর কেঁপে উঠছিল। সবাই ধরে নিয়েছিল এটা সামরিক বাহিনীর অভ্যুত্থানই বটে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এটা সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থান ছিলো না। সেনাবাহিনীর মাত্র দুটি ইউনিটের ৯০০ শত সৈনিক এতে অংশগ্রহণ করে, তাও তারা কিছু না বুঝেই। এই অভ্যুত্থানের সাথে সেনাবাহিনী প্রধান বা অন্যকোনো সিনিয়ার অফিসারও সরাসরি জড়িত ছিলেন না।

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারগুলো একটির পর একটি এমন নাটকীয়ভাবে ঘটে গেল যেন হিন্দি মারপিট মার্কা ছবির নায়ককেও বুঝি হার মানায়!

মোশতাকের ট্যাংক মিছিল ও শপথ গ্রহণ

দুপুর বেলা জুম্মার নামাজের আগেই খন্দকার মোশতাক আহমদ বিরাট মিছিল সহকারে বঙ্গভবনে পৌঁছলেন। তার পতাকাবাহী গাড়ির আগে পিছে দুটি করে চারটি ট্যাংক, কয়েকটি সামরিক ট্রাক, জিপ, অনেক কার। রেডিও স্টেশন থেকে প্রেস ক্লাবের সামনে দিয়ে লম্বা মিছিলটি শান-শওকতের সাথেই বঙ্গভবনে প্রবেশ করল। এমন অভিনব ট্যাংক মিছিল ইতিপূর্বে কেউ কখনো দেখেনি।

সবাই বঙ্গভবনে একত্রে জুম্মার নামাজ আদায় করে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করলেন। জুম্মার নামাজের পর তিন বাহিনী প্রধান, পুলিশ, বিডিআর এবং অন্যান্য সিভিল গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সামনে খন্দকার মোশতাক আহমদ শপথ গ্রহণ করলেন। উপস্থিত সবাই ছুটে গিয়ে তাকে অভিনন্দন জানাল। এরপর মোশতাক আহমদ তার নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ গ্রহণ করান। প্রায় সবাই পুরাতন মাল। তিনি নতুন বোতলে পুরাতন মদ ভরে দিলেন। পুরাতন আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার কয়েকজন বাদে সবাইকে নিয়েই নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। সবাই খুশি।

শেখ সাহেবের লাশ তখনো ৩২ নং রোডের বাসার সিঁড়িতে পড়ে আছে। তার কথা সবাই ভুলেই গেছে। বঙ্গভবনে চলছে আনন্দ-উল্লাস, খানাপিনা!

দুপুরে ৪৬ ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে যখন হাসিখুশি উল্লাস চলছিল, তখন রেডিও স্টেশনে আনুগত্য পর্ব সেরে সেনা, নৌ, বিমান বাহিনী প্রধান, বিডিআর প্রধান, পুলিশ প্রধান এরা সবাই ক্যান্টনমেন্টে আর্মি হেডকোয়ার্টারে স্ন্যাকস্ খাওয়ার জন্য জমায়েত হন। মেজরদের ঘেরাও থেকে মুক্ত হয়ে তারা কিছুক্ষণ মুক্ত পরিবেশে হালকা আলোচনায় লিপ্ত হন। তারপর আবার বঙ্গভবনে ছুটে যান।

দুপুরে আমার অফিসে বসে স্টেশন সিকিউরিটি প্লান বানাচ্ছিলাম। এমন সময় জেনারেল শফিউল্লাহর ফোন এলো। তিনি আমাকে তাড়াতাড়ি শহরের অবস্থাটা দেখে আসতে বললেন। ১৪৪ ধারা জারির প্রয়োজন আছে কি-না তাকে অবগত করতে বললেন। সেই সাথে ৩২ নম্বর রোডের অবস্থাটাও দেখে আসতে বললেন। আমি সিকিউরিটি প্ল্যানের একটা খসড়া দাঁড় করিয়ে আমার স্টাফ অফিসারকে মোসাবিদা করতে বলে জিপ নিয়ে শহরের দিকে ছুটলাম।

এয়ারপোর্ট রোড ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। রাস্তাঘাট ফাঁকা। সবাই ভীত সন্ত্রস্ত। মোড়ে মোড়ে জটলা। ফাঁকা রাস্তা বেয়ে একটি মাত্র জিপই বীরদর্পে সশব্দে এগিয়ে যাচ্ছিল। আওলাদ হোসেন মার্কেট, ফার্মগেট দিয়ে যাওয়ার পথে বিভিন্নস্থানে আর্মি জিপ দেখে লোকজন হাত নেড়ে শ্লোগান তুলল, আল্লাহু আকবর! সেনাবাহিনী জিন্দাবাদ! একদিনেই এতো পরিবর্তন। অথচ গতকালও পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। কি অবাক কাণ্ড!

তবে আমার বুঝতে অসুবিধা রইল না যে পরিবর্তিত অবস্থাকে সাধারণ মানুষ

মেনে নিয়েছে। কোনো বড় রকমের গণ্ডগোল হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। আমি ১৪৪ ধারা জারির পক্ষে কোনো যুক্তি দেখতে পেলাম না।

গ্রীন রোড ধরে ৩২ নম্বর রোডে গিয়ে পৌঁছলাম। আশেপাশে রাস্তাঘাটে কোথাও লোকজন নেই। সর্বত্র পোশাকধারী সৈনিকদের আনা-গোনা। তারা বাড়ি ঘেরাও করে রেখেছে।

রক্তাক্ত বাড়ি

৩২ নম্বর রোডের মুখে ঢুকতে প্রহরারত সৈনিকরা আমার জিপ আটকালো। আমার পরিচয় দিলে তারা রাস্তা ছেড়ে দিল। শেখ সাহেবের বাসার গেইটে দাঁড়িয়ে মেজর পাশা ও মেজর বজলুল হুদা। পাশা এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানাল। বাড়ির দেয়ালে বুলেটের ক্ষত-বিক্ষত দাগগুলোর দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে যথেষ্ট ফায়ারিং হয়েছে না-কি?

মেজর পাশা বললো : বলেন কি স্যার, হেভি ফায়ারিং, রীতিমতো যুদ্ধ। বাসার ভেতর থেকে তারাই আগে ফায়ার করে। দেখুন কতো হাতিয়ার।

আমাকে সে গেইটের পাশে লেকের ধারে সাজিয়ে রাখা হাতিয়ারগুলোর দিকে নিয়ে গেল। দেখলাম ২০/২৫টা চাইনিজ রাইফেল, স্টেনগান, মেশিনগান, গ্রেনেড, এমনকি একটি এন্টি-এয়ারক্রাফট ভারি মেশিনগানও রয়েছে। আমি মনে মনে ভাবলাম, এতগুলো ভারি অস্ত্র দিয়ে তো অনেকক্ষণ তারা প্রতিরোধ করতে পারতো। পাশাকে বললাম, ভেতরে গিয়ে একটু দেখে আসতে চাই। সে তৎক্ষণাৎ মেজর হুদাকে বলল আমাকে ভেতরে নিয়ে যেতে।

হুদা প্রথমেই নিয়ে গেল নিচতলায় রিসিপশন রুমে। সেখানে শেখ কামালের মৃতদেহ টেবিলের পাশে একগাদা রক্তের মাঝে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। একটা টেলিফোনের রিসিভার টেবিল থেকে ঝুলছিল। মনে হল শেষ মুহূর্তে কাউকে ফোন করতে চাইছিলেন শেখ কামাল। একটা হাত তার ওদিকেই ছিল। টেবিলের পাশে আর একটি মৃতদেহ। একজন পুলিশ অফিসার। প্রচুর রক্তক্ষরণেই দুজন মারা গেছেন। কামালের ভাঙা চশমা পাশে পড়েছিল। মনে হলো কামরার ভেতর থেকেই দুজন ফাইট করছিলেন। গোলাগুলিতে জানালার ভাঙা কাঁচ চতুর্দিকে ছড়িয়ে।

এরপর আমরা দু-তলায় উঠতে পা বাড়ালাম। সিঁড়ির মুখেই চমকে উঠলাম। সিঁড়িতেই দেখি পড়ে আছেন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান। আমার নিজের চোখকেই বিশ্বাস হচ্ছিল না যে সিঁড়ির ওপরে একজন রাষ্ট্রপ্রধানের দেহ এভাবে পড়ে থাকতে পারে! তাঁর পরনে ছিল সাদা পাঞ্জাবি এবং চেক লুঙ্গি। পাশে পড়ে আছে তাঁর ভাঙা চশমা। তাঁর দেহ সিঁড়ির ওপরে এমনভাবে পড়েছিল যেন মনে হচ্ছিল সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেছেন। আমার মনে হচ্ছিল তিনি ঘুমিয়ে আছেন, এখনই উঠে দাঁড়াবেন। কারণ তাঁর মুখে কোনো রকমের আঘাতের চিহ্ন ছিল না। চেহারা ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তাঁর বুকের অংশটুকু ছিল ভীষণভাবে রক্তাক্ত। মনে হলো ব্রাস লেগেছে। আমি তার বুকের কাছে মাথা নিচু করে দেখতে চেষ্টা করলাম

কোথায় গুলি লেগেছে, কিন্তু বুক ভরা রক্তের আবিরে কিছুই বোঝা গেল না। তার বাম হাতটা ছিল বুকের উপর ভাঁজ করা, তবে তর্জনী আঙুলটা ছিঁড়ে গিয়ে চামড়ার টুকরার সাথে ঝুলছিল। তার দেহের অন্য কোনো অঙ্গে তেমন কোনো আঘাত দেখিনি। সারা সিঁড়ি বেয়ে রক্তের বন্যা। কোনোমতে তাঁর বিশাল দেহ ডিঙ্গিয়ে দোতলায় গেলাম। সিঁড়ির মুখেই ঘরটাতে দেখি বেগম মুজিবের দেহ দেউড়ির উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তার গলার হারটা ঢুকে আছে মুখের মধ্যে। মনে হলো স্বামীর উপর গুলির শব্দ শুনে তিনি ছুটে আসছিলেন। কিন্তু দরজার মুখেই গুলিবিদ্ধ হয়ে দেউড়িতে লুটিয়ে পড়েন। তার দেহ অর্ধেক বারান্দায়, অর্ধের ঘরের ভেতরে। তাকে পাশ কাটিয়ে কামরার ভেতর প্রবেশ করলাম। কামরার মেঝেতে এক সাগর রক্ত থপথপ করছিল। আমার বুটের সোল প্রায় অর্ধেক ডুবে যাচ্ছিল। বিধ্বস্ত পরিবেশ। রক্তাক্ত কামরার মধ্যে পড়ে আছে কয়েকটি লাশ। বাম পাশেরটি শেখ জামাল। তার দেহের ক্ষতবিক্ষত অবস্থা দেখে মনে হলো কামরার ভেতরে গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়। মিসেস রোজী জামাল সদ্য বিবাহিতা, হাতে তাজা মেহেদীর রং। ব্রাস অথবা গ্রেনেডের আঘাত সরাসরি তার মুখে লেগেছিল।

ভাগ্যিস তার প্রিয়জন কাউকে তার চেহারা দেখতে হয়নি। পাশে মিসেস সুলতানা কামাল। কিছুদিন আগে ক্রীড়াঙ্গনের প্রিয়দর্শিনী এই গোল্ডেন গার্লকে মাঠে দেখেছিলাম ছোটাছুটি করতে। প্রচুর রক্তক্ষরণে এখন তার চেহারা সম্পূর্ণ বিবর্ণ, শুকনো।

তার কোল ঘেঁষে ছোট রাসেলের মৃতদেহ। বড়ই করুণ দেখাচ্ছিল তার মুখখানি। তার মাথার খুলির পিছনদিক একেবারে থেঁতলে যায়। এরপর কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়ে পাশে আরও দুটি কামরায় ঢুকলাম। সবই ছিল খোলা। প্রতিটি ঘরেই দামি দামি জিনিসপত্র। রাষ্ট্রপতির পরিবার। মাত্র কদিন আগেই দু'দুটি বিয়ে হয়ে গেছে ঐ বাড়িতে, কামাল ও জামালের। আনন্দ মুখর আনন্দ-ভবনটি এখন নীরব নিথর।

আমরা তিন তলায় যে ঘরে শেখ সাহেব থাকতেন সেখানে গেলাম। সেখানে তার পালংক বিছানা সাজানো গোছানো। খাটের পাশে সুন্দর টেলিফোন সেট সবই আছে। নেই শুধু রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান। ধীরে ধীরে নেমে এলাম নিচে। মেজর হুদাকে বললাম দেহগুলোকে সাদা কাপড় বা চাদর দিয়ে ঢেকে দিতে। নিচের তলার একটি বাথরুমে পড়েছিল শেখ নাসেরের রক্তাপ্লুত মৃতদেহ, চেনাই যাচ্ছিল না। তিনি মাত্র আগের দিনই খুলনা থেকে ঢাকায় এসেছিলেন, বুঝি মৃত্যুর আহ্বানেই সাড়া দিতে!

বাড়ির পিছনে আঙ্গিনায় একটি লাল গাড়ির পেছনের সিটে হেলান দিয়ে বসে কর্নেল জামিলের প্রাণহীন দেহ। তার ঠিক কপালে বুলেট লেগেছিল। কপালে রক্ত জমাট হয়ে আছে, ঠিক যেন একটি লাল গোলাপ। গার্ডরা তাকে বাড়ির দিকে অগ্রসর হতে মানা করেছিল। কিন্তু তাদের কথা না মেনে তিনি গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে আসেন। কাছে থেকে নেয়া শট, বুলেটের একটি আঘাত তৎক্ষণাৎ তাকে ধরাশায়ী করে। জানা যায় একজন অফিসারই তাকে শুট করে। সম্ভবত মেজর নূর।

বাড়ির ভেতর প্রচুর সেপাই ঢুকে পড়েছিল। প্রত্যেকটি রুমই ছিল খোলা। দু'দুটো বিয়ের প্রচুর দামি জিনিসপত্র ও উপহার সামগ্রী। আমি হুদাকে বললাম রুমগুলো লক

করে দিতে, তা না হলে জিনিসপত্র চুরি হয়ে যেতে পারে। হুদা তখনই চিৎকার করে তার সৈনিকদের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে বলল। তারা আমাদের পেছন পেছন ভেতরে ঢুকে পড়েছিল।

মনের ভেতরে যথেষ্ট ব্যথা-বেদনা নিয়ে বেরিয়ে এলাম। বাড়িটা দখল করার জন্য এতগুলো নিরীহ প্রাণ বলিদান দিতে হলো। এত রক্তপাত হলো। সর্বত্র রক্তের হোলি খেলা। সৈনিকদের পায়ে পায়ে সারা বাড়িতে রক্তের ছাপ ছড়িয়ে পড়ছিল।

৩২ নং রোড থেকে ফিরে আমি স্টেশন হেডকোয়ার্টার থেকে জেনারেল শফিউল্লাহকে জানালাম ১৪৪ ধারা জারির কোনো দরকার নেই। কোনো রকম গণ্ডগোলের আশঙ্কা কোথাও নেই।

ক্যান্টনমেন্টে দেখা গেল সবাই হাসিখুশি। কেউ দুঃখিত নয়। উর্দীপরা জ্ঞাতি ভাইদের দ্বারা একটি বিরাট এ্যাডভেঞ্চার ঘটেছে। সফল এ্যাডভেঞ্চার। সবাই এটাকে হাসিমুখেই গ্রহণ করেছে। অবশ্য তারা কেউ ৩২ নং রোডের করুণ রক্তাক্ত দৃশ্য দেখেনি।

বিকাল বেলায়ই আর্টিলারি ও ল্যান্সারের কিছু ট্যাংক এবং কামান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অবস্থান নেয়। কয়েকটি ট্যাংক এবং কামান একেবারে বঙ্গভবনের ভেতরে এনে স্থাপন করা হলো। সন্ধ্যা নামার আগে আগেই ঢাকা শহর ও ক্যান্টনমেন্টের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে।

সারাদিন রেডিওতে একের পর এক ঘোষণা ও নির্দেশ প্রচার চলছিল। চলছিল মার্চিং গান, গজল ইত্যাদি। সারাদিন কাজকর্ম ফেলে সবাই কেবল রেডিওই শুনছিল। বাইরে ছিল কারফিউ। রেডিও মারফত তাৎক্ষণিকভাবে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছিল, যা এমনটি আর দেখা যায়নি। নতুন প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ ইতিমধ্যে বঙ্গভবনে তশরিফ নিয়ে গেছেন। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি সেখান থেকেই বিভিন্ন নির্দেশ ও ফরমান দিচ্ছেন। বঙ্গভবনই এখন সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। তার সাথে কোমরে পিস্তল ঝুলিয়ে মেজর আবদুর রশিদ ও ফারুক রহমান।

তিন বাহিনী প্রধানরা সবাই বঙ্গভবনে। জেনারেল শফিউল্লাহকে সারাক্ষণই বঙ্গভবনে অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হলো। প্রকৃতপক্ষে তাকে ১৫ থেকে ১৭ অগাস্ট পর্যন্ত এক কাপড়ে এক নাগাড়ে সুকৌশলে বঙ্গভবনে এনগেজড় (নাকি আটক!) রাখা হয়, যাতে কোনোভাবে তার দ্বারা অপ্রত্যাশিত কোনো ঘটনার সৃষ্টি না হয়। শফিউল্লাহ ব্যাপারটা বুঝতে পারলেও কিছু করতে পারছিলেন না। ফারুক-রশিদের অবশ্য এমনিতেই তাকে সরিয়ে দেবার প্ল্যান ছিল এবং চূড়ান্তভাবে তাকে ২৪ অগাস্ট থেকে অবসর দেয়া হয়। এভাবে জোর করে অবসর দেয়ায় শফিউল্লাহ খুবই অপমানিত বোধ করেন।

১৫ অগাস্টের ভোর বেলা ৪-৩০ মিনিটে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের উত্তর প্রান্ত থেকে দুটি শক্তিশালী যান্ত্রিক ইউনিটের অগ্রযাত্রার মধ্যদিয়ে ঝটিকার বেগে যে রক্তাক্ত অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়, ১২ ঘণ্টার ব্যবধানে ঐদিন বিকাল ৪-৩০ মিনিটের মধ্যেই তার সফল পরিসমাপ্তি ঘটল।

সন্ধ্যা নামার সাথে সাথেই নতুন রাষ্ট্র, নতুন রাষ্ট্রপতি, নতুন মন্ত্রিসভা, নতুন প্রশাসন। সর্বত্র জয়ধ্বনি। অদ্ভুত ব্যাপার। অবিশ্বাস্য কাণ্ড! মাত্র বারো ঘণ্টার ব্যবধানে কী বিরাট পরিবর্তন! উত্থান পতন!

সন্ধ্যাবেলা ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অন্ধকার নামার সাথে সাথে সকল নাটকীয়তার অবসান ঘটল। সারাদিন ধরে সর্বত্র বিরাজ করছিল টেনশন আর উত্তেজনা। অফিসার ও সৈনিকগণ মিলিটারি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেছে। বরং শাফায়েত জামিলের ৪৬ ইনফেন্ট্রি ব্রিগেডের সৈনিকবৃন্দের মধ্যেও উল্লাস আনন্দের মাত্রা ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে কিছু বেশি। রাতে টেলিভিশনে নতুন প্রেসিডেন্টের সাথে নতুন মন্ত্রিগণ, আর ফারুক-রশিদ প্রমুখের সাথে সবার হাসিখুশি চেহারা ভেসে উঠল পর্দায়। উষ্ণ করমর্দন। অভিবাদন। তবে কেউ কেউ বেশ চিন্তিতও ছিলেন।

সন্ধ্যায় নব-নিযুক্ত রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমদের দেশবাসীর প্রতি ভাষণ:
বিসমিল্লাহির রাহমানের রাহিম
আসসালামু আলায়কুম,
প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা, এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের সত্যিকার ও সঠিক আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপদানের পূর্ণ দায়িত্ব সামগ্রিক ও সমষ্টিগতভাবে সম্পাদনের জন্য পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা ও বাংলাদেশের গণমানুষের দোয়ার ওপর ভরসা করে রাষ্ট্রপতি হিসেবে সরকারের দায়িত্ব আমার ওপর অর্পিত হয়েছে। বাংলার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের বজ্রকঠিন দায়িত্ব সম্পাদনের পথ সুগম করার জন্য বাংলাদেশের সেনাবাহিনী সত্যিকারের বীরের মতো অকুতোভয় চিত্তে এগিয়ে এসেছেন। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, নৌ বাহিনী, বাংলাদেশ রাইফেলস, রক্ষীবাহিনী এবং পুলিশ বাহিনী সরকারের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য ও আস্থা প্রকাশ করেছেন। এরা সবাই একযোগে কাজ করে যাচ্ছেন।

"সকলের প্রতি বন্ধুত্ব এবং কারো প্রতি বিদ্বেষ নয়" এই নীতির রূপরেখার মধ্যে আমরা শান্তি ও প্রগতির পথে আমাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখবো .... ।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

রাতের অন্ধকারে

সারাদিন বিভিন্ন ঘটনার আবর্তে পড়ে দেহমন ছিল ক্লান্ত তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রাত তিনটার দিকে আমার বেডরুমে টেলিফোন বেজে উঠল ক্রিং ক্রিং ক্রিং; ক্রমাগত বেজেই চলল। আমার স্ত্রী বাধা দিয়ে অনিশ্চয়তার সময়ে গভীর রাতে টেলিফোন ধরতে মানা করল। আমি তবুও ফোন ধরলাম। অপরপ্রান্তে মেজর আবদুল মতিন (পরবর্তীতে ব্রিগেডিয়ার) তিনি বললেন; আমি বঙ্গভবন থেকে বলছি, স্যার নতুন রাষ্ট্রপতি এবং সেনাবাহিনী ও অন্যান্য বাহিনীর প্রধানসহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সেখানে আছেন। আপনাকে যে মেসেজ দেয়ার জন্য আমাকে বলা হয়েছে তা হলো, আগামীকাল সূর্য ওঠার আগেই শেখ সাহেবের বাসার সমস্ত লাশগুলো

বনানী গোরস্থানে দাফন করার ব্যবস্থা নিতে হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ অর্ডারটা কে দিলেন? সে বলল, এখানে তো রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে সকল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আছেন, আপনার কোনো সন্দেহ থাকলে আপনি গাড়ি নিয়ে বঙ্গভবনে এসে যান। কিন্তু তাতে আপনার সময় নষ্ট হবে। আমি আপনাকে বলছি, এটা হাইয়েস্ট কোয়ার্টারের অর্ডার।

অসময়ে টেলিফোনটা উঠানোর জন্য আমি নিজেকে অভিসম্পাত দিলাম। মতিনের কণ্ঠস্বর বিব্রতকর হলেও মনে হলো বঙ্গভবনে মোশতাকের খাস কামরাতে বসেই যেন সে নির্দেশ বিতরণ করছিল।

কিছুক্ষণ পরে আবার মেজর মতিনের টেলিফোন, "স্যার, আরো কিছু নির্দেশ। শেখ মনি, আবদুর রব সেরনিয়াবাতসহ অন্যান্য যারা ঐ ঘটনায় মারা গিয়েছেন, তাদের বাসা থেকেও মৃতদেহগুলো কালেক্ট করতে হবে এবং তাদের লাশ বনানী গোরস্থানে দাফন করতে হবে। তবে শেখ সাহেবের লাশ শুধু বাসায় থাকবে। বনানীতে দাফন করা হবে না, স্থান পরে জানানো হবে।" সময় খুব বেশি হাতে নেই। ১নং সাপ্লাই ব্যাটালিয়ন ছিল ডিউটি ব্যাটালিয়ন। স্টেশন হেড কোয়ার্টারে আমার ডিউটি অফিসারকে তৎক্ষণাৎ তাদের জড়ো করতে নির্দেশ দিলাম। তাদের দুটো গ্রুপ করলাম। একটা গ্রুপকে ট্রান্সপোর্টসহ শেখ সাহেবের বাসায় পাঠালাম। আর একদলকে পাঠালাম বানানী গোরস্থানে গিয়ে কবর খুঁড়তে। ৩০ জন সৈনিক একজন সুবেদারের অধীনে বনানী কবরস্থানে যায়। এরপর আমি নিজেই শেখ সাহেবের বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেই।

সেদিন অমাবস্যা ছিল কি-না জানি না, রাত ছিল গভীর অন্ধকার। দু'হাত দূরেও কিছু দেখা যাচ্ছিল না। আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। মধ্যরাতে ফাঁকা রাস্তা দিয়ে আমার জিপ তীব্র আলো ছড়িয়ে অন্ধকার ভেদ করে ক্যান্টনমেন্ট থেকে ৩২ নং রোডের দিকে ছুটে চলল। হঠাৎ কেন জানি গভীর রাতের অন্ধকারে আমি রাস্তায় চোরাগুপ্তা আক্রমণের আশংকা করলাম। আমার সাথে তিনজন সৈনিককে তাই রাইফেল লোড করে সাবধান থাকতে বলে দিলাম। যাই হোক নির্বিঘ্নেই আমরা ৩২ নং রোডে পৌঁছে গেলাম। গেইটের বাইরে থাকতেই মেজর হুদার কর্কশ কণ্ঠ কানে ভেসে এলো। সে সৈনিকদের লাইন করিয়ে কড়া ভাষায় গালাগালি দিচ্ছিল, কারণ তারা সুযোগ পেলেই ভেতরে ঢুকে এটা-ওটা হাতড়ে নিচ্ছিল।

আমার পৌঁছবার আগেই শেখ সাহেবের পরিবারের সবকটি লাশ কফিন বন্দি করে সাপ্লাই ব্যাটালিয়নের ট্রাকে তুলে আমার আগমনের জন্য অপেক্ষা করছিল। শুধু শেখ সাহেবের লাশ কফিন বন্দি করে বারান্দার এক কোণে একাকী ফেলে রাখা হয়েছিল। আমি সুবেদার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কী শেখ সাহেবের লাশ? তিনি স্মার্টলি জবাব দিলেন, জ্বি স্যার, ওটা শেখ সাহেবের। আমি নিজে চেক করে রেখেছি। কেন জানি কৌতূহলবশতই বললাম, কফিনের ঢাকনাটা খুলুন, আমি চেক করবো। তারা বড়ই অনিচ্ছায় হাতুড়ি বাটাল এনে আবার কফিনটি খুললেন। কি আশ্চর্য! দেখা গেল ওটা শেখ সাহেবের লাশ নয়, শেখ নাসেরের। সুবেদার সাহেব খুব ঘাবড়ে গেল।

তাকে বকাঝকা করলাম। আসলে শেখ নাসেরকে দেখতে অনেকটা তার বড় ভাই শেখ মুজিবের মতোই। আর এতেই সুবেদার সাহেবের ঘটে বিভ্রান্তি।

আমি এবার ট্রাকে উঠে সবকটি কফিনের ঢাকনা খুলে ম্যাচ বাক্সের কাঠি জ্বালিয়ে শেখ সাহেবকে খুঁজতে লাগলাম। অবশেষে ট্রাকের এক অন্ধকার কোণে শেখ সাহেবকে পাওয়া গেল। একটি কফিনের ঢাকনা খুলতেই বরফের স্তূপের ভেতর থেকে তাঁর দীপ্ত, অক্ষত, সুপরিচিত মুখখানি বেরিয়ে এলো। সাদা চাদরে ঢাকা বুকের সমস্ত অংশ তখনো রক্তে রাঙ্গা। তাঁর কফিনের ঢাকনা বন্ধ করে সম্মানের সাথে তাঁকে নিচে নামিয়ে বারান্দায় স্থাপন করা হলো। বারান্দা থেকে শেখ নাসেরের কফিন ট্রাকে নিয়ে তুলে দেয়া হলো। আমি সবকটি কফিন নিজ হাতে কলম দিয়ে নাম লিখে মার্ক করে দিলাম। লাশ বদল বিভ্রাটের দরুন বেশ কিছু সময় নষ্ট হয়ে গেল। আমি কফিনগুলোসহ ট্রাকটি বনানী রওয়ানা করিয়ে দিয়ে এবার আমার জিপ নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে শেখ মনির বাসার দিকে ছুটলাম। মেজর আলাউদ্দিনকে পাঠালাম আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাসায়। তখন ভোর ৪-৪৫ মিনিট।

শেখ মনির বাসায় পৌঁছে ঘরের ভেতর ঢুকে দেখি সব ফাঁকা, কেউ নেই। এমন কি কোনো মৃতদেহও নেই। অথচ ঘরের দরজা সব খোলা। বাড়ির জিনিসপত্র সবই যথাস্থানে পড়ে, যেন জনমানবশূন্য ভূতুড়ে বাড়ি। আমি হাঁকাহাঁকি করলাম। কোনো সাড়াশব্দ নেই। তবে ঘরের ভেতর যে একটি রক্তক্ষয়ী ঘটনা ঘটে গেছে তা স্পষ্টই বুঝা গেল। কাছেই পুলিশ থানা। থানায় গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, শেখ মনির লাশ সম্পর্কে তারা কিছু জানে কি-না। তারা বলল, গোলাগুলির পর কিছু সৈন্য এসে বোধহয় ডেডবডিগুলো মর্গে নিয়ে গেছে। ইতিমধ্যে মেজর আলাউদ্দিনও সেরনিয়াবাত সাহেবের বাসায় কোনো লাশ না পেয়ে ফিরে এসেছে। অগত্যা আমি জিপ নিয়ে দ্রুত মেডিক্যাল কলেজের মর্গে ছুটলাম। সেখানে ডিউটিরত পুলিশ ইন্সপেক্টর এরশাদ বললেন, মর্গেই সব লাশ পড়ে আছে। লাশগুলো বের করে দেবার জন্য মর্গের ডোমকে ডাকা হলো। ডোম এসে দরজা খুললে দেখা গেল মর্গে পূর্বের ১৫ দিনের পুরানো পচা গলিত অনেক লাশ একসাথে স্তূপ হয়ে আছে। ওগুলোর মধ্যে থেকেই রব সেরনিয়াবাত ও শেখ মনির পরিবারের সদস্যদের মৃতদেহগুলো শনাক্ত করা হয়। পুলিশ অফিসারই এগুলো শনাক্ত করেন। এতগুলো লাশ এক সাথে চাপাচাপি করে থাকায় ১২ ঘণ্টায়ই একেবারে পচে গিয়েছিল। ভীষণ দুর্গন্ধ বেরুচ্ছিল। মরা মানুষের লাশ এত দুর্গন্ধময় হতে পারে, আমার ধারণাই ছিল না। পুলিশ অফিসারতো ওয়াক থু করে বমিই করে বসলেন। লাশগুলো ট্রাকে উঠিয়ে বনানী গোরস্থানে নিয়ে যেতে বলি। আমি সেখান থেকে দ্রুত জিপ চালিয়ে বনানী ছুটলাম।

চারিদিকে বিভৎস দৃশ্য দেখে দেখে আমার মাথায় বারবার গন্ডগোল বেঁধে যাচ্ছিল। কয়েকবার বমি করার উপক্রম হলো। গভীর রাতে এরকম একটি অপ্রীতিকর কাজে জড়িয়ে ফেলার জন্য বারবার মেজর মতিনকে অভিসম্পাত দিতে লাগলাম। সাপ্লাই ব্যাটালিয়নের সৈনিকরা একটানা কাজ করে ১৮টি কবর খুঁড়ে রেখে ছির। শেখ সাহেবের পরিবারের লাশগুলো আগে দাফন করা হয়। তাদেরকে প্রথম সাতটি কবরে সম্মানের সঙ্গে দাফন করা হয়। এ সময় ব্যাটালিয়নের একজন সিনিয়র সুবেদার

উপস্থিত ছিলেন। তাদের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল রবও ছিলেন। তাদের আরো দু-তিন অফিসার ছিল। আমি কাউকে ঠাহর করতে পারছিলাম না। অত্যন্ত বৈরী পরিবেশ ও টেনশনের মধ্যে তারা দাফন কার্য সমাধা করে।

শেখ পরিবারের সাতজন সদস্যের কবর আছে বনানীতে। প্রথম কবরটা বেগম মুজিবের। দ্বিতীয়টা শেখ নাসেরের। তৃতীয়টা শেখ কামালের। চতুর্থ কবর মিসেস কামালের। পঞ্চম কবর শেখ জামালের। ষষ্ঠ কবরে মিসেস জামাল এবং সপ্তম কবরে শায়িত আছে মাস্টার রাসেল।

সব মিলে ওখানে ১৮টি কবর রয়েছে। ১৩ নং কবরটি শেখ মনির। ১৪ নং বেগম মনি। ১৭ নং কবরে শায়িত রয়েছেন জনাব রব সেরনিয়াবাত। বাকিগুলো শেখ মনি ও জনাব সেরনিয়াবাতের বাসায় অন্যান্য যারা মারা যান তাদের।

লাশগুলো দাফনের পর আমি আমার অফিসে ফিরে এসে এক এক করে নামগুলো আমার অফিস প্যাডে লিপিবদ্ধ করি। রেকর্ডটি বহুদিন ধরে আমার কাছে রক্ষিত রয়েছে। কেউ কোনোদিন খোঁজও করেনি। এছাড়া আর কোথাও এই সমাধিগুলোর রেকর্ড নেই।

প্রয়াত রাষ্ট্রপতির দাফন

সারারাত ভূতের মতো এখানে ওখানে ছুটে আমার মাথা বনবন করছিল। বনানীতে শেখ পরিবার, শেখ মনি ও রব সেরনিয়াবাত পরিবারের দাফন সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। যদিও সৈনিকদের সূর্য ওঠার পরও কাজ করতে হয়েছিল। আমি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অফিসারকে নির্দেশ দিলাম তাড়াতাড়ি ক'জন মালি পাঠিয়ে যেন কবরগুলো সুন্দরভাবে ড্রেসিং করে দেয়।

আমি আমার অফিসে বসেছিলাম। বঙ্গভবন থেকে টেলিফোনে আবার মেসেজ পাঠানো হলো, শেখ সাহেবের ডেডবডি টুঙ্গীপাড়া পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। একটি এয়ারফোর্স হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতিকে টুঙ্গীপাড়া দাফনের যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে। বঙ্গভবন থেকে বারবার ফোন আসাতে আমাকে বঙ্গভবনের টেলিফোন ভীতি পেয়ে বসলো। আমি জিপ্ নিয়ে অফিস থেকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম এবং খামাকাই এখানে ওখানে ঘুরাফেরা করে সময় কাটাতে লাগলাম।

আর্মি অর্ডিন্যান্সের একটি প্ল্যাটুন অর্ডিন্যান্সের মেজর মহিউদ্দিনের নেতৃত্বে প্রস্তুত রাখলাম। প্রয়াত রাষ্ট্রপতির হেলিকপ্টারের পাইলট ছিলেন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শামসের আলী (পরে এয়ার কমোডর)। তারা তেঁজগাও এয়ারপোর্ট থেকে বেলা আড়াইটা নাগাদ শেখ সাহেবের লাশ নিয়ে টুঙ্গিপাড়ার উদ্দেশ্যে আকাশে পাড়ি জমালো। হামলার আশঙ্কায় হেলিকপ্টার অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত ছিল। আকাশযানটি টুঙ্গীপাড়ার আকাশে পৌঁছলে আশেপাশের লোকজন ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। ওখানে আগেই পুলিশ পাঠাবার জন্য সংবাদ দেয়া হয়েছিল। মেজর মহিউদ্দিন পুলিশের সহায়তায় কোনোক্রমে ১৫/২০ জন লোক জানাজার জন্য জড়ো করতে সক্ষম হয়েছিল। একজন স্থানীয় মৌলভীকে ডেকে এনে শেখ সাহেবের লাশ গোসল করানো হয়। তার গায়ে

১৮টি বুলেটের দাগ দেখতে পাওয়া যায়। গোসল শেষে পিতার কবরের পাশেই তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।

সূর্যিমামা পশ্চিম গগনে হেলে গিয়ে বিদায়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তার আগেই দাফন কার্য শেষ করে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শামসের হেলিকপ্টার নিয়ে আকাশে উড়ল।

জাতির জনককে শেষ বিদায় জানাতে যে কোনো কারণেই হোক, টুঙ্গীপাড়ার লোকজন সেদিন ভিড় করেনি। যে ব্যক্তি সারাজীবন বাঙালি জাতির স্বাধীন সত্তার জন্য সংগ্রাম করে গেলেন, তাঁকে শেষ বিদায় জানানো হলো অতি নীরবে, নিঃশব্দে, টুঙ্গীপাড়ার একটি গ্রামে।

ভারতীয় হস্তক্ষেপ

অগাস্ট অভ্যুত্থানের পর পরই ভারতীয় বাহিনীর হস্তক্ষেপের যথেষ্ট আশঙ্কা দেখা দেয়। ভারত-বাংলাদেশ চুক্তি অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ গোলযোগে ভারতের হস্তক্ষেপ করার একটি বিতর্কিত ধারা রয়েছে। ভারত কেন হস্তক্ষেপ করলো না? বিভিন্ন সূত্রমতে তারা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের আহ্বানের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু কেউ তা করেনি। নেতারা ছিলেন অন্তরীণ। তবে একাত্তর আর পঁচাত্তর এক ছিল না। পঁচাত্তরে বাংলাদেশের জনমত ছিল সম্পূর্ণভাবে ভারতের প্রতিকূলে। এসব উপলব্ধি করেই তারা ভুল পথে পা বাড়ায়নি বলে মনে হয়।

ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর দিল্লী থেকে ছুটে আসেন এবং ভারতীয় আশঙ্কার কথা তুলে ধরেন। তাকে বলতে বলা হয়, ভারতীয় এক ডিভিশন মার্চ করলে, চীন পাঁচ ডিভিশন সৈন্য মার্চ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ব্রিঃ মঞ্জুর হঠাৎ করে ১৫ অগাস্ট দিল্লী থেকে ঢাকা চলে আসেন। তিনি কীভাবে, কার নির্দেশে ঐদিন ঢাকা আসেন, তা আজো কেউ জানে না। পরদিনই তাকে ফেরত পাঠানো হয়। ধারণা করা হয়, জিয়ার ডাকেই তিনি আসেন।

যা হোক, অতি দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসায় ভারতীয় হস্তক্ষেপ আশঙ্কা দূরীভূত হয়; তা না হলে আর একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বাংলাদেশ জড়িয়ে পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল।

১৫ অগাস্ট পরবর্তী ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের অবস্থা শান্ত হয়ে এলো বাহ্যিকভাবে, কিন্তু অশান্ত হয়ে উঠল ভেতরে ভেতরে। ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু তখন বঙ্গভবন। নতুন প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ সেখানে বসে দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছেন। তাকে ঘিরে এখন অভ্যুত্থানের নায়কবৃন্দ ফারুক, রশিদ, ডালিম, নূর, পাশা সবাই বঙ্গভবনে অবস্থান নিয়েছে। আর্টিলারির কামান ও ল্যান্সারের ট্যাংকগুলো বঙ্গভবনের চারপাশে বাইরে ভেতরে স্থাপন করা হয়েছে।

সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল শফিউল্লাহ প্রায় সকল ক্ষমতা হারালেন। মেজররা ততক্ষণে বঙ্গভবনে জেঁকে বসেছে। বঙ্গভবন থেকে অফিসে ফিরে এসে ঐদিনই ১৭ তারিখ বিকালে শফিউল্লাহ মিটিং করলেন। জিয়া, খালেদ মোশাররফ এবং বাকি দুই বাহিনী প্রধানও উপস্থিত ছিলেন। ডি.জি.এফ.আই ব্রিগেডিয়ার রউফও ছিলেন। কীভাবে মেজরদের বঙ্গভবন থেকে ফিরিয়ে আনা যায়। রউফ বললেন, আমরা যা বলি

তাদের কানে তা পৌঁছে যায়। অতঃপর সিদ্ধান্ত হলো সবাই শপথ নেবেন, বাইরে এই মিটিং-এর আলোচনার বিষয়বস্তু কেউ কিছু প্রকাশ করবেন না। তাই হল। কসম খেয়ে মিটিং শুরু হল। অনেকক্ষণ আলোচনার পর সবাই একমত হলেন, বঙ্গভবন থেকে অনতিবিলম্বে মেজরদের ফিরিয়ে আনতে হবে। মজার ব্যাপার, আল্লাহর নামে সবাই শপথ নিলেও পরদিনই বঙ্গভবনের মেজররা মিটিং-এর বিষয়বস্তু সবকিছুই জেনে যায়। তারা মুখ টিপে হাসতে লাগলো। এইতো কসমের বাহার!

১৯ অগাস্ট সকাল ৮টায় সেনাপ্রধান শফিউল্লহ ব্রিগেড কমান্ডারদের মিটিং ডাকলেন। ফারুক, রশিদও উপস্থিত ছিল। শফিউল্লাহ অবস্থার বর্ণনা দিয়ে বললেন যে, তিনি ভারতীয় আক্রমণের আশঙ্কা করছেন, অতএব বেঙ্গল ল্যান্সার ও ফিল্ড রেজিমেন্টের উচিত তারা যেন দেশের বৃহত্তর স্বার্থে শহর থেকে ক্যান্টনমেন্টে ফিরে চলে আসেন। এই পর্যায়ে এক সময় কর্নেল শাফায়েত জামিল গর্জে উঠল, ওরা ফিরে না এলে আমি তাদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করবো। আমি তাদের কোর্ট মার্শাল দাবি করবো। মিটিং উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যদিয়ে সমাপ্ত হলো। মতলব টের পেয়ে ফারুক, রশিদ বঙ্গভবনে তাদের অবস্থান আরো সুদৃঢ় করল।

মোক্ষম মুহূর্তে ফারুক-রশিদের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে, চার দিন পর তাদের বিরুদ্ধে শাফায়াতের কোর্ট মার্শাল দাবির যৌক্তিকতা কেউ খুঁজে পায়নি, কারণ ততোদিনে জল অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। ফারুক-রশিদ ততোদিনে বঙ্গভবনের মসনদে শক্তভাবে সমাসীন।

মিটিং শুরু হওয়ার আগে কর্নেল শাফায়েত জামিল সেনাপ্রধান শফিউল্লাহর সাথে তার অফিসে আলাদাভাবে ব্যক্তিগত পয়েন্টে মিলিত হন। তার সাথে ছিল তার স্টাফ অফিসার ব্রিগেড হাফিজউদ্দিন। শাফায়েত উত্তেজিতভাবে শফিউল্লাহকে বললো, স্যার, আপনি জেনে রাখুন, এ সমস্ত গণ্ডগোলের পেছনে রয়েছে জেনারেল জিয়ার হাত। তার কথা শুনে শফিউল্লাহ হেসে উত্তর দিলেন, শাফায়েত, এই কথাটা বুঝতে তোমার এতো সময় লাগল?

আসলে অভ্যুত্থান সফল হওয়ার পর এবার শাফায়েত জামিল বুঝতে পারলো, এ অভ্যুত্থানে তারতো কোনো লাভ হয়নি। বরং শক্তিশালী ব্রিগেড নিয়েও এখন সে উপেক্ষিত। আসল ক্ষমতা চলে গেছে বঙ্গভবনে মেজরদের হাতে। তাহলে তখন নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে তার কী লাভ হলো? গোস্বায় সে ফোঁশ ফোঁশ করতে লাগলো।

খন্দকার মোশতাক আহমেদ বেশ দক্ষতার সাথে দৃঢ়হস্তে দেশ শাসন করতে লাগলেন। বিশ্বের চতুর্দিক থেকে অভিনন্দনবার্তা আসতে লাগলো। এমনকি মওলানা ভাসানীও সরকার পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়ে মোশতাককে উষ্ণ অভিনন্দন বার্তা পাঠালেন। মোশতাকের নির্দেশে শীর্ষস্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান, আবদুস সামাদ আজাদ প্রমুখ অন্তরীণ হলেন। অবশ্য আওয়ামী লীগ অথবা মুজিব বাহিনী ইত্যাদির পক্ষ থেকে সবরকম প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রথম আঘাতেই ভেঙে পড়েছে। তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এখানে

ওখানে পালিয়ে গা ঢাকা দেয়। একমাত্র টাঙ্গাইলের দিকে কাদের সিদ্দিকী কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করলে কর্নেল লতিফের নেতৃত্বে দুই ব্যাটালিয়ন সৈন্য পাঠিয়ে তাকে সীমান্তের ওপারে তাড়িয়ে দেয়া হয়। বেশ ছোটখাটো লড়াই হয়ে যায় এবং কিছু সৈন্য হতাহত হয়। একটি হেলিকপ্টারও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ইতিমধ্যে মোশতাক আহমদ জেনারেল ওসমানীকে তার ডিফেন্স উপদেষ্টা নিযুক্ত করেন। মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান হন চীফ অব ডিফেন্স স্টাফ। এই সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, মেজর জেনারেল শফিউল্লাহর স্থলে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনীর নতুন চীফ অব স্টাফ নিযুক্ত করা হয় ২৪ অগাস্ট ১৯৭৫ তারিখে। সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন কার্যকর করা হলো। ফারুক-রশিদের চাপেই যে এটা ঘটলো তা বুঝতে কারো বাকি রইল না। রশিদের মতে এটা ছিল পূর্ব নির্ধারিত। সিভিল মিলিটারিতে আরো বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদ পরিবর্তন করা হলো। ১৬ অক্টোবর বিমান বাহিনী প্রধান এ. কে. খন্দকারের স্থলে জার্মানি থেকে ডেকে এনে এম. জি. তোয়াবকে এয়ার চীফ বানানো ছিল উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

চীফ অব স্টাফের গদি দখল

জিয়াউর রহমানের গদি দখল ছিল আরো নাটকীয়। ২৪ তারিখ অনুমান বেলা ১২টায় জেনারেল জিয়ার ফোন আসলো। তার উত্তেজিত কণ্ঠ, হামিদ Come here just now.

আমি আমার অফিসে তখন কি একটা কনফারেন্স করছিলাম, বললাম, একটু পরে আসলে হবে না? বলল, শাট আপ, কাম জাস্ট নাউ। আমি মিটিং ভঙ্গ করে তার ওখানে ছুটলাম। বলাবাহুল্য জেনারেল জিয়া আমার কোর্স মেট। তার সাথে অফিসের বাইরে আমার ছিল 'তুই' 'তুকার' সম্পর্ক। ছিল মধুর সম্পর্ক।

আমি তার অফিসে ঢুকতেই মিলিটারি কায়দায় ডাঁট মেরে গর্জে উঠল, 'Salute properly you Guffy, Your are entering Chief of Staff's Office।' আমি থমকে গেলাম। সে মুচকি হাসতে লাগল। তার হাতে একখানা টাইপ করা সাদা কাগজ। হেসে হেসে আমার চোখের সামনে সেটা নাড়তে লাগল। বলল, Sit down, read it। আমি তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে দেখলাম, মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্স থেকে ইস্যুকৃত অফিশিয়াল চিঠি। তাকে প্রধান সেনাপতি করে নিয়োগপত্র। আমি এগিয়ে গিয়ে তাকে আলিঙ্গন করে কনগ্রাচুলেশন জানালাম। চিঠিটা পেয়ে সে প্রথমেই আমাকে ডেকেছে। বলল, হামিদ, বল্ এখন কী করা যায়? জিজ্ঞাসা করলাম, শফিউল্লাহ চিঠি পেয়েছে? সে জানে?

'না, এখনও কেউ জানে না।'

বললাম, তাহলে তো তার কাছেও কপি পৌঁছাতে হবে। তারপর অফিশিয়ালি সে হয়তো কয়দিন সময় নিয়ে তোমাকে 'হ্যান্ড ওভার' করবে। এখন একটু চুপ থাকো।

বলল, শাট-আপ, আমি কাল থেকেই টেকওভার করবো। আমি তাকে বুঝালাম, দেখো এটাতো তুমি 'ক্যু' করতে যাচ্ছো না। সরকারের অফিশিয়াল চিঠি রয়েছে। তোমাকে তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়াই হয়ে গেছে।

সে বলল, তুই এসব বুঝবি না। হি ইজ এ ভেরি ক্লেভার পারসন। তুমি আগামীকাল পুরো ঢাকা স্টেশনের সব ইউনিটের অফিসার ও সৈনিকদের বড় মাঠে একত্র হওয়ার নির্দেশ পাঠাও।

আমি দেখলাম মহা সংকট। কিছুতেই তার দেরি সইছে না। কিছুক্ষণ তর্কাতর্কির পর বললাম, ঢাকা স্টেশনের সব ইউনিট আমার অধীনে নয়। তাই তুমি লগ এরিয়া কমান্ডারকে ডেকে নির্দেশটা দিতে পারলে ভালো হবে। প্রস্তাবে সে রাজি হলো। ব্রিগেডিয়ার মশহুরুল হক তখন অস্থায়ী লগ এরিয়া কমান্ডার। জিয়া তাকে তৎক্ষণাৎ টেলিফোনে ডেকে পাঠালো। আমি তাড়াতাড়ি জিয়ার অফিস থেকে বেরিয়ে আমার অফিসে ফিরে আসছিলাম। রাস্তায় দেখলাম ব্রিঃ মশহুরুল হকের গাড়ি পত্‌পত্‌ করে পতাকা উড়িয়ে হেডকোয়ার্টারের দিকে যাচ্ছে। চলন্ত গাড়িতে আমরা কুশল বিনিময় করলাম।

পরদিন সকালে সারা ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে মহা উত্তেজনা। অফিসার জওয়ান সবাই সিগন্যাল মেসের গ্রাউন্ডে সমবেত হয়েছে। কেউ কিছুই জানে না, কি ব্যাপার! ঠিক সাড়ে সাতটার সময় ডেপুটি চীফ জিয়াউর রহমান মঞ্চে এসে হাজির। সবাই অ্যাটেনশন। জিয়া মঞ্চ থেকে চিৎকার দিয়ে গর্জন করে সবাইকে জানিয়ে দিলেন, আজ থেকে আমি আর্মি চীফ অব স্টাফ। আপনারা সবাই আপনাদের ডিসিপ্লিন ঠিক করেন। তা না হলে কঠোর শাস্তি হবে। বলেই মঞ্চ থেকে নেমে দ্রুতপদে তার গাড়ি চড়ে প্রস্থান। সবাই হতবাক, একে অন্যের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। আমি মুচকি হাসলাম।

প্রস্থানের পথে আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার আঙ্গুল দিয়ে আমার গায়ে টোকা দিল। Follow me. তাড়াতাড়ি আমি জিপ নিয়ে তার পিছন পিছন ছুটে তার অফিসে গিয়ে ঢুকলাম। চেয়ারে বসে নব নিযুক্ত সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান। মুখে তার তৃপ্তির হাসি। বিরল দৃশ্য। বললো, 'কেমন হলো বল?' আমি বললাম, ঠিকতো হলো, কিন্তু প্রথম ভাষণটা এরকম চড়া গলায় ধমকের সুরে না বললে কী হতো না? বললো শাট আপ। এটাতো কেবল শুরু। দেখনা আমি কীভাবে সব ব্যাটাকে ডিসিপ্লিন শিখিয়ে দেই।' বললাম দোস্ত একটু ধীরে চল।

'শফিউল্লাহর Reaction কী?' তার জিজ্ঞাসা।

বললাম, 'এখনো কথা হয়নি। দেখি কী বলে?'

চা পর্ব শেষ করে যখন তার কাছ থেকে উঠলাম তখন দারুণ মুডে সে। ততক্ষণ দু-একটি টেলিফোনও আসতে শুরু করেছে– কংগ্রাচুলেশন স্যার!'

ওদিকে শফিউল্লাহ এ ব্যাপার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধকারে। সে তখনও কোনো চিঠিই পায়নি। সে কিছুই জানে না। শফিউল্লাহ আমাকে টেলিফোন করল, হামিদ এসব কি হচ্ছে? কে এইসব নির্দেশ দিচ্ছে? কার হুকুমে সকালে স্টেশন অফিসার জওয়ানদের মিটিং ডাকা হলো? আমি বহুকষ্টে ব্যাপারটা তাকে বুঝিয়ে মাথা গরম না করতে অনুরোধ করলাম। সে দারুণ বিরক্ত ও অপমানবোধ করলেও পরিস্থিতির কারণে পরিবর্তন মেনে নিতে বাধ্য হলো। ঐদিন থেকে শফিউল্লাহ আর অফিসেই আসলো

না। এইভাবে সেনাবাহিনীর নতুন চীফ অব স্টাফের ঝটিকা স্টাইলে গদিদখল পর্ব সম্পন্ন হলো। কোনো বিদায় সংবর্ধনা, কোনো আনুষ্ঠানিক ডিনার, কিছুরই আয়োজন করা হলো না।

জিয়াউর রহমানের সেনাবাহিনী প্রধান হওয়ার সুবাদে ভবিষ্যতে তাঁর আকাশে ওঠার সোপান তৈরি হয়ে গেল। আলাদিনের যে চেরাগটার স্বপ্ন এতদিন ধরে সে লালন করে আসছিল, আজ তা হাতে এসে ধরা দিলো।

১৫ অগাস্ট জেনারেল জিয়ার জন্যে সৌভাগ্য কাঠি বয়ে আনল। অগাস্ট অভ্যুত্থান না হলে জিয়ার উত্থান হতো না। বাংলাদেশের ইতিহাসও অন্যভাবে লিখা হতো। ফারুক-রশিদকে ধন্যবাদ, তারা জিয়ার জন্য খুলে দিলো ভবিষ্যতের অবারিত দ্বার।

অপরদিকে জিয়া চীফ অব স্টাফ হওয়ায় খালেদ মোশাররফ শংকিত হয়ে পড়লো। তাঁর স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। তাঁকে এবং শাফায়েতকে কলা দেখিয়ে মেজররা বঙ্গভবনে ঢুকে পড়েছে। তাদের দুজনেরই অবস্থান নাজুক হয়ে উঠল। তাদের এখন প্রেস্টিজ পুনরুদ্ধার করার সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া ছাড়া আর কোনো পথ খোলা রইলো না। এই প্রেক্ষাপটেই পরবর্তীতে সংঘটিত হয় খালেদ-শাফায়াতের ৩রা নভেম্বর অভ্যুত্থান।

১৫ অগাস্ট অভ্যুত্থানের সময় মুজিবুর রহমানকে কী বাঁচানো যেতো?

১। অভ্যুত্থানের গতিধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হলে শেখ সাহেবের ওপর আকস্মিক হামলার ভয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। সবকিছু জানা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট ইনটেলিজেন্স এজেন্সিগুলো তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়। তাঁর মৃত্যুর জন্য গোয়েন্দা ব্যর্থতা যথেষ্ট দায়ী। এমনকি ক্যান্টনমেন্টে সেনা গোয়েন্দা সংস্থাও সামান্য তৎপর থাকলে শুরুতেই এই অভিযান নস্যাৎ করে দেয়া যেতো।

২। শেখ সাহেবের নিজের প্রাইভেট বাসভবনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল খুবই দুর্বল ও অপ্রতুল। বাসায় সুপরিকল্পিত সুদৃঢ় রক্ষাব্যবস্থা থাকলে এসব আক্রমণ সফল হতো না। তাঁর বাসায় প্রচুর অটোমেটিক অস্ত্রশস্ত্র মজুত থাকলেও সেগুলোর সুষ্ঠু ব্যবহার করে কড়া প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়নি। ১৫ অগাস্টের সকালবেলা তাঁর বাসার ভেতর থেকে আরো ২৫/৩০ মিনিট সময় প্রতিরোধ করতে পারলে ততোক্ষণে রক্ষীবাহিনী, আর্মি, বিডিআর বা অন্যান্য সংস্থা তাঁর সাহায্যার্থে বাসায় পৌঁছে যেতে পারতো। রাষ্ট্রপতির বাসভবনে আর্মি ও পুলিশ গার্ডদের আত্মসমর্পণ বড়ই লজ্জাজনক ব্যাপার। তারা সবাই মিলে ফাইট করলে নিশ্চিতভাবে আক্রমণ বহুক্ষণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হতো। কিন্তু পুলিশেরা কিছুক্ষণ ফাইট করলেও সেনা সদস্যরা নিষ্ক্রিয় থাকে। এটা দায়িত্বহীনতার চরম দৃষ্টান্ত।

৩। বাসার ভেতর দোতলায় ওঠার পেছন দিকের গেইটটা খোলা থাকায় হামলাকারীরা বিনা ক্লেশে বিনা বাধায় দোতলায় উঠার অপ্রত্যাশিত সুযোগ পেয়ে যায়। দোতলায় উঠার সিঁড়িঘরের নিচের এবং উপরের দুটি সিকিউরিটি দরজা বন্ধ থাকলে

হামলাকারীদের পক্ষে সরাসরি অপারেশন করা খুবই দুষ্কর হতো। ফলে দোতলার উপর থেকে কামাল-জামালের পক্ষে দীর্ঘক্ষণ প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হতো। প্রচুর Re-action টাইমও পাওয়া যেতো, ফলে শেখ সাহেব বেঁচে যেতেও পারতেন। রাত্রিবেলা দোতলায় উঠার সিঁড়িঘরের দুটি দরজাই খোলা রাখার পরিণতি বড়ই আত্মঘাতী প্রমাণ করে।

৪। আপদকালীন সময়ে তড়িৎ 'রিঅ্যাকশন' করার জন্য কোনো আপদকালীন প্ল্যান বা বিশেষ ট্রুপ রাখা হয়নি। এমনকি তড়িৎ মেসেজ পাঠাবার জন্য টেলিফোন ব্যতীত কোনো বিকল্প ওয়্যারলেস ইত্যাদিও রাখা হয়নি। যার জন্য গোলাগুলি শুরু হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি যথেষ্ট সময় ও সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও সঠিক স্থানে তড়িৎ গতিতে মেসেজ পৌঁছাতে সক্ষম হননি।

৫। এতবড় রক্ষীবাহিনীর কমান্ড চ্যানেল ছিল বড়ই দুর্বল, অথর্ব, অকর্মণ্য। চরম মুহূর্তে কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান ছিলেন লন্ডনে। তা না হলে হয়তো রক্ষীবাহিনীর তড়িৎ 'রি-অ্যাকশন' শেখ সাহেবকে রক্ষা করতে পারতো। ৩২ নং রোড থেকে শেরেবাংলা নগর রক্ষীবাহিনী হেডকোয়ার্টার ছিল মাত্র কয়েক মিনিটের দূরত্বে। অথচ ঘটনার সময় কয়েক হাজার রক্ষী সৈন্য নীরবে প্রস্তুত অবস্থায় ওখানে দাঁড়িয়ে রইল। ফারুকের ট্যাংকের হুমকির মুখে তারা কাঠের পুতুলের মতো অনড় হয়ে রইল। রক্ষীবাহিনী মুভ না-করার একমাত্র অজুহাত হিসাবে বলা যায় যে ভোর বেলায়ই মেজর ফারুক ট্যাংক বাহিনী নিয়ে তাদের মুখোমুখি হয়। ট্যাংকের তাক করা ব্যারেলের মুখে তারা ছিল অসহায় এবং প্রবল মনস্তাত্ত্বিক আতংকের মধ্যে।

৬। গোয়েন্দা প্রধান সালাহউদ্দিন সর্বপ্রথম সফিউল্লাহকে আনুমানিক ভোর ৫-১৫ মিনিটের সময় অভ্যুত্থানের খবর দেন। তখন যদি সেনাপ্রধান নিজ উদ্যোগে ৪৬ ব্রিগেডের কিছু সৈন্য তড়িৎ গতিতে মুভ করাতে পারতেন, তাহলে হয়তো রাষ্ট্রপ্রধানকে বাঁচানো সম্ভব হতো। ৫-৩০ মিনিটে শাফায়েতকে যখন রাষ্ট্রপতি ভবন আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ দেয়া হয় তখন যদি সে জরুরীভিত্তিতে কোয়ার্টার গার্ডগুলো থেকে জরুরীভিত্তিক কিছু সৈন্য রওয়ানা করাতো তাহলেও তাঁর বেঁচে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সংকট মুহূর্তে সে একটি সৈন্যও মুভ করাতে ব্যর্থ হয়।

৭। মধ্যরাতে অভ্যুত্থান ঘটতে যাচ্ছে, Source মারফত এরকম একটি আভাস সর্বপ্রথম জানতে পারেন ডি.জি.এফ.আই. ব্রিগেডিয়ার রউফ, রাত আনুমান ২/৩ টার দিকে। কিন্তু তিনি কাউকে জানাননি। জেঃ শফিউল্লাহ বললেন, তিনি যে ব্যবস্থা নেন তা হলো, অজানা আশঙ্কায় তিনি তৎক্ষণাৎ তার বাসা ত্যাগ করে পরিবার নিয়ে বাসার পেছনে মাঠে একটি গাছের নিচে লুকিয়ে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঘটনার পর সকালে বেরিয়ে এসে ব্যর্থতা ঢাকতে বিভিন্ন অসংলগ্ন গল্পের অবতারণা করেন এবং পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি দেন। অথচ সময়মতো সংশ্লিষ্ট সবাইকে সংবাদ দিলে খুব ভোরেই Counter ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হতো। গোয়েন্দা প্রধান নিশ্চিতভাবে ভোর ৫টার আগেই আক্রমণের খবর পান। তিনি তখনও যদি সরাসরি রাষ্ট্রপ্রধানকে রেড টেলিফোনে কথা বলে তাকে শুধু সাবধান করে দিতেন, তাহলেও তাঁর বেঁচে যাওয়ার ৮০% সম্ভারনা ছিল।

৮। শেখ সাহেব অসম সাহসে এতো গোলাগুলির মধ্যে হামলাকারীদের সামনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে না এসে যদি তাঁর কামরার দরজা লক করে বাড়ির ভেতরেই কোথাও কোনো ঘরে লুকিয়ে থাকতেন, তাহলেও হামলাকারীদের পক্ষে তাঁকে খোঁজ করে বের করতে সময় লাগতো। চাইলে পেছন দিক দিয়ে তিনি হয়তো পালিয়ে যেতেও পারতেন। কিন্তু তিনি কোনোরকম আত্মরক্ষামূলক পন্থার কথা চিন্তাই করলেন না।

ক্যান্টনমেন্ট থেকে কেন সৈন্য মুভ করলো না?

১৫ অগাস্ট ভোর সাড়ে পাঁচটায় রাষ্ট্রপতি ভবন আক্রান্ত হলো। ক্যান্টনমেন্টে DGFI প্রধান ও সেনা গোয়েন্দা প্রধান ভোর ৫টার আগে অভিযানের খবর পান। সেনাবাহিনী প্রধান খবর পান আনুমানিক সোয়া ৫টায়। রাষ্ট্রপতির সাথে তার ফোনে শেষ কথা হয় ৫-৫০ মিনিটে। ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়েত জামিল আক্রমণ সংবাদ পান সাড়ে ৫টায়। ভোর ৬টার দিকে রাষ্ট্রপতি আক্রান্ত হয়ে নিহত হলেন। ক্যান্টনমেন্ট থেকে তাঁর সাহায্যার্থে একটি সৈন্যও মুভ করলো না।

এ ব্যর্থতা কার? বহুদিন পর আজও সবার মনে বারবার এই একটি জিজ্ঞাসা তাড়া করে ফেরে— সৈন্য কেন মুভ করলো না ক্যান্টনমেন্ট থেকে? এ নিয়ে আজও চলছে প্রবল বাক-বিতণ্ডা।

প্রথমেই সেনাপ্রধান শফিউল্লাহ আক্রমণের সংবাদ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়েত জামিলকে ভোর সাড়ে ৫টায় ফোন করেন এবং তৎক্ষণাৎ সৈন্য মুভ করতে বলেন। কিন্তু শাফায়েত জামিল বলছে সেনাপ্রধান তাকে আক্রমণের সংবাদ ঠিকই দেন কিন্তু সৈন্য মুভ করার কোনো নির্দেশ দেননি। তাই তখন সে মুভ করেনি। তার ভাষায় শফিউল্লাহ তখন কেবল বিড়বিড় করেছেন। কিন্তু তাকে কোনো নির্দেশ দেননি। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত।

মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে রাষ্ট্রপতির সাথে ফোনে কথা হয় শফিউল্লাহর। তাঁর ফোন পেয়েই শফিউল্লাহ আবার তাকে ফোন করেন আনুমানিক ৬টার দিকে, কিন্তু তখন দেখা যায় শাফায়েত তার ফোনের রিসিভার তুলে রেখেছে। এক্সচেঞ্জ থেকে অপারেটর তা-ই জানায় শফিউল্লাহর ভাষ্য।

এমতাবস্থায় শফিউল্লাহ্ খালেদ মোশাররফকে ফোন করে তার বাসায় ডেকে এনে তাকে শাফায়েত জামিলের কাছে পাঠান শাফায়েতের সৈন্য মুভ করাতে। শফিউল্লাহ চর্তুদিকে ক্রমাগত ফোন ঘোরাতে থাকেন। ডেপুটি চীপ জিয়াউর রহমানসহ অন্যান্যের সাথে কথা বলতে থাকেন। তারপর তিনি তৈরি হয়ে অফিসে ছুটে যান।

এখানে তার যে বড় ভুল হলো : তা হলো, তিনি যখন দেখলেন যেকোনো কারণেই হোক শাফায়েত জামিল তার সৈন্য মুভ করছে না, তখন তিনি মাত্র পাঁচশ'গজ দূরে অবস্থিত শাফায়েতের হেডকোয়ার্টারে একে ওকে না পাঠিয়ে নিজেই ছুটে গিয়ে শাফায়েতের সৈন্য মুভ করাবার ব্যবস্থা নিতে পারতেন। এখানে তিনি চরম মুহূর্তে টেলিফোন ও কথাবার্তায় অযথা সময় নষ্ট করলেন। কিন্তু একটি সৈন্যও ক্যান্টনমেন্ট

থেকে মুভ করাতে পারলেন না। এখানে সেনাপ্রধান দ্রুততার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হলেন। তবে সঙ্গত কারণেই বোঝা যায়, ঘটনার ভয়াবহতায় তিনি দারুণ Tension-এ ভুগছিলেন। সম্ভবত উত্তেজিত হয়ে কিছুটা নার্ভাসও হয়ে পড়েন। তবে ঘটনাপ্রবাহ থেকে বোঝা যায়, ঐ মুহূর্তে তার ব্যর্থতা ছিল অনিচ্ছাকৃত, মোটেই ইচ্ছেকৃত নয়। কাদের সিদ্দিকী বলেছেন : তিনি ছিলেন অথর্ব, অকর্মণ্য। আমার মনে হয় এগুলো যথেষ্ট রূঢ় শব্দ।

শাফায়েতের এ্যাকশন

এবার আলোচনা করা যাক ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল সাফায়েত জামিলের এ্যাকশন নিয়ে। তার অধীনে ছিল প্রায় ৪০০০ সৈন্য। ১৫ই আগস্ট ভোরবেলা কর্নেল শাফায়াতের ট্রুপ দ্বারা আক্রান্ত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সে ভোরবেলা আক্রমণের নিশ্চিত সংবাদ পাওয়া সত্ত্বেও তার সৈন্যদের নিরস্ত্র করার বা ফিরিয়ে আনার কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি। বরং এখানে ওখানে ঘুরে ফিরে সময় ক্ষেপণ করে। সে জিয়াউর রহমানের দিকে যায় নির্দেশ নিতে। সেনাপ্রধানকে সে এড়িয়ে চলে।

ক্যান্টনমেন্ট থেকে তার সৈন্য মুভ করতে না-পাবার জন্য সরাসরি সেনাপ্রধানকেই দায়ী করে বলেছে, তিনি তাকে কোনো নির্দেশ দেন নাই, তাই সে তার সৈন্য মুভ করতে পারে নাই। এরপর বলছে, রশিদ সকালবেলা তার কাছে এসেছিল দুটি ট্যাংক এবং দু'ট্রাক সৈন্য নিয়ে। এগুলো দেখে সে তখন কোনো এ্যাকশনে যেতে পারেনি।

আসুন, সকাল থেকে শাফায়েতের কিছু এ্যাকশনের পর্যালোচনা করা যাক :

এক। ভোরবেলা আনুমানিক ৬ ঘটিকায় শাফায়েত সেনাপ্রধানের কাছে থেকে সংবাদ পায় রাষ্ট্রপতি-ভবন আক্রান্ত হয়েছে। তিনি মহা বিপদে আছেন। শাফায়েত একজন Independant ব্রিগেড কমান্ডার। বঙ্গবন্ধুর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত কমান্ডার হিসাবেই কর্নেল শাফায়াতের হাতে তিনি ঢাকার পদাতিক ব্রিগেডের পরিচালনা ভার ন্যস্ত করে নিশ্চিত থাকেন। তার কী করণীয় ছিল? তার কী বিপদগ্রস্ত রাষ্ট্র প্রধানের সাহায্যার্থে তৎক্ষণাৎ সৈন্য নিয়ে রওয়ানা দেয়া উচিত ছিল না? সেনাপ্রধান কী তাকে এ্যাকশনে যেতে নিষেধ করেছিলেন?

দুই। মেজর রশিদ ছিল শাফায়েতেরই অধীনস্থ একটি ইউনিটের কমান্ডার। তারই অধীনস্থ একটি ইউনিট এবং অধীনস্থ একজন কমান্ডিং অফিসার, ১৫ অগাস্ট ভোরবেলা ট্রুপস নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, রাষ্ট্রপতি ভবন আক্রমণ করে ঘটাল হত্যাকাণ্ড। এরজন্য কী রশিদ একাই দায়ী? দায়-দায়িত্বের কোনো কিছুই কী কমান্ডার শাফায়েত জামিলের উপর বর্তায় না?

তিন। ভোর ৬টার সময় রাষ্ট্রপ্রধানকে খুন করে স্বয়ং রশিদই প্রথমে ছুটে আসে ৪৬ ব্রিগেড লাইনে কর্নেল শাফায়েত জামিলের কাছে। তাকে সেলুট ঠুকে বলে, Sir we have killed Sheikh. অধীনস্থ অফিসার একজন রাষ্ট্রপ্রধানকে খুন করে এসে তার

বসের কাছে রিপোর্ট করার পর একজন কমান্ডার হিসেবে কর্নেল শাফায়েতের কী উচিত ছিল না তৎক্ষণাৎ তাকে এ্যারেস্ট করে সেনাপ্রধানকে রিপোর্ট করা?

চার। রাষ্ট্রপ্রধান হত্যাকাণ্ডের সংবাদ সরাসরি হত্যাকারীর কাছ থেকে পেয়েও সে তৎক্ষণাৎ সেনাপ্রধানকে ফোন করে জানায়নি। বরং সে হেঁটে হেঁটে ডেপুটি চীফের বাসার দিকে রওয়ানা দেয়। প্রশ্ন হলো, এরকম দুর্যোগ মুহূর্তে সে হেঁটে হেঁটে সময় নষ্ট করবে কেন? সময় বাঁচাতে তার গাড়ি ব্যবহার করলো না কেন? সে ঐ মুহূর্তে তার চীফের দিকে না গিয়ে ডেপুটি চীফ জিয়াউর রহমানের দিকেই বা যাবে কেন?

পাঁচ। সারা সকালবেলা রশিদ, ডালিমরা, এমনকি পরে ফারুকও তার এরিয়াতে খোলামেলা হাসিখুশি ঘোরাফেরা করছিল। শাফায়াত তার এরিয়াতে চার হাজার সৈন্য নিয়ে কেন তাদের ঘেরাও করতে পারলো না?

সে ছিল ঢাকার পদাতিক ব্রিগেডের স্বাধীন কমান্ডার। চরম মুহূর্তে চার হাজার সৈন্য নিয়ে সে নিষ্ক্রিয় বসে থাকলো। দেশের রাষ্ট্রপ্রধান আক্রান্ত হয়েছেন জেনেও নিজে থেকে সে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তাই উপলব্ধি করলো না।

শাফায়েতের এই নিষ্ক্রিয়তা ছিল ইচ্ছেকৃত, নাকি অনিচ্ছাকৃত? এসব গভীর বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

ছয়। ভোর সাড়ে ৪টার দিকে তারই ব্রিগেড এরিয়ার ভেতর দিয়ে ফারুক ট্যাংক নিয়ে অগ্রসর হয়। প্যারেড গ্রাউন্ডে তারই জওয়ানরা তাকিয়ে তা দেখলো। শাফায়েতের বাসার পেছন দিয়েই ট্যাংকগুলো বিকট শব্দে গড়িয়ে গেল। প্রশ্ন হলো, ফারুক কোন সাহসে বড় রাস্তা দিয়ে না গিয়ে একেবারে শাফায়েতের ব্রিগেড লাইনের ভেতর দিয়ে তার আক্রমণ অভিযান পরিচালনা করলো? এটা কী কোনো পূর্ব সমঝোতার ইঙ্গিত বহন করে?

আবার রশিদই কীভাবে সাহস করে দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে হত্যা করে প্রথমেই সরাসরি ছুটে এসে তার বসের কাছে সশরীরে রিপোর্ট করে? কেউ খুন করে একান্ত সুহৃদ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো কাছে কী ঘটনা ফাঁস করতে ছুটে আসে?

সাত। রশিদকে প্রশ্ন করেছিলাম, তোমরা তোমাদের আক্রমণ প্ল্যানে ট্যাংক-কামান সবকিছু নিয়ে দুর্বল রক্ষীবাহিনীকে কাউন্টার করার চিন্তায় থাকলে, কিন্তু ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত শাফায়েতের শক্তিশালী ৪৬ ব্রিগেডের কথা একবারও চিন্তা করলে না। রশিদ মুচকি হেসে জবাব দিয়েছিল, 'সেতো আমাদেরই লোক। তার তরফ থেকে আমরা কোনো আক্রমণ আশংকা করিনি। শাফায়েত এবং তার অধীনস্থ অফিসার সবাইতো ব্যাপারটা জানতো।' আমার কিন্তু তখন রশিদের কথা মোটেই বিশ্বাস হয়নি। এখন সামগ্রিক ঘটনাগুলো মিলিয়ে দেখলে বুঝতে কষ্ট হয় না, রশিদ একেবারে মিথ্যা বলেনি।

আট। শফিউল্লাহর নির্দেশে খালেদ মোশাররফ কর্নেল শাফায়েতের হেড কোয়ার্টারে আনুমানিক সকাল ৭টার দিকে পৌঁছান। কিছুক্ষণ পর তিনি সেখান থেকে সেনাপ্রধানকে ফোন করেন, 'স্যার আমাকে ওরা আসতে দিচ্ছে না, কথা বলতেও

দিচ্ছে না। কারা তাকে আটকে রাখলো, কারা তাকে কথা বলতে দিচ্ছিল না? কর্নেল শাফায়েতের অফিসে কাদের সাহস হতে পারে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে আটকে রাখার? খালেদ-শাফায়েত ঐ সময় কীসের নাটক করছিলেন? সবই পাঠকদের অনুমানের ওপর ছেড়ে দেয়া হলো।

নয়। সকাল ৯ ঘটিকা। সেনাপ্রধান শফিউল্লাহ এসে উপস্থিত হন ৪৬ ব্রিগেড লাইনে। তিনি সেখানে অপেক্ষা করতে থাকেন শাফায়েত জামিলের জন্য। সে ঐখানে তার এরিয়াতেই ছিল। কিন্তু সে কাছে না এসে দূরে দূরেই থাকে। তারই স্টাফ অফিসার মেজর হাফিজউদ্দিন এগিয়ে আসে রশিদকে নিয়ে সেনাপ্রধানের কাছে। তাকে অনুরোধ করে রেডিও স্টেশনে যাওয়ার জন্য। শাফায়েতের সমর্থন না থাকলে কীভাবে তার স্টাফ অফিসার সেনাপ্রধানকে এভাবে অনুরোধ করতে পারে? রশিদের মতে, মেজর হাফিজউদ্দিন শুরু থেকেই তাদের সাথে ছিলো। এবং তার মাধ্যমেই প্রথম থেকে তারা শাফায়াতের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিল।

দশ। কিছুক্ষণ পরই আসেন বিমান ও নৌবাহিনী প্রধান। তিন সশস্ত্র বাহিনী প্রধান উপস্থিত শাফায়েত জামিলের এরিয়াতে। তারা সেখানে আধঘণ্টার উপর অবস্থান করেন। তারা মিটিং করেন। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে শাফায়েত তাদের ধারে-কাছেও আসলো না, এড়িয়ে চললো। কিন্তু কেন? কেন শাফায়েত তাদেরকে এড়িয়ে চলতে চাইলো? কেন ঐ সময় তিন প্রধানের সামনে এসে অভিযান করার জোর দাবি জানালো না? হাস্যকর হলেও সত্য, একটি পত্রিকায় শাফায়াত ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেছে, ঐ দিন সেনাপ্রধানের তত্ত্বাবধানে বিদ্রোহ দমনের কোনো যৌথ পরিকল্পনা (স্থল, নৌ, বিমান) কেন গ্রহণ করা হল না,' অথচ মজার কথা, সকাল থেকেই বিদ্রোহের তিন প্রধান নেতা মেজর রশিদ, ফারুক, ডালিম, তার এরিয়াতেই তার করমর্দন দূরত্বে নির্বিঘ্ন ঘুরাফেরা করছিল। সেতো হাত বাড়িয়েই তাদের ধরতে পারতো। তা না করে সে এখন বলছে, সেনাপ্রধান ওদের ধরতে কেন যৌথ অভিযান পরিকল্পনা করলেন না?

বহুদিন পর জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে শফিউল্লাহ বক্তব্য রেখেছেন। "ঐদিন ঢাকার ৪৬ ব্রিগেড কমান্ডার আমার কথা শুনেনি, সে জিয়াউর রহমানের কথা শুনেছে" এসব তথ্য বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

এগার। সেখান থেকে তিন বাহিনী প্রধান রেডিও স্টেশনে রওয়ানা দেন। কিছুক্ষণ পর প্রচারিত হয় নতুন সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য। এতোদিন পর শাফায়েতের আস্ফালন, 'ওরা ভীরু। ওরা খুনীদের কাছে নতজানু হয়েছে'। প্রশ্ন জাগে, এতোই যদি বঙ্গবন্ধুর প্রতি শাফায়েত অনুগত ছিল, তাহলে তখনই তার চার হাজার সৈন্য নিয়ে তিন চীফসহ ডালিম, রশিদ, ফারুক, মোশতাক সবাইকে রেডিও স্টেশনে গিয়ে ঘেরাও করে গ্রেফতার করলো না কেন? সকাল থেকে ওরাতো তার এরিয়াতেই ঘোরাফেরা করছিল। সকাল থেকে এতোকিছু ঘটে যাচ্ছে অথচ চরম মুহূর্তে বঙ্গবন্ধুর প্রিয় বিশ্বস্ত কমান্ডারের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই! সকল দায়দায়িত্ব সে এড়িয়ে চলে। অবশেষে যুদ্ধ যখন শেষ, তখন কমান্ডারের মঞ্চে আগমন ও তলোয়ার ঘুরিয়ে লম্ফঝম্ফ!

বার। একটি বড় সত্য তিক্ত হলেও সবাইকে উপলব্ধি করতে হবে। ঘটনার দিন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যু সংবাদটাই ছিল সবচেয়ে বড় বজ্রপাত। এতে তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্টি হয় 'ক্ষমতার বিশাল শূন্যতা'। কমান্ডাররা ভাবলো, শেখ সাহেবই যখন নেই, তখন তার জন্য শূন্য মার্গে ফাইট করে আর কী হবে? যা হবার তো হয়ে গেছে, এখন বাস্তবকে মেনে নেয়াই ভালো। হাজার হোক অভ্যুত্থানটাতো ঘটিয়েছে জ্ঞাতি ভাইরাই। অতএব 'Salute the rising sun'। ১৫ অগাস্ট সকালবেলা সময় যতোই গড়াতে থাকে, ক্যান্টনমেন্টের সর্বত্র জ্ঞাতি ভাইদের সাফল্যকে সমর্থন করার প্রবণতাও ততোই বাড়তে থাকে।

এর প্রতিফলন দেখতে পাই বেলা ১১টার দিকে ৪৬ ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে কর্নেল শাফায়েতের হেডকোয়ার্টারে। অভিযানের সাফল্যে সবাই আনন্দিত। উল্লসিত শাফায়েত জামিল। উল্লসিত উপস্থিত শ'খানেক অফিসার। সর্বত্র কনগ্র্যাচুলেশন, কনগ্র্যাচুলেশন! শাফায়েত এবং খালেদ দু'জনই শেখ সাহেবের প্রিয়পাত্র হলেও ঐদিন, ঐ মুহূর্তে তাদের কাউকে বিমর্ষ দেখতে পাইনি।

সময় বিভ্রাট

১৫ অগাস্ট সকালবেলা অভ্যুত্থান ঘটনাগুলো কখন কীভাবে ঘটলো, কে কখন খবর পায়, এসব নিয়ে বিভিন্ন মহলে আজও যথেষ্ট বিভ্রান্তি রয়ে গেছে। আসুন, প্রকৃত অবস্থা অবহিত হওয়ার জন্য ঘটনাগুলো ধারাবাহিকভাবে যাচাই করে দেখা যাক।

১। ১৪/১৫ অগাস্ট রাত ১০ ঘটিকার সময় ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ২ ফিল্ড রেজিমেন্ট মেজর রশিদের নেতৃত্বে তাদের কামানগুলো নিয়ে নির্মাণাধীন নিউ এয়ারপোর্ট (জিয়া বিমান বন্দর আরও পরে হযরত শাহ জালাল (র) আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর) এর দিকে বেরিয়ে যায়।

২। প্রায় একই সময়ে মেজর ফারুকের নেতৃত্বে ক্যান্টনমেন্টের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত বেঙ্গল ল্যান্সারের ট্যাংকগুলো ইউনিট লাইন থেকে এক এক করে বেরিয়ে নিউ এয়ারপোর্টে গিয়ে সমবেত হতে থাকে।

৩। মেজর ফারুক অভিযানকারী অফিসারদের চূড়ান্ত ব্রিফিং করেন ১৪/১৫ অগাস্টের রাত ১২-৩০ মিনিট থেকে ১-০০ টার মধ্যে।

৪। ক্যান্টনমেন্ট থেকে ফারুকের নেতৃত্বাধীন বেঙ্গল ল্যান্সারের প্রথম ট্যাংকটি নিউ এয়ারপোর্ট এলাকা ত্যাগ করে ১৫ অগাস্ট ভোরবেলা ৪-৩০ মিনিটে। আশেপাশে তখন ফজরের আজান হচ্ছিল। শেষ ট্যাংকটি যখন এয়ারপোর্ট ত্যাগ করে, তখন বেলা প্রায় ৫টা।

৫। এই গ্রুপের ২০/২৫ মিনিট আগে অর্থাৎ আনুমানিক ৪টায় রাইফেলধারী সৈন্যরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন কমান্ডারের নেতৃত্বাধীনে আপন আপন টার্গেটের উদ্দেশ্যে এয়ারপোর্ট এরিয়া ত্যাগ করে। তারা ভোর ৪–৪৫ মিনিট থেকে ৫টার মধ্যেই সমবেত হয় ধানমণ্ডির বিভিন্ন টার্গেট পয়েন্টে। মূল টার্গেট শেখ সাহেবের বাসায় আক্রমণ শুরু হতে কিছুটা দেরি হলেও অন্যান্য টার্গেট অর্থাৎ শেখ মনি ও রব

সেরনিয়াবাতের বাসায় আক্রমণ শুরু হয়ে যায় ৫টার দিকেই। ধানমণ্ডি এলাকা তখন রীতিমতো রণক্ষেত্র।

৬। শেখ সাহেবের বাসায় আক্রমণ শুরু হয় ৫-২০ মিনিট থেকে। রাষ্ট্রপতি মৃত্যুমুখে পতিত হন আনুমানিক ৬ ঘটিকায়।

তারা যেভাবে সংবাদ পেলেন

১। আক্রমণ অভিযানের খবর/সংবাদ সর্বপ্রথম সোর্স মারফত জানতে পারেন DGFI ব্রিগেডিয়ার রউফ। তিনি নিজেই বিবৃতিতে স্বীকার করেন, জনৈক গোয়েন্দা ডাইরেক্টর ফোন করে তাকে রাত আড়াইটা থেকে তিনটার মধ্যে ক্যান্টনমেন্টে ট্যাংক ও সৈন্য চলাচলের জরুরি সংবাদ দেন। যদিও ট্যাংক এর বেশ পরেই বড় রাস্তায় নামে। অবশ্য ক্যান্টনমেন্টের বাইরে ভেতরে অস্বাভাবিক মুভমেন্ট আগেই শুরু হয়ে যায়।

এই জরুরি গোপন বার্তা পেয়েও রউফ চুপচাপ থাকেন। তিনি রাষ্ট্রপতিকে সাবধান করে দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। তিনি যদি তৎক্ষণাৎ সরাসরি রাষ্ট্রপতিকে রেড টেলিফোনে ফোন করে সতর্ক করে দিতেন, অথবা বাসার গার্ডরুমেও ফোন করে গার্ডদেরকেও সতর্ক করে দিতেন, তাহলে হয়তো ১৫ অগাস্টের এই রক্তপাত নিশ্চিতভাবে এড়ানো যেতো।

রাত তিনটা থেকে ভোর সাড়ে ৬টা পর্যন্ত DGFI ব্রিগেডিয়ার রউফ কী করলেন? তা আজও রহস্যাবৃত। জানা যায় ঐ সময় মহা বিপদ আশংকা করে তিনি তার পরিবারকে নিয়ে বাসার পেছনে দূরে গল্‌ফ্ কোর্সে একটি গাছের নিচে লুকিয়ে থাকেন। এবং তিনি সকাল বেলা ৬-৩০ মিনিটে লুঙ্গি পরে শফিউল্লাহ্‌র ব্যাটম্যান হাবিলদার হায়দারের সহায়তায় দেয়াল টপকে পিছনদিক থেকে সেনাভবনে প্রবেশ করেন। তখন ভেতরে জেঃ জিয়া শফিউল্লাহর সাথে কথা বলছিলেন। রউফ তখনই হন্তদন্ত হয়ে হাজিন হন। DGFI রউফের এসব নাটকীয় ব্যবহার এবং অস্বাভাবিক আচরণের হেতু আজও রহস্যাবৃত।

২। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রপতি মুজিব এই সময় ব্রিগেডিয়ার রউফকে DGFI পোস্ট থেকে সরিয়ে অন্যত্র বদলি করেন। এতে রউফ অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি DGFI দায়িত্বভার বুঝিয়ে দিতে গড়িমসি করছিলেন। পরে ১৫ অগাস্ট হস্তান্তর করবেন বলে ঠিক হয়। ঐ দিনই অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। নবনিযুক্ত DGFI কর্নেল জামিল ভোরবেলা রাষ্ট্রপতির ফোন পেয়েই আক্রান্ত বাড়ির দিকে ছুটে যান, অথচ ব্রিগেডিয়ার রউফ মধ্যরাতে আক্রমণ সংবাদ পেয়েও নিষ্ক্রিয় থাকেন। রাষ্ট্রপ্রধানকে সতর্ক করার প্রয়োজন বোধ করেননি। অফিসিয়ালী তিনিই ছিলেন তখনো ডি জি এফ আই প্রধান। এসব ব্যাপার বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

৩। ডি এম আই লে. কর্নেল সালাহউদ্দিন সৈন্য ও ট্যাংক চলাচলের সংবাদ পান ৪-৩০ মিঃ থেকে ভোর ৫টার মধ্যে। এরপর তিনি ছুটে আসেন সেনাপ্রধান শফিউল্লাহর বাসায় এবং তাকে অবস্থা অবহিত করেন। অর্থাৎ সেনাপ্রধানকে তিনি সম্ভাব্য

অভিযানের সংবাদটি দেন ভোর ৫-১৫ থেকে ৫-৩০ মিনিটের মধ্যে। এখানে সেনাপ্রধান জেনারেল শফিউল্লাহর ভাষ্য হল তিনি গোয়েন্দা অফিসার কর্নেল সালাহউদ্দিনের সাথে তার ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়েই কথা বলছিলেন। আর্টিলারি ও আমার্ড ইউনিটগুলোর আক্রমণ সংবাদ পেয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে কর্নেল সালাহউদ্দিনকে বলেন, তুমি শাফায়াতের কাছে যাও এবং তাকে ট্রুপ মুভ করতে বলো। বাকি আমি দেখছি। গোয়েন্দা অফিসার কর্নেল সালাউদ্দিনের পরবর্তী কার্যক্রম জানা যায়নি।' (দুর্ভাগ্যবশত সালাহউদ্দিন ঢাকার বাইরে মানসিকভাবে অসুস্থ থাকায় তার সাক্ষাৎকার নেয়া সম্ভব হয়নি।)

এরপর শফিউল্লাহ ঘরে ঢুকে রাষ্ট্রপতিকে পাওয়ার জন্য ক্রমাগত ফোন ঘোরাতে থাকেন কিন্তু পান না। অতঃপর তার স্ত্রীকে ডেকে ফোন ঘুরাতে বলেন এবং তিনি নিজে আর্মি লাইনে কর্নেল শাফায়াতকে ফোন ঘুরাতে থাকেন এবং তাকে পেয়ে যান। তিনি শাফায়াতকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি আর্মড আর্টিলারি মুভ সম্বন্ধে কিছু জান?'

'না, স্যার।'

'তারা বঙ্গবন্ধুর বাসা আক্রমণ করেছে, তুমি তাড়াতাড়ি ফার্স্ট এবং ফোর্থ বেঙ্গলকে পাঠাও তাদের বাধা দেয়ার জন্য। তখন সময় আনুমানিক ৫.৩০ মিনিট। শাফায়াত জামিল অবশ্য বিভিন্ন বিবৃতিতে শফিউল্লাহর এই নির্দেশের কথা অস্বীকার করেছে।

৪। এই সময় থেকে সেনাপ্রধান শফিউল্লাহ রাষ্ট্রপতিকে পাওয়ার জন্য ক্রমাগত ফোন ঘোরাতে থাকেন। কিন্তু পান না। অবশেষে ৫-৫০ মিনিটের দিকে রাষ্ট্রপতিকে ফোনে পেয়ে গেলেন। রাষ্ট্রপতি তাকে বাসা আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ দেন। তখন সময় আনুমানিক ৫-৫৫ ঘটিকা। এরপরই রাষ্ট্রপতির মৃত্যু ঘটে। তখন সময় আনুমানিক ৬ ঘটিকা। শুক্রবার, ১৫ অগাস্ট ১৯৭৫।

৫। শেখ সাহেবের ফোন পেয়েই প্রথমে শফিউল্লাহ্ ৪৬ ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল শাফায়েত জামিলকে ফোন করে আক্রমণের সংবাদ দেন। তখন সময় সকাল ৬-০০ টা থেকে ৬-০৫ মিনিট। ঐ সময় অভ্যুত্থানের অন্যতম প্রধান নেতা মেজর রশিদও পৌঁছে গেছে শাফায়েত জামিলের বাসায় তাকে এই সংবাদ শোনাতে যে রাষ্ট্রপতিকে তারা হত্যা করেছে।

৬। সকাল ৬টা থেকে ৮টা, এই সময়টাতে শাফায়াতের ৪৬ ব্রিগেডের সৈন্যদল অকুস্থলে পৌঁছে যেতে পারতো Counter action-এর জন্য, যদিও শেখ সাহেবকে তখন বাঁচানো সম্ভব হতো না। এই সময় শফিউল্লাহ ও শাফায়েত জামিল নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি করতে করতেই সময় পার হয়ে যায়।

৭। সকাল ৯-৪৫ মিনিট। সেনা, নৌ, বিমান, তিনবাহিনী প্রধান শাফায়েত জামিলের ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে উপস্থিত। অনুষ্ঠিত হয় গুরুত্বপূর্ণ মিটিং, কিন্তু শাফায়েত জামিল অনুপস্থিত!

৮। সকাল ১১-৩০ মিনিট। রেডিওতে তিন বাহিনী প্রধানের নতুন রাষ্ট্রপতির প্রতি আনুগত্য ঘোষণা।

১৫ অগাস্ট অভ্যুত্থানে ফারুক-রশিদের সাফল্যের প্রধান কারণসমূহ

সংক্ষেপে নিম্নলিখিত কারণসমূহ চিহ্নিত করা যায় :

- শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আক্রমণ প্ল্যানের গোপনীয়তা রক্ষা করা।
- মূল লক্ষ্য ছিল স্থির, অভিন্ন এবং 'এক'— অর্থাৎ ৩২ নং রোডের ৬৭৭ নং বাড়ি দখল করা এবং রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবকে গ্রেফতার অথবা হত্যা। সবাই একক লক্ষ্য অর্জনেই সর্বশক্তি নিয়োগ করে।
- রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিব ছিলেন রাষ্ট্রের সকল শক্তির কেন্দ্রবিন্দু ও উৎস। প্রথম আঘাতেই তাঁর নিহত হওয়ার সংবাদে সর্বত্র দেখা দেয় বিরাট 'শূন্যতা' ও অনিশ্চয়তা। তাঁর মৃত্যুতে তাঁর সমর্থকরা মানসিকভাবে একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। তাঁর মৃত্যুই ছিল ফারুক-রশিদের সাফল্যের প্রধান কারণ।
- TOTAL SURPIRZE আক্রমণের আকস্মিকতায় রক্ষীবাহিনী, বিডিআর, মুজিব বাহিনী সবাই হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। কোনো বাহিনী থেকে সামান্যতম প্রতিরোধ বা প্রতিআক্রমণ আসেনি। ফলে আক্রমণকারী দুটি ইউনিট নির্বিঘ্নে তাদের অবস্থান অতি দ্রুত সুসংহত করতে সক্ষম হয়।
- আক্রমণের ব্যাপকতায় সবাই নিশ্চিত ধরে নেয় যে, এটা সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থান, অতএব স্বাভাবিকভাবেই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। সে কারণেই অবস্থা ভালোভাবে পরখ না করে কেউ তাৎক্ষণিক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে।
- মুজিব হত্যার রেডিও ঘোষণা ঢাকা ও দেশের সর্বত্র ভয়ংকর মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি করে, এতে সবাই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। ঘোষণাও দেয়া হয় সেনাবাহিনীর নামে। সেটাও ছিল একটা বড় 'ব্লাফ'। রেডিওতে তিন বাহিনী প্রধানের নতুন রাষ্ট্রপতির প্রতি আনুগত্য ঘোষণা আগুনে জল ঢালার কাজ করে।
- ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত ৪৬ ব্রিগেডের রহস্যজনক নিষ্ক্রিয়তা এবং চরম মুহূর্তে সেনাবাহিনী প্রধানের সিদ্ধান্তহীনতায় সময় নষ্ট করা।
- আক্রমণকারীদের তড়িৎ এ্যাকশন। নির্মম হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে অতি দ্রুততার সঙ্গে 'ঝটিকা' আক্রমণ চালিয়ে সকল সম্ভাব্য টার্গেট ধ্বংস সাধন করে এক ভীতিকর পরিবেশের সৃষ্টি করা।
- আক্রমণ পরবর্তী সময়ে তড়িৎ গতিতে স্থিতিশীল অবস্থা ফিরিয়ে আনা। সময়ক্ষেপণ না করে নতুন প্রেসিডেন্ট মনোনয়ন এবং তিন বাহিনী প্রধানের আনুগত্য গ্রহণের ব্যবস্থা করা।
- ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের সকল অফিসার ও সৈনিকবৃন্দের বিনা দ্বিধায় পরিবর্তিত অবস্থাকে সাদরে গ্রহণ ও জ্ঞাতিভাইদের সাফল্যে প্রকাশ্য উল্লাস। সেনা-অভ্যুত্থানের প্রতি জনগণের প্রকাশ্য ও মৌন সমর্থন।
- অলৌকিকভাবে একের পর এক ঘটনাবলি সুষ্ঠু টাইম-টেবিল অনুযায়ী সম্পন্ন হওয়া। কোথাও সামান্যতম বাধাবিঘ্ন না ঘটা।

১৫ অগাস্ট অভ্যুত্থান : একটি পর্যালোচনা

১। ১৫ অগাস্ট অভ্যুত্থান ছিল এক ব্যতিক্রমধর্মী অভ্যুত্থান। এই উপ-মহাদেশের ইতিহাসে এ ধরনের সেনা-অভ্যুত্থান এই প্রথম। মাত্র গুটিকয় জুনিয়র অফিসার ও মাত্র দুটি ইউনিটের অভিযানে এমন একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী অভ্যুত্থান ঘটলো, যা কি-না একটি প্রতিষ্ঠিত সরকারের পতন ঘটিয়ে দিলো।

২। জুনিয়ার অফিসারদের দ্বারা এরকম সরকার পরিবর্তনকারী অভ্যুত্থান রাজনৈতিক ইতিহাসেও খুব বেশি একটা নেই। বলা যেতে পারে, এদিক দিয়ে ফারুক-রশিদ সেনা অভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করল। মাত্র একই দিনে এতো অল্প সময়ের ব্যবধানে এতগুলো বড় বড় ঘটনা একের পর এক ঘটে গেল, যেন ঘড়ির কাঁটাকেও হার মানায়। যে কারণে ঐ দিনের বিভিন্ন ঘটনার সময়ক্ষণ নিরূপণ করতে মাথা গুলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। এতবড় নাটকীয় ঘটনা রাজনৈতিক এবং মিলিটারি ইতিহাসেও এক বিরল দৃষ্টান্ত।

৩। অবাক হতে হয় এই দেখে যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো এতোবড় কালজয়ী একজন নেতার নেতৃত্বাধীনে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা একটি মাত্র আঘাতেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়লো। তাঁর সৃষ্ট রক্ষীবাহিনী, মুজিব বাহিনী, পুলিশ, বিডিআর কিছুই এগিয়ে এলো না সময়মতো অভ্যুত্থান প্রতিরোধ করতে। এই ব্যর্থতা ছিল অমার্জনীয়।

৪। 'শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে'—ভোর ছ'টায় রেডিওতে ডালিমের এই ঘোষণার সাথে সাথে বিদ্যুতের মতো সারাদেশে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে, যা বোমার আতঙ্কের চেয়েও মারাত্মক আতঙ্ক সৃষ্টি করে। সংবাদটি শুনে রাষ্ট্রীয় কাঠামোও ভেঙ্গে পড়ে। রাষ্ট্রীয় কাঠামো 'এক ব্যক্তি ভিত্তিক' হওয়াতেই এমনটি ঘটলো। ব্যক্তির পতনে সরকারেরও পতন ঘটলো। শেখ সাহেব প্রথম আঘাতেই নিহত না হলে এ অভ্যুত্থান নির্ঘাত ব্যর্থ হতো। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

৫। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এবং সেনাবাহিনীর তরুণ অফিসারদের মধ্যে সম্পর্ক ভালো ছিল না। পাকিস্তান আমলে সেনাবাহিনীর সাথে বরাবর তাদের দ্বন্দ্ব ছিল। পুরাতন সেই রেশ ধরেই এই মনোমালিন্য। একমাত্র শেখ সাহেবই সেনা অফিসারদের সাথে সরাসরি সম্পর্ক রাখতেন। অন্যরা এড়িয়ে চলতেন। অপরদিকে সেনাবাহিনীর তরুণ মুক্তিযোদ্ধা অফিসাররাও আওয়ামী লীগ নেতাদের পছন্দ করতো না। কারণ তারা মনে করতো দেশের মুক্তির জন্য তারা যখন যুদ্ধ করেছে, তখন এইসব রাজনৈতিক নেতা, পাতি-নেতারা কলকাতায় বসে ফুর্তি করেছে। এধরনের মানসিকতা যথেষ্ট ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থার এতই অধঃপতন ঘটে যে সর্বস্তরের মানুষ তখন একটা পরিবর্তন কামনা করছিল। অতঃপর সেই পরিবর্তন যখন হলো, তখন তা রক্তাক্ত হলেও সবাই যেন এটাকে বরণ করে নিলো। দুর্ভাগ্যবশত তার মৃত্যু ঘটে এমন এক সময় যখন তাঁর জনপ্রিয়তা নেমে আসে সম্ভবত তাঁর জীবনকালের সর্বনিম্নে।

৬। ফারুক-রশিদ দুজনই বারবার বলেছে, শেখ সাহেবকে হত্যা করার পরিকল্পনা আমাদের ছিল না। ক্যান্টনমেন্টে ধরে এনে সেখান থেকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নিয়ে গিয়ে বিচারের ব্যবস্থা করাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। দু'জনেই বলে, বিচারে অবশ্যই তাঁর ফাঁসি হতো এবং আমরা সেখানেই সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসির আদেশ কার্যকর করতাম। এটা যুদ্ধাবস্থায় যেমনটি করা হয়। অন্য কথায় তাদের যে প্ল্যান ছিল, তাতে শেখ সাহেবকে হত্যা করারই প্ল্যান ছিল। তা অপারেশনের ছত্রছায়ায় হোক, আর ট্রায়ালের নামেই হোক। তবে একজন রাষ্ট্রপ্রধানকে এভাবে সংক্ষিপ্ত ট্রায়ালে প্রকাশ্য ফাঁসি দিয়ে বা গুলি করে হত্যা করা আরও কলঙ্কজনক ব্যাপার হতো। তাই নয় কী?

৭। ১৫ আগস্ট ভোর বেলা ৫-৩০ মিনিটে আর্মি চীফ সেনা গোয়েন্দা প্রধানের কাছ থেকে আক্রমণ সংবাদ পান। শফিউল্লাহ বলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ শাফায়াতকে ফোন করে সৈন্য মুভ করতে বলেন। কিন্তু সে সৈন্য মুভ করেনি। বরং সে জিয়াউর রহমানের দিকে হেঁটে হেঁটে তার কাছ থেকে নির্দেশ নিতে যায়। কমান্ডার শাফায়াত বলছে, সেনা প্রধান কিছুই বলেননি, শুধু বিড়বিড় করেছেন। চরম মুহূর্তে দুই কমান্ডারের বিপরীতমুখী কথাবার্তা তদন্ত ও গবেষণার দাবি রাখে। কারণ ঐ গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে কে দায়িত্বভার এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করছিল তা নিরূপণ করা অতীব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

বলাবাহুল্য ঐ সময় ৪৬ ব্রিগেড থেকে ত্বরিত সৈন্য মুভ করলে অভ্যুত্থান নস্যাৎ করে দেয়া যেত এমন কি রাষ্ট্রপ্রধানকে বাঁচানোর যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। রাষ্ট্রপতি আক্রান্ত হয়েছেন, এ সংবাদটি শুনা মাত্রইতো বঙ্গবন্ধুর বিশ্বস্ত কমান্ডার শাফায়াত জামিলের উচিত ছিল নিজে কিছু সৈন্য নিয়ে উন্মাদের মতো অকুস্থলে ছুটে যাওয়া এবং তারই অধীনস্থ ইউনিট টু-ফিল্ডকে নিরস্ত্র, নিবৃত্ত করা। এমন কি ৬টার সময়ও সৈন্য মুভ করা যেত। কিন্তু কমান্ডার শাফায়াত সে সুযোগ গ্রহণ করেননি। ট্রুপ কমান্ডার হিসেবে এটা তার চরম ব্যর্থতা। তারই অধীনস্থ ইউনিট, অধীনস্থ অফিসার অভিযান চালিয়ে রাষ্ট্রপতি ও দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে আক্রমণ করে হত্যা করল, তাৎক্ষণিকভাবে সংবাদ পেয়েও কমান্ডার শাফায়াত তার ইউনিটকে ফিরিয়ে আনার কোনো ব্যবস্থা নিলো না, নিষ্ক্রিয় থাকলো। স্বাভাবিক অবস্থায় এ ধরনের ব্যর্থতার জন্য যে-কোন কমান্ডারের কোর্ট মার্শাল হত কিন্তু শাফায়াত অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণ করেছে।

৮। ১৫ অগাস্ট চরম মুহূর্তে জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশাররফ, শাফায়েত জামিল এই তিনজনের ভূমিকাই ছিল রহস্যজনক। এই তিনজনেরই কী অভ্যুত্থানকারীদের সাথে আলাদা আলাদাভাবে কোনো গোপন সমঝোতা ছিল? ঘটনা প্রবাহ থেকেই এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেতে হবে। হামলাকারিগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে প্রথমেই সেনাবাহিনী প্রধানকে ফোন না করে শেখ সাহেব বিভিন্নদিকে যোগাযোগ করতে যাবেন কেন? তাহলে কী তিনি সেনাপ্রধানের ওপর থেকেও কিছুটা আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন?

৯। ১৫ অগস্ট ভোর ৬ টার সময় শফিউল্লাহ, খালেদ মোশারফকে পাঠান ৪৬ ব্রিগেড-এ শাফায়েতের কাছে তড়িৎ ট্রুপ মুভ করাবার জন্য। তিনি সেখানে গিয়ে বলেন কেউ মুভ করছে না। বরং উল্লাস করছে। তার কথায় শফিউল্লাহ আরো কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। বেলা ১১টায় ৪৬ ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে খালেদ ও শাফায়েত উভয়কেই দেখা যায় উল্লসিত মুডে। খালেদ মোশাররফ ঐ সময় অপারেশন নিয়ন্ত্রণ করছিলেন এবং রক্ষীবাহিনীসহ অন্যান্য সবাইকে শান্ত করতে মহাব্যস্ত ছিলেন। তিনি ঐ মুহূর্তে একটি বড় কাজ করেন, তাহলো নিজ দায়িত্বে ফারুকের জন্য ট্যাংকের গোলা সরবরাহ করার জন্য জয়দেবপুরে অবস্থিত ১৬ বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক মেজর শাহজাহানের মাধ্যমে ডিপোকে নির্দেশ দেন। ট্যাংকের গোলা পেয়ে ফারুকের ট্যাংক বাহিনী বিরাট শক্তিতে পরিণত হয়। অথচ ভোরবেলা তার ট্যাংক ছিল গোলাবিহীন লৌহ শকট মাত্র। ঐ মুহূর্তে ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং কর্নেল শাফায়েত জামিলের হাসিখুশি উল্লাস সবাইকে অবাক করেছিল, কারণ এ দু'জনই ছিলেন শেখ সাহেবের প্রিয় ব্যক্তি।

১০। সকাল ৮-৩০ ঘটিকা পর্যন্ত আর্মি হেডকোয়ার্টার ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত। যখন এতোবড় একটি অভ্যুত্থান ঘটনা ঘটেছে, তখন শফিউল্লাহর উচিত ছিল আর্মি হেডকোয়ার্টারের সৈন্যদের সাধারণ সতর্ক অবস্থায় (Stand to) রাখা উচিত ছিল। অন্তত মেইন গেইটটা বন্ধ করে সরাসরি ভিজিটারস অনুপ্রবেশ বন্ধ করা উচিত ছিল। কিন্তু আপদকালীন অবস্থায় খোদ আর্মি হেডকোয়ার্টারেই সাধারণ সতর্ক অবস্থা গ্রহণ করতে সবাই ভুলে যায়। ঐদিন সকালে আর্মি হেডকোয়ার্টারে সামান্যতম নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও সশস্ত্র জিপ নিয়ে মেজর ডালিম সরাসরি হেডকোয়ার্টারে ঢুকে সেনাপ্রধান শফিউল্লাহকে ধরে নিয়ে যেতে পারতো না। এমনকি প্রস্থানের সময়ও আউট গেইট বন্ধ থাকলে সে বেরোতে পারতো না। সতর্ক অবস্থা থাকলে ট্রুপস আশেপাশে আত্মরক্ষামূলক পজিশনে থাকতো। কিন্তু হায়! সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় সেনাবাহিনী প্রধান তার আপন হেডকোয়ার্টারে ধরা খেলেন। এটা কী অভূতপূর্ব ঘটনা।

বলাবাহুল্য, ঐদিন ঐ সময় সেনাপ্রধানকে ধরে রেডিও স্টেশনে না নিয়ে যেতে পারলে ১৫ অগাস্টের ইতিহাস ভিন্নভাবে লেখা হতো। হয়তো জাতিকে ৩ এবং ৭ নভেম্বরের রক্তাক্ত অভ্যুত্থান দেখতে হতো না।

১১। মেজর ডালিম যখন উন্মুক্ত স্টেনগান নিয়ে শফিউল্লাহর রুমে ঢুকে, তখন সে ছিল অস্ত্রহাতে মারমুখী। শফিউল্লাহ তার সাথে যেতে অস্বীকার করলে সে হয়তো যেকোনো অঘটন ঘটিয়ে দিতে পারতো। তবে যদি হেডকোয়ার্টারে সতর্কাবস্থা থাকতো এবং প্রোটেকশন ট্রুপস থাকতো, তাহলে শফিউল্লাহকে এভাবে জবরদস্তি অফিস থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো না। বরং ডালিমকেই আটক করে বন্দি করা সম্ভব হতো।

আজ ২০ বছর পরও এ প্রশ্নটি আমার মনের ভেতর তাড়া করে ফেরে। কী হতো যদি ঐ সময় ডালিমের বন্দুকের মুখে চীফ অব স্টাফ সেনাসদর থেকে বেরিয়ে না যেতেন? কী হতো যদি ডালিমকে সেনা হেডকোয়ার্টারে ঘেরাও করে বন্দি করা হতো?

কী হতো যদি শাফায়েত সাহস করে ডালিম-রশিদকে তার ব্রিগেড এরিয়াতে তার কয়েক হাজার সৈন্য নিয়ে বন্দি করে আটকে ফেলতো!

১২। শাফায়েত বলেছেন তার ৪৬ ব্রিগেডে নাকি সকাল থেকে সারাদিনই প্রস্তুত হয়ে বসে ছিল। সে ছিল স্বাধীন ব্রিগেড কমান্ডার। সেতো ইচ্ছে করলে যেকোনো সময় 'প্রতি-আক্রমণে' যেতে পারতো। ভোর বেলা শফিউল্লাহ যখন তাকে ফোন করেছিল, তখন গেল না কেন? তখন তার রহস্যজনক নিষ্ক্রিয়তার কী কারণ ছিল? পরে যায় নাই, হয়তো ভালোই হয়েছে, তা না হলে নিজেদের মধ্যে বড় রকমের রক্তপাত হয়ে যেতো, লাভ বিশেষ কিছুই হতো না। এছাড়া তার নিজের ব্রিগেডের সৈন্যরাও দুপুরের পর আপন ভাইদের সাফল্যে প্রকাশ্যে উল্লাস করেছিল। তখন ছিল ভিন্ন পরিস্থিতি।

১৩। ভোর ৫-১৫ মিনিটে শফিউল্লাহ যখন প্রথম ডিএমআই কর্নেল সালাউদ্দিন মারফত খবর পান, তখন যদি তিনি বিভিন্নস্থানে টেলিফোন এবং আলোচনায় সময় নষ্ট না করে, সরাসরি তাঁর বাসার ৫০০ শত গজ দূরে অবস্থিত ৪৬ ব্রিগেডের বেঙ্গল লাইসেন নিজেই গাড়ি নিয়ে ছুটে গিয়ে ব্যক্তিগত নির্দেশে ইনফেন্ট্রি ইউনিটগুলোর কিছু ট্রুপস ঘটনাস্থলের দিকে মুভ করাতেন, তাহলেও অভ্যুত্থানকারী গ্রুপের ঘেরাও করা এবং মোকাবেলা করা সম্ভব হতো। হয়তো শেখ সাহেবকে বাঁচানো সম্ভব হতো। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে সেনাপ্রধান করুণভাবে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলেন।

১৪। DGFI ব্রিগেডিয়ার রউফ, ট্যাংক মুভমেন্টের খবর পান রাত তিনটায়। তখন তিনি খবর পেয়েই রাষ্ট্রপতিকে সতর্ক করে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। করলে তার প্রাণ রক্ষা পেতে পারত। এমন কী সেনা প্রধানকেও তিনি জানাননি। ব্রিঃ রউফ কেন এমন করলেন, তা বরাবর রহস্য হয়েই থাকবে।

১৫। কেউ বিমান হামলার কথা চিন্তা করেননি। এই সময় আক্রমণকারী ইউনিটের ওপর ত্বরিত বিমান হামলা (Air Strike) চালালে পরিস্থিতির মোড় হয়তো সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দেয়া সম্ভব হতো।

১৬। ১৫ অগাস্ট অভ্যুত্থানে কোনো বিদেশি শক্তির গোপন হাত ছিল কি-না, এ নিয়ে বহু জল্পনাকল্পনা। বিশেষ করে সিআইএ'র কথা উল্লেখ করা হয়। আসলে অভ্যুত্থানটি সংঘটিত হয় সম্পূর্ণভাবে অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা থেকে। এটাই ছিল বড় সত্য। অন্তত ফারুক, রশিদ আমাকে হলফ করে বলেছে, কোনো বিদেশি শক্তির সাথে তারা এ নিয়ে কখনো যোগাযোগ করেনি। খন্দকার মোশতাক আহমদের সাথে আমেরিকান সিআইএ'র যোগসূত্র রয়েছে বলে অনেকেই ধারণা করেন। তবে প্রকৃত অভ্যুত্থান ঘটানোর পেছনে সরাসরি কোনো বৈদেশিক শক্তির হস্তক্ষেপের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। খন্দকার মোশতাক আহমদ অগাস্ট অভ্যুত্থানে সরাসরি জড়িত থাকার প্রমাণ না থাকলেও ঘটনা প্রবাহ প্রমাণ করে নেপথ্যে তিনি ছিলেন। অভ্যুত্থানের মেজররা কোনো বিদেশি শক্তির মদদে ও উস্কানিতেও এ কাজ করেছে বলে নিশ্চিত কোনো প্রমাণ নেই। এ সম্বন্ধে আমার জ্ঞান সীমিত থাকায় এর বেশি বলা সম্ভব নয়।

১৭। অগাস্ট অভ্যুত্থান সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ মিলিটারি ঝটিকা অপারেশন। এই অভ্যুত্থানে সাফল্যজনক Execution এবং পরিসমাপ্তিতে কার ভূমিকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল? মেজর ফারুক, না রশিদের? সত্যি বলতে কী ফারুক যদিও অপারেশনের মূল কমাণ্ডার ছিল, কিন্তু সে তো আক্রমণ গড়িয়ে দিয়েই খালাস আক্রমণ পরবর্তী Re-Organisation বা পুনর্বিন্যাস পর্বের দুরূহ কাজটি ঠাণ্ডা মাথায় যে ব্যক্তিটি সামাল দেয়, সে হলো মেজর রশিদ। ১৫ অগাস্টের সকাল ৬টা থেকে দক্ষ হাতে ঘূর্ণায়মান পরিস্থিতি সামাল না দিলে তাদের পুরো অভ্যুত্থানটিই মাঠে মারা পড়তো। এমন কি নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং তাকে ধরে আনার জটিল কাজটিও ছিল রশিদের। অতএব আমার ব্যক্তিগত মূল্যায়নে কমান্ডার ফারুকের চেয়ে মেজর রশিদের পাল্লাই মনে হয় ভারি।

১৮। ফারুক-রশিদের অভ্যুত্থান স্রেফ দুটি ইউনিটের 'একক' দুঃসাহসিক অভিযান মনে করা হলেও, ততোটুকু 'একক' ছিল না। ফারুক-রশিদ নিজেরাই বলেছে, আমাদের পেছনে 'বড়রা' কেউ না থাকলে কীভাবে এতোবড় অভিযানে অগ্রসর হতে সাহস করতাম! এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তাদের পেছনে বড় র‍্যাংকের কিছু অফিসার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদদ জুগিয়েছিলেন। ৪৬ ব্রিগেডের নিষ্ক্রিয়তাই এর একটি দৃষ্টান্ত। ১৫ অগাস্ট অভ্যুত্থান ঘটনায় জিয়ার প্রসঙ্গে জেনারেল শফিউল্লাহ লন্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'জনমত' পত্রিকায় মন্তব্য করেন—'তিনি শুধু অনুমান নয়, তিনি সব কিছুই জানতেন।' ভোরবেলা ছয়টার দিকে খালেদ মোশাররফকে পাঠানো হয় শাফায়েত জামিলের হেডকোয়ার্টারে তাকে তাড়া দেয়ার জন্য। খালেদ সেখান থেকে শফিউল্লাহকে জানান, 'স্যার, ওরা আমাকে আসতে দিচ্ছে না। কিছু বলতেও দিচ্ছে না।' এসব কীসের ইঙ্গিত? তাহলে কী জিয়া-খালেদ-শাফায়েত তিন জনেরই অভ্যুত্থানের প্রতি নেপথ্য সমর্থন ছিল? সামগ্রিকভাবে ঘটনাপ্রবাহ গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে, ফারুক-রশিদ অভ্যুত্থান ঘটানোর মতো কিছু একটা ঘটনা ঘটাতে পারে, এরকম অস্পষ্ট ইনফরমেশন আলাদা আলাদাভাবে জিয়া, খালেদ, শাফায়েত, রউফের কমবেশি গোচরীভূত ছিল। তারা খুব সম্ভব চেপে যান এই মতলবে যে, পাগলদের প্ল্যান যদি সত্যিই সাকসেসফুল হয়ে যায়, তাহলে ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করার সহজ সুযোগটির সদ্ব্যবহার করতে তারা যেন অন্যদের চেয়ে পিছিয়ে না থাকেন।

১৯। রাষ্ট্রপতির বাসভবনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল খুবই দুর্বল ও পরিকল্পনাবিহীন। গোলযোগপূর্ণ দিনগুলোতেও তাঁর বাসস্থানে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের কথা কেউ চিন্তা করেনি। বারবার প্রশ্ন জাগে, দোতলায় তাঁর শোবার ঘরে ওঠার সিঁড়িঘরের নিচের এবং উপরের দুটি দরজাই সারারাত কেন খোলা থাকলো? রাষ্ট্রপতির বাসভবনে এই মারাত্মক নিরাপত্তা ত্রুটি তার জীবননাশের জন্য বহুলাংশে দায়ী।

২০। ফারুক-রশিদের আক্রমণ প্ল্যানে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত ৪৬ ব্রিগেডকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করা এবং তাদের তরফ থেকে কোনোরকম বিপদ আশঙ্কা না করাটা ছিল রহস্যময় ব্যাপার। ফারুক তার সমস্ত ট্যাংক বাহিনী নিয়ে দুর্বল রক্ষীবাহিনীকে

ঠেকাবার চিন্তায় থাকে। ৪৬ তম ইনফেন্ট্রি ব্রিগেডের কথা তারা একবারও ভাবল না। এর রহস্য কী হতে পারে?

এ প্রশ্নটি প্রথমে আমি ফারুককে করেছিলাম। সে বললো; এটা রশিদকে জিজ্ঞাসা করুন, কারণ সে-ই Somehow ৪৬ ব্রিগেডকে ম্যানেজ করেছিল।

আমি মেজর রশিদকে সরাসরি এ প্রশ্নটি করলাম। তার মুখে রহস্যভরা মুচকি হাসি। সে বললো, স্যার ব্যাপারটা আপনিই বুঝে নিন। তার কথা শুনে আমি তাজ্জব বনে গেলাম।

তাহলে এজন্যই কী ভোরবেলা শফিউল্লার ফোন পাওয়ার পরও শাফায়েত জামিল তার ট্রুপস্ মুভ করতে গড়িমশি করে! তাহলে এজন্যই কী ভোরবেলা হত্যাকাণ্ডের পর মেজর রশিদ প্রথমেই ছুটে আসে ৪৬ ব্রিগেড লাইনে শাফায়েত জামিলের কাছে? "আমরা মুজিবকে হত্যা করেছি" এ ঘটনা প্রকাশ করার পর সঙ্গে সঙ্গেইতো শাফায়েত রশিদকে তার এরিয়াতে আটক করা উচিত ছিল। তাই নয় কী? তা না করে সে হেঁটে হেঁটে ডেপুটি চীফের বাসার দিকে রওয়ানা দেয়। এখানে অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যেখানে রক্ষী বাহিনী মুভ করতে পারে নাই কারণ তাদেরকে ফারুকের শক্তিশালী ট্যাংক বাহিনী বিপজ্জনকভাবে ঘেরাও করে রেখেছিল, সেখানে শাফায়াতের ৪৬ ব্রিগেড মুভ করার কোনো অসুবিধা বা বাধা বিপত্তি ছিল না। কারণ তাদেরকে ফারুক-রশিদ অজ্ঞাত কারণে কোনো ট্রুপ দিয়ে ঘেরাও করে রাখেনি, অথবা ঘেরাও করে রাখার দরকার মনে করেনি। তারা ছিল মুক্ত। তবু রহস্যজনকভাবে শাফায়াত একটি সৈন্যও অকুস্থলে মুভ করালো না। এর তাৎপর্য কী হতে পারে?

বস্তুত, অগাস্ট অভ্যুত্থানের সময় কমান্ডার শাফায়াত জামিলের "দ্বৈত ভূমিকা" প্রতিটি পদক্ষেপে প্রকট হয়ে উঠে, যদিও পরবর্তী পর্যায়ে তার হাঁকডাক তর্জন-গর্জনের জন্য সবার কাছে তা ধূমাচ্ছন্ন থেকে যায়।

১৫ অগাস্ট ঘটনায় কমান্ডার শাফায়াত জামিল এক রহস্যময় বহুরূপী ভূমিকায় অবতীর্ণ। সে নায়ক, না ভিলেন? তার নিষ্ক্রিয়তা ও ব্যর্থতা ছিল ইচ্ছাকৃত, নাকি অনিচ্ছাকৃত? ইতিহাসের প্রয়োজনে তা নির্ণয় করা অতীব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

রাষ্ট্রপতি মুজিবের সাফল্য ও ব্যর্থতা

রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একজন লৌহ মানব ও মহান জনপ্রিয় নেতা। তাঁর অঙ্গুলি হেলনে লক্ষ লক্ষ মানুষ স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বলি দেয়। তিনি ছিলেন বাঙালি স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন নেতা। অবাক ব্যাপার, তার করুণ মৃত্যুতে কোথাও টু শব্দটি উচ্চারিত হলো না। তার বিশাল জনপ্রিয়তা হঠাৎ করে কোথায় যেন হাওয়ায় উড়ে গেল! কেন তাঁর মৃত্যুতে জনতার বিপ্লব হলো না? কেন জনতার প্রতিরোধ গড়ে উঠলো না? তাহলে পঁচাত্তরে এসে তিনি কী সত্যি সত্যি সাধারণ মানুষের ভালোবাসা হারিয়ে ফেলেছিলেন? তিনি কী সাধারণ মানুসের ধর্ম প্রবণতায় আঘাত দিয়েছিলেন? তিনি কী সেনাবাহিনীকে বিশ্বাস করেননি? তিনি কী বাঙালিদের

আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেননি? কোথায় ছিল তাঁর ব্যর্থতা? ইতিহাসের প্রয়োজনে এগুলো খতিয়ে দেখার গুরুত্ব রয়েছে।

যে ব্যক্তি বাঙালি জাতির স্বাধীন সত্তার জন্য মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সময় থেকে আয়ুব খাঁ, ইয়াহিয়া খাঁর সময় পর্যন্ত আজীবন সংগ্রাম করে গেলেন, জেল-জুলুম নির্যাতন সহ্য করলেন, তাঁর ভাগ্যে এরকম একটি করুণ মৃত্যুই কী জাতির কাছ থেকে প্রাপ্য ছিল?

অগাস্ট অভ্যুত্থানের দুটি দিক আছে; একটা রাজনৈতিক, অন্যটা সামরিক। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অগাস্ট অভ্যুত্থান ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণ করলে স্বীকার করতেই হবে ১৫ অগাস্ট অভ্যুত্থান ছিল বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। একটি নাটকীয় সশস্ত্র অভ্যুত্থান। এর আগে এই উপমহাদেশে কেন, বিশ্বের কোথাও জুনিয়ার অফিসারগণ কর্তৃক এতবড় একটা অভ্যুত্থান এত সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করার দৃষ্টান্ত বিরল। মাত্র ১২ ঘন্টার ব্যবধানে স্বাধীনতার স্বপক্ষের একটা প্রতিষ্ঠিত সরকারের উৎখাত ও নতুন সরকারের পত্তন! সবই এক অবিশ্বাস্য কাহিনী বটে। রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান তখন প্রবল প্রতাপশালী ব্যক্তি। তাঁর আঙ্গুলি হেলনে আর্মি, বিডিআর, পুলিশ, রক্ষীবাহিনী আর হাজার হাজার স্বেচ্ছাবাহিনী যুবলীগ মুহূর্তে ছুটে যেতে প্রস্তুত। তাঁরই বিরুদ্ধে একটা সশস্ত্র উৎখাত অভিযান পরিকল্পনা দুঃসাহসিক কাজই বটে। অভিযান যেভাবে শুধু দুটি ইউনিটের লোকজন নিয়ে শুরু করা হয়, তাতে সামান্য প্রতিরোধে যে কোনো মুহূর্তে তা ব্যর্থ হতে পারতো। ব্যর্থতা ও সাফল্য ছিল অতি ক্ষীণ সুতায় ঝুলানো। মাত্র ক'জন তরুণ অফিসার শুধু দুটি ইউনিটের ওপর ভরসা করে কতো বড় ঝুঁকি নিয়ে যে অভিযান চালিয়েছিল, তা ভাবতেও অবাক লাগে। জুনিয়ার অফিসার বিধায় তাদের প্রতি এই দুটি ইউনিট ছাড়া আর কোনো আর্মি ইউনিট বা ফরমেশনের সমর্থনও ছিল না। কেউ কিছু জানতোও না।

এই অভিযানে মিলিটারি অপারেশনের প্রত্যেকটা Principle বা সমরনীতির চমৎকার সমন্বয় ঘটেছিল, যথা–

a. Maintenance of Aim
b. Security of Information
c. Surprise and Deception
d. Timings
e. Bold & Quick Execution
f. Quick Consolidation and Reorganisation
g. Exploitation of Success

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, সামরিক বাহিনীর নামে ক্ষমতা দখলের ঘোষণা থাকলেও সামরিক বাহিনীর চীফসহ সকল সিনিয়ার অফিসারই এই অভ্যুত্থানের প্ল্যান

প্রোগ্রাম সম্বন্ধে ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ। বরং ১৫ অগাস্টের ভোরবেলা খোদ ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের সকল অফিসার ও সৈনিকবৃন্দ একটি সেনা-অভ্যুত্থানের সংবাদ পেয়ে যারপরনাই বিস্মিত হয়। সবার চোখে ধুলো দিয়ে সবাইকে বোকা বানিয়ে ক'জন তরুণ অফিসার গোটা সামরিক বাহিনীর নামে যেভাবে একটা অভ্যুত্থানের ভোজবাজি দেখালো, তা সামরিক বাহিনীর জন্য এক বিরাট বিস্ময় হয়ে থাকবে।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পর ইসলামিক ভাবধারা ও ইসলামপন্থী রাজনীতির সমাধি রচিত হয়েছিল। অগাস্ট অভ্যুত্থানের পর আকস্মিকভাবে ইসলামপন্থী দলগুলোর ওপর থেকে নিষিদ্ধ আবরণ অনেকখানি সরে গেল। আবার তারা ভেসে উঠবার সুযোগ পেয়ে গেল। সমাধি রচিত হলো বহু বিতর্কিত বাকশালের। প্রমাণ হলো, বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শ সত্ত্বেও এদেশে ধর্ম সাধারণ মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

রাজনৈতিক দিক দিয়ে বলতে গেলে বলা যেতে পারে, এরকম সশস্ত্র অভ্যুত্থান ভবিষ্যৎ হিংসা ও সশস্ত্র রাজনীতির বীজ বপন করল। জনগণ হয়তো বাকশাল আওয়ামী লীগ সরকারের পরিবর্তন চেয়েছিল, কিন্তু শেখ সাহেবের ও তাঁর পরিবারের মর্মান্তিক মৃত্যু কামনা করেনি। শেখ সাহেব ছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের জনক, জাতির অবিসংবাদিত নেতা, যাঁর প্রতি বাংলার মানুষ তাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অকৃপণভাবে উজাড় করে দিয়েছিল। ভবিষ্যতে এত বিশাল মাপের বেসামরিক রাজনৈতিক নেতার উত্থান অন্তত এদেশে ঘটার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ।

বাঙালি জাতির ইতিহাসে জাতিধর্ম নির্বিশেষে এতো অধিক সংখ্যক লোক কোনোদিন এক ব্যক্তির পেছনে এতো অন্ধভাবে দাঁড়ায়নি। এতো বিশাল জনসমর্থন ও জনপ্রিয়তা নিয়ে তাঁর মতো রাজনৈতিক নেতার ব্যর্থতা ও অকালমৃত্যু, চিরশোষিত এই অভাগা জাতির জন্য দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে?

তাঁর মৃত্যু বিশাল মাপের রাজনৈতিক নেতার অন্তর্ধানের সুযোগে এ-দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে মিলিটারি রাজনীতির সূচনা হয়। উচ্চাভিলাষী সামরিক অফিসারদের ঘন ঘন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের বে-আইনি প্রবণতা রাজনৈতিক অঙ্গনে অস্থিরতা ও অরাজকতার সৃষ্টি করে। অথচ সামরিক বাহিনীর যারা শৃংখলা ভঙ্গ করে সামরিক পোশাক পরিধান করে ক্ষমতা দখলের অনিয়মতান্ত্রিক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিলেন, তাদের কারো নিরপেক্ষ বিচার বা কোর্ট মার্শাল হয়নি বরং তারা বিভিন্নভাবে লাভবান ও পুরস্কৃত হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিব উচ্চাভিলাষী শৃংখলা ভঙ্গকারী এসব অফিসারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া শুরু করেছিলেন। কিন্তু এর জন্য তাঁকে জীবনের বিনিময়ে চরম মূল্য দিতে হয়। ভবিষ্যতে এসব মিলিটারি উচ্চভিলাষী ব্যক্তিরা বারবার উচ্ছৃংখল হয়ে যাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলে তৎপর হতে না পারে তার জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন করতে হবে।

ডিফেন্স উপদেষ্টা জেনারেল ওসমানী ঢাকা স্টেশনের অফিসার্স ও জেসিওদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছেন। সামনে উপবিষ্ট ডানদিক থেকে সেনা প্রধান জেঃ জিয়া, জেঃ খলিলুর রহমান ও স্টেশন কমান্ডার কর্নেল হামিদ।

মেজর হাফিজউদ্দিন

কর্ণেল তাহের

বিগ্রেডিয়ার খুরশিদ

৩ নভেম্বর, অভ্যুত্থান
খালেদের উত্থান-পতন

খোন্দকার মোশতাক আহমদের শাসন আমল বেশিদিন স্থায়ী হলো না। মাত্র দুইমাস ১৮ দিন পর সংঘটিত হলো বাংলাদেশের দ্বিতীয় সেনা অভ্যুত্থান। ঘটলো ক্ষমতার হাতবদল। ৩ নভেম্বর ১৯৭৫-এর মধ্যরাতে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে সংঘটিত হলো এই 'রক্তপাতহীন' নীরব অভ্যুত্থান। একটি বুলেটও ফায়ার হলো না, একটি প্রাণীও মারা পড়লো না। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সৈনিক ব্যারাকে সবাই ছিল ঘুমিয়ে। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে সবাই শুনল গভীররাতে অভ্যুত্থান ঘটেছে। ক্ষমতার হাতবদল হয়েছে। সেনাবাহিনী প্রধান জিয়াউর রহমান বন্দি। সি.জি.এস. ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ নতুন সেনা নায়ক। কর্নেল শাফায়েত জামিলের ৪৬ ইনফেন্ট্রি-ব্রিগেডের পরিচালনায় ঘটেছে এই অভ্যুত্থান, তারাই এখন সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে।

সারা ক্যান্টনমেন্টে বিরাজ করছিল শান্ত অবস্থা। রাস্তাঘাটে লোক চলাচল ছিল স্বাভাবিক। অভ্যুত্থান ঘটনার সামান্যতম উত্তাপও ছিল না কোথাও। শুধু দেখা গেল, জেনারেল জিয়ার বাসভবনের গেইটে উর্দীপরা বেঙ্গল রেজিমেন্টের কিছু অতিরিক্ত সৈন্যের জটলা। সরকার বদল হয়েছে। সকাল থেকে রেডিও বন্ধ। প্রকৃত ব্যাপার কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। সর্বত্র কানাঘুষা। অবাক জিজ্ঞাসা! বিভ্রান্তি!

অগাস্ট পরবর্তী অবস্থা

১৫ অগাস্টের পর ঘটনাপ্রবাহ চলছিল সম্পূর্ণ অস্বাভাবিকভাবে। একটি বে-সামরিক সরকারের পরিবর্তন ঘটেছিলো সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। এ সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিলো সেনাবাহিনীর হাতেগোনা ক'জন জুনিয়ার অফিসারের মাধ্যমে। এখানেই ছিলো ঘটনার যতো গণ্ডগোল।

অগাস্ট অভ্যুত্থান প্রকৃতপক্ষে সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থান ছিলো না। সেনাবাহিনীর কোনো সিনিয়ার অফিসার সরাসরি এতে জড়িত ছিলেন না। আর্মির মাত্র দুটি ইউনিট, দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারি এবং ১ম বেঙ্গল ল্যান্সার (ট্যাংক রেজিমেন্ট) ছাড়া অন্যকোনো ইউনিট এতে জড়িত ছিলো না। বিশেষ করে পদাতিক বাহিনীর বেঙ্গল রেজিমেন্ট অর্থাৎ যারা সেনাবাহিনীর মূল বাহিনী, তাদের কোনো ইউনিট জড়িত না থাকায় তথাকথিত ঐ অভ্যুত্থানের যৌক্তিকতা নিয়ে ঘটনা ঘটার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিতর্ক ও

অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে ৪৬তম ব্রিগেডের কমান্ডার শাফায়েত জামিল অস্বস্তিবোধ করছিলেন। কারণ ঢাকার পদাতিক ব্রিগেডকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে যান্ত্রিক দুটি ইউনিট সরকার উল্টিয়ে দিলো, আর তারা বসে বসে শুধু ঘাস কর্তন করলেন। এটা ছিল চরম অপমানের নামান্তর।

খন্দকার মোশতাক আহমদ যথেষ্ট দক্ষতার সাথে অবস্থার মোকাবেলা করার চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু বঙ্গভবনে তাঁকে ঘিরে তখন জেঁকে বসে আছে অভ্যুত্থানের নায়ক তরুণ মেজররা। প্রকৃতপক্ষে মেজর ফারুক, রশিদ সর্বময় কর্তা হয়ে ওঠে। মেজর ডালিম, নূর, শাহরিয়ার, পাশা, রাশেদ প্রমুখ জুনিয়ার অফিসার বঙ্গভবনে অবস্থান নিয়ে দেশ শাসন করতে থাকে। সিনিয়ার অফিসারদের এড়িয়ে জুনিয়ার অফিসারদের কর্মকাণ্ড স্বভাবতই সিনিয়ারদের পছন্দ হয়নি। এসব ব্যাপার আর্মির সাধারণ ডিসিপ্লিনের প্রতি ছিল মারাত্মক হুমকি। ঊর্ধ্বতন হেডকোয়ার্টারের অনুমতি ব্যতিরেকেই ফারুক-রশিদ আক্রমণাত্মকভাবে বেঙ্গল ল্যান্সারের ট্যাংকগুলো বঙ্গভবন ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের আশেপাশে স্থাপন করে। আর্টিলারি ইউনিটের কামানগুলোও সেখানে ছিলো।

অগাস্ট অভ্যুত্থানের পর সারাদেশে দ্রুত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসলেও ক্যান্টনমেন্টে সামরিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসেনি। বিভিন্ন অজুহাতে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠতে লাগল। উপরে উপরে সব ঠিকঠাক, ধোপদুরস্ত, চলছে সরকার। কিন্তু ভেতরে ভেতরে ছাই চাপা আগুন জ্বলতে লাগল।

মেজর রশিদ ছিলেন প্রধান সমন্বয়কারী অফিসার। তিনিই প্রেসিডেন্ট এবং সেনাবাহিনী প্রধানের মধ্যে যোগাযোগ রাখছিলেন। এসব ব্যাপার মোটেই সহ্য হচ্ছিল না অনেক সিনিয়ার অফিসারের। এদের মধ্যে ছিলেন ৪৬ ইনফেন্ট্রি ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল শাফায়েত জামিল এবং ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ। তারা জিয়াকে প্রকাশ্যে চাপ প্রয়োগ করতে লাগলেন, অভ্যুত্থানের মেজরদের ব্যারাকে ফিরিয়ে আনার জন্য।

ভগ্ন হৃদয় খালেদ

খুব সম্ভব পঁচাত্তরের মে মাসে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিব সেনাবাহিনী প্রধান শফিউল্লাহকে তাঁর মেয়াদ আরো তিন বছর বাড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এটা তখনো প্রকাশ না পেলেও জিয়া-খালেদ উভয়েই তা জেনে যান। জিয়াকে সরিয়ে দেবার প্ল্যানতো ছিলোই, সেটা জিয়া আগেই জানতেন। এবার মাঝখান থেকে খালেদ মোশাররফের মনটা খারাপ হয়ে গেল, কারণ শফিউল্লাহর স্থলাভিষিক্ত তারই হওয়ার কথা ছিল। তার আশা ভঙ্গ হলো, এখন তাকে আরো তিন তিনটি বছর অপেক্ষা করতে হবে! বাংলাদেশের ব্যাপার, তিন বছর পর কি হয়, কে জানে!

নাখোশ শাফায়েত জামিল। তাকে কদলী দেখিয়ে তারই অধীনস্থ অফিসার মেজর রশিদ ও জুনিয়ার মেজররা বঙ্গভবনে ক্ষমতার মসনদে সমাসীন! অথচ চার হাজার সৈন্য নিয়ে সে নাকি ঢাকার সক্রিয় স্বাধীন ব্রিগেড কমাণ্ডার!

মনের গভীরে প্রবল চাপা ক্ষোভ তাদের সবাইকে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল। খালেদ-শাফায়েত দু'জনই একটা কিছুকে 'ইস্যু' করে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ফিরে আসার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লো।

নাখোশ জিয়া

কিন্তু জিয়ার অবস্থাও ছিলো নড়বড়ে। চতুর খন্দকার মোশতাক জেনারেল ওসমানীকে তার সামরিক উপদেষ্টা নিয়োগ করলেন। একই সাথে মেজর জেনারেল খলিলুর রহমানকে 'চীফ অব ডিফেন্স স্টাফ' করে জিয়ার উপরে স্থান করে দিলেন। মোশতাক সামরিক ব্যাপারে জেনারেল ওসমানীকেই প্রাধান্য দিতেন। জিয়াকে তেমন পাত্তা দিতেন না। সরাসরি কথাও বলতেন না। এতে জিয়া ভেতরে ভেতরে প্রেসিডেন্ট মোশতাকের ওপর খুবই নাখোশ ছিলেন। এছাড়া জেনারেল ওসমানী ও খলিলুর রহমানের সাথেও জিয়ার এমনিতেই বনিবনা ছিলো না। অথচ মোশতাক এদের কিনা তাঁর উপরে স্থান দিয়ে তাঁর ক্ষমতা খর্ব করার প্রয়াস পাচ্ছিলেন।

এ সময় আমি ছিলাম স্টেশন কমান্ডার। এই সুবাদে প্রায়ই জিয়ার সাথে এসব নিয়ে কথাবার্তা হতো। তাঁর অফিসে গেলেই জিয়া রাগে গরগর করতেন। ওসমানী ও খলিলুর রহমানকে কড়া ভাষায় সমালোচনা করতেন। আমাকে কয়েকবার ওসমানীর কাছে গিয়ে সরাসরি বুড়োকে সরে দাঁড়াবার কথা বলতে বললেন। আমি শুধু হেসে তার রাগ থামাবার চেষ্টা করতাম। জিয়ার অবস্থা তখন খাঁচাবন্দি ব্যাঘ্রের মতো।

খালেদ মোশাররফের রাজনৈতিক শক্তি ছিল তাঁর ভাই রাশেদ মোশাররফের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ। নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিনের সাথেও তাঁর আলাপ ছিল। শাফায়েত জামিলের সাথে তাঁর ভালো সম্পর্ক ছিল। কিন্তু শাফায়েত আবার জিয়াউর রহমানের সাথেও সমান সম্পর্ক রাখতো। অর্থাৎ সে এদিকেও ছিল, ওদিকেও ছিল।

প্রথমদিকে শাফায়েতের সাথে রশিদের সম্পর্কও ছিল খুবই ভালো, রশিদ ছিল শাফায়েতেরই অধীনস্থ ইউনিটের কমান্ডার। কিন্তু 'ক্যু' করার পর সে তার 'বস'-কে টেক্কা দিয়ে নিজেই বঙ্গভবনের মসনদে বসে পড়লো। তার সাথে 'ক্যু'র অন্যান্য মেজররা—ফারুক, ডালিম, হুদা, পাশা, রাশেদ প্রমুখ। এ রকম অবস্থা ছিল শাফায়েতের কাছে রীতিমতো অপমানজনক। চার হাজার সৈন্যের স্বাধীন পদাতিক ব্রিগেড নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে সে বসে থাকবে ক্ষমতাহীন হয়ে, আর বঙ্গভবনে চুনোপুটি মেজররা করবে দেশ শাসন—এটা অসম্ভব। ১৫ অগাস্ট ঘটনাবহুল দিনটিতে নিষ্ক্রিয় থেকে তার কোনো লাভ হয়নি। এবার আর নয়। হত্যাকারী মেজরদের উৎখাত চাই। মেজরদের উৎখাত আর চেইন অব কমান্ড প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে এবার এক প্লাটফরমে এসে দাঁড়ালেন শাফায়েত জামিল ও খালেদ মোশাররফ। তারা প্রকাশ্যে হুমকি দেয়া শুরু করলেন। তারা জিয়াকে শক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানালেন। কিন্তু জিয়া নিরুত্তর। তিনি একূল ওকূল দুকূল রক্ষা করেই চলছিলেন। তিনি বললেন, Wait and see.

আসলে জিয়া সার্বিক ব্যাপারটা দেখছিলেন অন্যভাবে।

তিনি দেখছিলেন, মেজরদের ক্যান্টনমেন্টে ফিরিয়ে আনলেই তার সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। 'মোশতাক-ওসমানী-খলিল চক্র' ধূলিস্মাৎ করতে না পারলে তিনি স্ব-ইচ্ছায় স্বাধীনভাবে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারছেন না। এটাই ছিল ঐ মুহূর্তে জিয়ার সবচেয়ে বড় মাথা ব্যথার কারণ। অতএব তিনি তাঁর আপন পরিকল্পনায়ই কাজ করছিলেন; গোপনে, অতি সন্তর্পণে। অন্যদিকে তাহের, খালেদ, শাফায়েতরাও বসে ছিলো না। সবাই তখন ক্ষমতার মোহে ছিল আচ্ছন্ন। তাঁরাও নিজ নিজ ছক অনুযায়ী কাজ করছিল।

অক্টোবর মাসে স্পষ্ট বোঝা গেল। একটা 'শক্তির মহড়া' প্রদর্শন আসন্ন। প্রকাশ্যে গোপনে বিভিন্ন ক্যাম্পে সাজ সাজ রব। কখন কীভাবে আসছে, সেটা ছিল শুধু সুযোগ ও সময়ের ব্যাপার মাত্র।

এই সময় জিয়ার সাথে প্রায়ই আমার কথাবার্তা হতো। টেনিস কোর্টেও দেখা হতো। আমি তাঁকে সেনানিবাসের আকাশে ঝড়ের সংকেত উপলব্ধি করতে বারবার অনুরোধ করি। কিন্তু বার বার তাঁর একই জবাব; হামিদ, Wait and see. এক মাঘে শীত যায় না। আমি তাঁর এসব কথার কিছুই মাথামুণ্ডু বুঝতে পারিনি। তাঁকে তাঁর অফিসে গিয়ে আবার বলি। সে ঘাড় কাত করে অবহেলা ভরে কেবল মুচকি হাসে আর একই উত্তর দেয়; হামিদ বললাম তো, এক মাঘে শীত যায় না। আমি বিব্রত হই।

আমার কথার কোনো গুরুত্ব না দেয়ায় আমি রাগ করে বেশ কিছুদিন তাঁর অফিসে যাওয়াই বন্ধ করে দিলাম। এ সময় জিয়ার জন্য অনেকেই উদ্বিগ্ন ছিলেন। বহু অফিসার আমার কাছে এই সময় এসে বলেছেন; স্যার, আপনি তো তাঁর বন্ধু মানুষ, কোর্সমেট। তাঁকে কেন বুঝিয়ে বলছেন না, বিপদ আসন্ন। এক্ষুণি তাঁকে সতর্ক হতে হবে। আমি তাদের বলেছি; ব্রাদার্স, ভেরি স্যরি, জিয়া আমার কথায় কোনো আমলই দিচ্ছে না। এতে তারা বড়ই নিরাশ হতেন।

কর্নেল রশিদও আমাকে বলেছে, সেও জিয়াকে খালেদ-শাফায়েতের সম্ভাব্য অভ্যুত্থান সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়। কিন্তু তিনি কোনো এ্যাকশন নিতে চাননি। এতে তার মনে তখনই জিয়ার সততা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। তার ধারণা হয়, জিয়া নিজেই তলে তলে কিছু একা ঘটাতে যাচ্ছেন। গভীর জলের মৎস্য জিয়া। তাঁর আসল মতলব রশিদ অথবা অন্য কেউ কিছুই বুঝতে পারছিলো না। আসলে ভেতরে ভেতরে চলছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের প্রস্তুতি।

আসলেই কী জিয়া ভেতরে ভেতরে কী হচ্ছে তা মোটেই জানতেন না? পরবর্তী ঘটনাবলি থেকেই এর জবাব পাওয়া যাবে।

জিয়া এবং তাহের একে অন্যের প্রতি খুবই বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। উভয়ে একই সাথে একই সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন। তাহেরকে পঙ্গুত্বের জন্য অবসর দেয়ার পর জিয়া বরাবর তাঁর সাথে সংযোগ রক্ষা করে চলেছেন। তাহের গোপনে জাসদের আর্মস উইং গণ-বাহিনীর সাথে যুক্ত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তারা জিয়াকে সামনে রেখে চাইনিজ পদ্ধতির সেনা-বিপ্লবের একটা স্বপ্ন দেখছিলেন।

চীফ অব জেনারেল স্টাফ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ও ৪৬ ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়েত জামিল ছিলেন প্রধান প্রতিবাদী কণ্ঠ। তাঁরা সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমানকে ঐসব উচ্চাকাঙ্ক্ষী মেজরদের বিরুদ্ধে এ্যাকশন নিতে বললেন। জিয়া কিন্তু মেজরদের কাছে ছিলেন কৃতজ্ঞ, কারণ তারাই তো তাঁকে চীফ-অব-স্টাফ বানিয়েছে। অতএব, জিয়া কৌশলে একূল ওকূল, দুকূল রক্ষা করেই চলতে থাকেন। যাকে বলে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' এরকম একটা অবস্থার মধ্য দিয়ে চলছিলেন তিনি। জিয়া দুই প্রান্তের লোকজনদের সাথেই যোগাযোগ রক্ষা করছিলেন। একদিকে ফারুক-রশিদের পিঠ চাপড়ানো, অন্যদিকে শাফায়েত জামিলের কাঁধে হাত, দুই-ই করছিলেন। আসলে জিয়া বহুদিন গোয়েন্দা সংস্থায় চাকরি করায় এসব কাজে ছিলেন ভালো ওস্তাদ।

জিয়া তলে তলে আর একটি কাজ করছিলেন। তাহলো, তিনি সবার অজ্ঞাতে জাসদের কর্নেল (অব:) আবু তাহেরের সাথে গোপন কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। জাসদের আর্মস উইং ইতিমধ্যে আন্ডার গ্রাউন্ড রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। শেখ সাহেবকে উৎখাতের জন্য ইতিপূর্বে তারাও প্রস্তুতি নিচ্ছিল। জিয়া সবার অজ্ঞাতে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাঁর সুহৃদ কর্নেল তাহেরের সাথে গোপন কথাবার্তা চালিয়ে যান। জাসদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মতে একটি সেনা বিপ্লবের লক্ষ্যে জিয়াউর রহমানের সাথে তাদের রীতিমতো পাকাপাকি কথাবার্তা হয়। তাঁর সাথে বেশ কটি গোপন মিটিং হয়। যদিও বিপ্লবের ব্যাপারে জিয়ার সদিচ্ছা নিয়ে তাদের ঊর্ধ্বতন মহলে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, কিন্তু কর্নেল তাহেরের পীড়াপীড়িতে তারা জিয়ার সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত হয়ে পড়েন।

জিয়া বনাম মোশতাক-ওসমানী

সত্যি বলতে কী খোদ জিয়াউর রহমানের আর্মির ঊর্ধ্বতন 'চেইন অব কমান্ড' মোটেই সহ্য হচ্ছিল না। তিনি নিজেই তা ভাঙতে চাচ্ছিলেন। তাঁর মাথার ওপরে জেনারেল ওসমানী ও খলিলুর রহমানের মাতব্বরি মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না। তিনি চাচ্ছিলেন সেনাবাহিনীর ব্যাপারে তিনিই যেন সর্বেসর্বা থাকেন। বর্তমান অবস্থায় তাঁর প্রেসিডেন্টের কাছে যেতে হলে দুটি ধাপ পেরিয়ে যেতে হয়। খন্দকার মোশতাক আহমদও রগচটা লোক ছিলেন। জিয়াউর রহমান তাকে পছন্দ করতেন না। মোশতাকেরও জিয়াকে পছন্দ হতো না। কিন্তু অবস্থার প্রেক্ষিতে সবাইকে এক খোঁয়াড়ে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, মানিয়ে চলতে হচ্ছিল। বলা যেতে পারে ঐ সময় প্রেসিডেন্ট মোশতাক ও সেনাপ্রধান জিয়ার মধ্যে একমাত্র যোগাযোগ সূত্র ছিল মেজর রশিদ। মেজর রশিদ ছিলেন প্রধান সমন্বয়কারী অফিসার (Chief Co-ordinator)। দু-একদিন পর পরই তিনি একগাদা ফাইল বগল দাবা করে বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্ট মোশতাকের কাছে যেতেন এবং সেখান থেকে আর্মি হেডকোয়ার্টারে সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানের কাছে আসতেন। আবার জিয়ার কাছ থেকে তাঁর পয়েন্ট নিয়ে মোশতাকের কাছে যেতেন। সরাসরি জিয়া-মোশতাকের মধ্যে বিশেষ কথাবার্তা বা দেখা-সাক্ষাৎও হতো না। ওসমানীর সাথেও না। এভাবেই চলছিল দৈনন্দিন কাজকর্ম।

ঐ সময় একটি মজার ব্যাপার ঘটল। সেপ্টেম্বর মাসে একদিন হঠাৎ প্রেসিডেন্টের ডিফেন্স উপদেষ্টা জেনারেল ওসমানী আকস্মিকভাবে ঢাকা স্টেশনের অফিসার ও জেসিওদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে আসেন ক্যান্টনমেন্ট মিলনায়তনে। জিয়ার এ ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ হলো না। সে আমাকে ডেকে বলল, হামিদ, আমি ও-ব্যাটা ওসমানীর সাথে বসতে চাই না। তুমি মাঝখানে ওর পাশে বসবে। তাই হলো। ওসমানী আসলেন এবং ভাষণ দিয়ে চলে গেলেন, কিন্তু সেনাপ্রধান জিয়ার সাথে তার সাধারণ হাত মেলানো ছাড়া আর কোনো কথাই হলো না। তিনি হল রুমে এসে বসলেনও না।

বঙ্গভবনের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সুদৃশ্য কামরাগুলোতে অগাস্ট ক্যু'র মেজররা শক্তভাবে জেঁকে বসে দেশ শাসন করতে লাগলো। তারা নিজস্ব স্টাইলে বঙ্গভবনে একটি অঘোষিত সেক্রেটারিয়েট তৈরি করে বিভিন্ন দিকে নির্দেশ দিতে লাগলো। স্বভাবতই ক্যান্টনমেন্টের অফিসারদের এসব পছন্দ হচ্ছিলো না। কিন্তু মোশতাকও এসব অফিসারদের কিছু করতে পারছিলেন না, কারণ তারাইতো একটি রক্তাক্ত বিপ্লবের মাধ্যমে এই নতুন সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এভাবে সরকার পরিচালনার ব্যাপারে বঙ্গভবন ও ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে মতানৈক্য ও তিক্ততার সৃষ্টি হলো। জিয়াউর রহমান চুপচাপ, নীরব দর্শক। তাঁর ভাবখানা ছিল বাঘে-সিংহে লাগুক একটা টক্কর, তাহলে দু'গ্রুপেরই শক্তি ক্ষয় হবে। ফলে তাঁরই সুবিধা হবে।

শেখ মুজিবুর রহমানের মতো খন্দকার মোশতাককেও সামরিক বাহিনীর কমান্ডারদের নিয়ে একই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অর্থাৎ তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব সামাল দিতেই দেশের প্রেসিডেন্টদের গলদঘর্ম অবস্থা। চতুর মোশতাক অবশ্য এ কাজটি কিছুটা সামাল দিতে পেরেছিলেন, তার ডিফেন্স উপদেষ্টা হিসেবে বর্ষীয়ান জেনারেল ওসমানীকে তাঁর পাশে এনে এবং 'চীফ অব-ডিফেন্স স্টাফ' পোস্ট সৃষ্টি করে। কিন্তু তাতেও কী রক্ষা?

জুনিয়ার মেজরদের সফল অভ্যুত্থান ক্যান্টনমেন্টের কিছু সিনিয়ার এমন কি জুনিয়ার অফিসারদের মধ্যে ক্ষমতায় আরোহণের নতুন প্রেরণা জোগালো। সবাই একে অন্যকে ডিঙ্গিয়ে টেক্কা দিয়ে কেউ চীফ, কেউ প্রেসিডেন্ট হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠলো। দেশের সর্বোচ্চ পদটি এখন বন্দুকের নলের ধরাছোঁয়ার নাগালে বলে মনে হতে লাগলো।

খালি ময়দান। খালি ময়দানে এই মুহূর্তে জিয়া, খালেদ মোশাররফ, শাফায়েত জামিল ও তাহের। তাঁরা নিজেদের পরিকল্পনায় গোপনে নিজ নিজ শক্তি সঞ্চয় করতে তৎপর হয়ে উঠলো। শুরু হলো ক্ষমতার লড়াই। পানি ঘোলা হয়ে উঠলো। মৎস্য শিকারের এটাইতো উপযুক্ত সময়। শিকারীরাও প্রস্তুত।

রাজনৈতিক অবস্থা ততদিনে যথেষ্ট স্থিতিশীল হয়ে এসেছে। আসন্ন ফেব্রুয়ারিতে দেশে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণাও দেয়া হয়েছে। কিন্তু তবুও কোথায় যেন অস্বস্তি ঠেকছে সবার। রাজধানী 'উত্তর পাড়া' নিয়েই উদ্বিগ্ন সবাই। ওদিকে একটা ঝড় উঠছে, সবার তাই আশঙ্কা। এ রকম একটি অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসে ঘটনাবহুল মাস নভেম্বর।

অক্টোবর মাসে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়। কিন্তু ক্যান্টনমেন্টে সামরিক অফিসারদের মধ্যে কোন্দল প্রবল হলো। জিয়া এবং খালেদ গ্রুপের মধ্যে একটি মুখোমুখি সংঘাত প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলো। বঙ্গভবনে বসে ফারুক-রশিদেরাও স্পষ্ট বুঝতে পারল, এ দু'গ্রুপের সংঘর্ষে তাদের অবস্থানেরও বিপর্যয় ঘটতে বাধ্য। সেনাপ্রধান জিয়াকে বারবার বলা সত্ত্বেও তিনি প্রতিপক্ষ গ্রুপের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না। এতে বঙ্গভবনে মোশতাক, ওসমানী, খলিল, রশিদ, ফারুক সবাই জিয়ার সততা নিয়ে সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়েন। তাদের আশঙ্কা হয়, জিয়া কী নিজেই একটি অভ্যুত্থান ঘটাতে যাচ্ছে?

২/৩ নভেম্বর রাত

২রা নভেম্বর। রাত আনুমানিক এগারোটা। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এমন সময় বাসায় এসে বাইরে থেকে কে যেন ক্রমাগত কলিং বেল বাজাতে লাগল। মনে হলো অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটেছে। আমি বিছানা থেকে উঠে গিয়ে ব্যাটম্যান হুমুজ আলীকে পাঠালাম দেখে আসতে এত রাত্রে কে আসলো, কী চায়? হন্তদন্ত হয়ে আর্মি ফিল্ড ইনটেলিজেন্স ইউনিটের কমান্ডার মেজর মুদাস্‌সার বাসায় প্রবেশ করলো। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, স্যার সর্বনাশ হয়ে গেছে। বেঙ্গল রেজিমেন্ট ক্যু করছে। তারা ট্রুপ মুভ করছে। আপনি এক্ষুণি জেনারেল জিয়াকে খবর দিন। আমি তাকে বললাম কিছুদিন ধরে জিয়া আমার কথা মোটেই শুনছে না। তুমি বরং সরাসরি নিজেই যাও এবং সংবাদটা জানাও। সে বলল, স্যার তিনি আর্মি চীফ। আমি কীভাবে এই মুহূর্তে সরাসরি যাই। আপনি ফোনে বলে দিন। আমি তাকে বললাম, দেখ এখন গভীর রাত। সে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিছু বিস্তারিত না জেনে উঠানো ঠিক হবে না। তুমি বরং সোজা তাঁর বাসায় যাও। সে যদি রাগ করে; বলে দিও, আমার নির্দেশে তুমি সেখানে গেছো। আমিই তোমাকে পাঠিয়েছি। যাও, সময় নষ্ট করো না। সে ছিল খুবই উত্তেজিত। সজোরে তার গাড়ি হাঁকিয়ে তৎক্ষণাৎ সেনাভবনের দিকে রওয়ানা দিলো।

অজানা আশঙ্কায় কিছুক্ষণ জেগে জেগে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। সে রাত্রে কোনো গোলাগুলির আওয়াজ শোনা গেল না। গত ক'দিন ধরে এভাবে আমরা প্রতিরাতেই কিছু একটা ঘটনার আশঙ্কা করছিলাম। কিন্তু ঘটছিলো না। একটি অভ্যুত্থানের গুজব বেশ ক'দিন ধরেই শুনে আসছিলাম। জিয়াউর রহমানকেও বলেছিলাম, কিন্তু সে মোটেই এসব কথা আমল দেয়নি। উল্টো আমাকেই উপহাস করেছে।

মধ্যরাতের অভ্যুত্থানে জিয়া বন্দি

গভীর রাত পর্যন্ত বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্ট খোন্দকার মোশতাক, জেনারেল ওসমানী, জেনারেল খলিল, মেজর রশিদ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপরত ছিলেন। তারা জিয়া এবং খালেদ মোশাররফ এ দুজনের রেষারেষি এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে খুবই বিব্রতবোধ করছিলেন। মোশতাক, ওসমানী, খলিল তাঁরা সবাই চাচ্ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী জিয়াকে সেনাপ্রধান পদ থেকে সরিয়ে দিতে। কিন্তু রশিদ একমত হচ্ছিল না। জিয়াকে সরিয়ে

খালেদ মোশাররফকে চীফ বানানোর সে পক্ষপাতী ছিলো না। যদিও ফারুক চাচ্ছিল খালেদকে 'চীফ' বানানো হোক। কিন্তু বঙ্গভবনে তখন ফারুকের চেয়ে রশিদের মতামতের ওজন ছিল বেশি। এছাড়া এ দু'জনকে সরিয়ে নতুন কাকে চীফ অব স্টাফ বানানো যায়, এ নিয়ে তারা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিলেন। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে নিতেই 'উত্তর পাড়া' থেকে আর একটি অভ্যুত্থানের দমকা হাওয়া বঙ্গভবনের দ্বারপ্রান্তে এসে আঘাত হানলো।

রশিদ তার সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেছে, জিয়া এই সময় সরাসরি দেশের প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। আমি তাঁকে কত বুঝালাম, স্যার, 'আপনি এখনও অনেক ইয়াং। এখন আপনাকে প্রেসিডেন্ট মানাবে না। একটু অপেক্ষা করুন। এখন 'চীফ' আছেন ভালোই আছেন। কিন্তু জিয়া অস্থির। অগত্যা আমি তাকে বলি, তাহলে স্যার এটা আমি পারবো না। আপনাকেই আপনার পথ করে নিতে হবে। আমি যতদূর পারি আপনাকে সাহায্য করবো।'

গভীর রাতে এক সময় তারা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেন; জিয়া, খালেদ উভয়কেই সরিয়ে দেয়া উচিত। বঙ্গভবনে তারা এসব নিয়ে যখন আলাপ-আলোচনা করছিলেন, তখন একজন পুলিশ এসে জানায়; স্যার, বঙ্গভবন থেকে আর্মির লোকজন সব পালিয়ে গেছে।

মেজর ইকবালের অধীনে ১ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক কোম্পানি সৈন্য ছিল বঙ্গভবনে। রাত আনুমানিক বারোটার দিকে তারা অকস্মাৎ বঙ্গভবন ত্যাগ করে। প্রহরীবিহীন বঙ্গভবন। ঝড়ের নিশ্চিত পূর্বাভাস! মিটিং ভেঙ্গে গেল। তাঁরা বুঝতে পারলেন, তাঁরা যা আশঙ্কা করছিলেন, তাই ঘটতে যাচ্ছে।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট। রাত সাড়ে বারোটা। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টে এসে কমান্ডিং অফিসারের কক্ষে প্রবেশ করলেন। কর্নেল আমিনুল হককে কৌশলে দূরে সরিয়ে তিনিই ইউনিটের সার্বিক পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন। তার সাথে ৪৬ ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়েত জামিল ও অন্যান্য অফিসার। কর্নেল মালেক, ব্রিগেডিয়ার রউফ, ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান, মেজর হাফিজউদ্দিন, মেজর ইকবাল, মেজর নাসের, মেজর আমিন, স্কোয়াড্রন লীডার লিয়াকত প্রমুখ ছিলেন। অনেকে সকালের দিকেই আসে। ইউনিটের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল আমিনুল হক এবং এ্যাডজুটেন্ট ক্যাপ্টেন মুনিরকে ক্ষমতাহীন করে বসিয়ে রাখা হয়।

প্রথমেই ক্যাপ্টেন হাফিজুল্লার নেতৃত্বে ১ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি প্ল্যাটুন জিয়ার বাসায় ঝটিকা বেগে পাঠিয়ে তাকে গৃহবন্দি করা হয়। রাত তখন ১টা। একই সঙ্গে জিয়ার বাসার টেলিফোন লাইন কেটে দেয়া হয়। ক্যাপ্টেন হাফিজুল্লা জিয়ার সাথে বৈঠকখানায় বসে তাকে বললো, 'স্যার আপনি বন্দি'। অতঃপর ১ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকরা জিয়ার বাসা ঘেরাও করে বাইরে থেকে সকল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলো। গৃহবন্দি হলেন জিয়া। বিনা বাধায় অপারেশনের প্রথম পর্ব সমাপ্ত হলো। মধ্যরাতে কোথাও 'টুঁ' শব্দ পর্যন্ত হলো না।

. যতদূর জানা গেছে, সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমানকে বন্দি করার কাজ, অর্থাৎ প্রথম পর্বের অপারেশন, ৪৬ ব্রিগেডের কিছু তরুণ অফিসার নিজেদের উদ্যোগেই সম্পন্ন করে। ব্রিগেড মেজর হাফিজউদ্দিন এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আসলে ফারুক-রশিদের সফল অভ্যুত্থান তরুণ মেজরদের এ্যাডভেঞ্চারাস্ অভিযানে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে। জিয়াকে তাঁর বাসভবনে বন্দি করার পরই খালেদ মোশাররফকে অভ্যুত্থানের খবর দেয়া হয়। তিনি তখন ঘুমাচ্ছিলেন। ঘুম থেকে উঠে তিনি সরাসরি ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট হেডকোয়ার্টারে ছুটে আসেন। ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়েত জামিলও একই সময়ে আসেন।

তিনি আসার পর অবস্থা পরখ করে অপারেশনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। শুরু হয় অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় পর্ব। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের প্রথম পদক্ষেপ : ৪র্থ বেঙ্গলের দুটি কোম্পানি এয়ারপোর্ট রোডের কাওরান বাজার এরিয়াতে অবস্থান নিয়ে বঙ্গভবন থেকে আসার সকল যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। ৪র্থ বেঙ্গলের আরো কিছু সৈন্য এন্টি-ট্যাংক রকেট নিয়ে আশেপাশে অবস্থান নেয়। ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেডিও স্টেশন দখল করে। ১ম বেঙ্গলের দুটি কোম্পানি বঙ্গভবনের আশেপাশে ঘেরাও করে অবস্থান গ্রহণ করে। রেডিও ট্রান্সমিশন বন্ধ করে দেয়া হয়। রাতের অন্ধকারে যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে ৪৬ ব্রিগেডের ইউনিটগুলো ক্যান্টনমেন্ট ও শহরের বিভিন্ন স্থানে কৌশলগত অবস্থান নেয়; কিন্তু কোথাও কোনো হামলা হয়নি।

এভাবেই শুরু হয়ে গেল ৩রা নভেম্বরের রক্তপাতহীন নীরব অভ্যুত্থান। ক্যান্টনমেন্টে সবাই তখন ঘুমিয়ে। ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট মধ্যরাত ১২টা থেকেই অপারেশন পরিচালনা করছেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ। তার সাথে রয়েছে ৪৬ তম ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল শাফায়েত জামিল। ঘটনা গড়াতে শুরু করলো। মধ্যরাতে ক্যান্টনমেন্টে অভ্যুত্থানের খবর পেয়েই মেজর রশিদ বঙ্গভবনে ঘুম থেকে তুলে ফারুককে এ সংবাদ দেয়। ফারুক সঙ্গে সঙ্গে তার ট্যাংকগুলো সচল করে ফেলল।

বঙ্গভবনের চারিদিকে সাজ সাজ রব! ৮টি ট্যাংক বঙ্গভবনে। ৮টি ছিল সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। বাকিগুলো ক্যান্টনমেন্টে। সবকটি ফাইটিং-এর জন্য তৈরি হয়ে গেল। ফারুক বঙ্গভবন থেকে ছুটে গিয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ট্যাংকগুলোর কমান্ড গ্রহণ করলো। সবকটি ট্যাংকেই তখন গোলা-বারুদ মজুদ রয়েছে। রশিদ বঙ্গভবনেই রয়ে গেলো। ফারুক ফাইটার। রশিদ ফাইটার কিন্তু প্রধান রাজনৈতিক সমন্বয়কারীও বটে, যোদ্ধাবেশে অস্ত্র কাঁধে মোশতাকের পাশে বসে সার্বিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করছে। বেঙ্গল ল্যান্সারের ট্যাংকগুলো যখন বঙ্গভবন ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যুদ্ধংদেহী পজিশন নিয়েছে, তখন ২য় ফিল্ড রেজিমেন্টের অধিকাংশ কামান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে, বাকি কামানগুলো ক্যান্টনমেন্টে ইউনিট লাইনে রয়েছে। তারা ওখানে প্রস্তুতি পজিশনে তৈরি হয়ে রইলো। সবাই নিজ নিজ স্থানে প্রস্তুতি গ্রহণ করে আক্রমণাত্মক পজিশনে তৈরি হয়ে রইলো। 'লড়বো নয় মরবো'।

৩রা নভেম্বর-পাল্টা অভ্যুত্থান

সকাল থেকেই সারা দেশে আবার বিভ্রান্তি। রেডিও বাংলাদেশ ধরতে গিয়েই বিপত্তি। কোনো শব্দ নেই। রেডিও বন্ধ। সবাই ধরে নিলো আবার ক্ষমতার হাতবদল হয়ে গেছে। যদিও মোশতাক তখনও প্রেসিডেন্ট। শাফায়েত জামিল সাভারে অবস্থিত রেডিও ট্রান্সমিটারের একটি অংশ খুলে নেয়ায় রেডিও ব্রডকাস্টিং সম্পূর্ণ বন্ধ। দেশের মানুষ আর একটি রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানের আশঙ্কায় ভীত হয়ে পড়লো।

ভোরবেলা বঙ্গভবনের ওপর দিয়ে দুটি মিগ ফাইটার প্লেন প্রচণ্ড শব্দে উড়ে গেল। তারা বঙ্গভবনের ওপর চক্কর খেতে লাগল। মোশতাক প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পড়লেন। একটি হেলিকপ্টারও ক্যান্টনমেন্টের ওপর সশব্দে ঘুরপাক খাচ্ছিলো। ফারুক একটি প্লেন গুলি করে নামাবার অনুমতি চাইলো। ওসমানী এরকম অনুমতি দিতে অস্বীকার করলেন।

বঙ্গভবন আর ক্যান্টনমেন্ট তখন দুটি পৃথক দেশ। দুই দিকের সেনাবাহিনী একে অন্যের মুখোমুখি। তারা চরম প্রস্তুতি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হয়ে রইলো। যেকোনো মুহূর্তে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের প্রবল আশঙ্কা দেখা দিলো। বঙ্গভবনে অবস্থিত ফারুক-রশিদের ট্যাংক ও আর্টিলারি বাহিনী, ক্যান্টনমেন্টে রয়েছে খালেদ-শাফায়াতের পদাতিক বাহিনী।

খন্দকার মোশতাক আহমদ দারুণ ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বর্ষীয়ান নেতা জেনারেল ওসমানীকে ফোন করে তাড়াতাড়ি তাঁকে বঙ্গভবনে আসতে অনুরোধ করলেন। আসার পূর্বে ওসমানী টেলিফোনে ব্রিগেডিয়ার খালেদের সাথে কথা বললেন। খালেদ সম্ভ্রমভরেই তাঁর সাথে কথা বললো; স্যার, সবকিছুই ঠিকঠাক যাচ্ছে। ওরা কিছু না করলে, আমরা কিছুই করবো না। ওদের আপনি শান্ত রাখেন। আপনি চিন্তা করবেন না।

৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের লাইনে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের অপারেশন হেডকোয়ার্টার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ওখানে তরুণ অফিসারদের ভিড়। সকালবেলা সবাই উত্তেজিত। এদিক ওদিক ছোটাছুটি। কে কী করছে বোঝা যাচ্ছে না। সর্বত্র বিভ্রান্তি। একমাত্র খালেদ মোশাররফই শান্ত, ধীর স্থির গম্ভীর।

ওদিকে সকালবেলা ক্যান্টনমেন্টের উত্তর প্রান্তে রীতিমতো যুদ্ধাবস্থা। বেঙ্গল ল্যান্সারের ১২টি ট্যাংক ওখানে আক্রমণাত্মক পজিশন নিলে সেকেন্ড ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের ট্রুপস্ এন্টি-ট্যাংক গান নিয়ে তাদের ঘেরাও করে রাখে। দুপক্ষই মুখোমুখি। মাথার ওপর উড়ছে জঙ্গি বিমান। উড়ছে হেলিকপ্টার। তারাও যেকোনো মুহূর্তে আক্রমণে উদ্যত। ল্যান্সাররা বিদ্রোহী গ্রুপের দুজন অফিসার মেজর নাসের এবং মেজর আমিনকে ধরে বন্দি করে ফেলে। তাদের ছেড়ে দিতে বলা হলো, কিন্তু ল্যান্সাররা ছাড়তে অস্বীকার করে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত দুইপক্ষ পাঁয়তারা করে মুখোমুখিই বসে রইল। কেউ কাউকে আক্রমণ করলো না। আপস-আলোচনা চলতে থাকলো।

প্রথমে শাফায়েতরা ভেবেছিল ৪৬ ব্রিগেড মুভ করলেই বঙ্গভবনের মেজররা সহজেই সারেন্ডার করবে। কিন্তু ফারুক-রশিদ ট্যাংক, কামান নিয়ে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তারা সবাই বেশ বেকায়দায় পড়ে যায়। অথচ ক'দিন আগেও শাফায়েত জামিল কথায় কথায় বলতো, আমাকে অনুমতি দিলে এসব আরমার-আর্টিলারিদের আধঘণ্টার মধ্যেই ফিনিশ করে দিতে পারি।

হুজুগের প্ল্যান। তরুণ মেজররা যা করার তাই করে ফেলেছে। এখন সিনিয়ার কমান্ডার হিসেবে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মেশাররফকে তা সামাল দিতে হচ্ছে। তার ঘাড়ে বিরাট দায়িত্বভার।

আমি নিশ্চিন্ত মনেই ঘুমিয়ে ছিলাম। রাতের অন্ধকারে ক্যান্টনমেন্টে ক্ষমতার হাত বদল হয়ে গেল, কিছুই টের পেলাম না। ভোর ৫টায় স্টেশন হেডকোয়ার্টার থেকে আমার ডিউটি অফিসার ফোন করে সংবাদ দিল, স্যার আজ রাত্রে বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করেছে। তারা জেনারেল জিয়াকে তাঁর বাসায় অ্যারেস্ট করে রেখেছে।

'তাই না কী?'

'জ্বী, স্যার।'

আমি তৎক্ষণাৎ জিয়ার বাসায় ফোন করলাম। তার বাসার লাইন ডেড। 'হ্যালো! হ্যালো! হ্যালো!' কোনো শব্দ নেই। আমার বুঝতে বাকি রইল না, আর একটি অভ্যুত্থান ঘটে গেছে। সামনে কী আছে, কে জানে?

আমি তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে আমার জিপ নিয়ে তখনই জিয়ার বাসভবনে ছুটে গেলাম। ক্যান্টনমেন্টের বড় রাস্তার মোড়েই এমপি এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেপাইরা দাঁড়িয়েছিল। তারা আমার জিপ থামিয়ে বিনয়ের সাথে বললো, স্যার, সামনে যেতে মানা আছে। দয়া করে ৪৬ ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে একটু কথা বলুন। সব বুঝতে পারবেন।

কয়েকদিন আগে শেখ সাহেবের বাসায় হতভাগ্য কর্নেল জামিলুর রহমানের দশা আমার মনে পড়ে গেল। আমি আর অগ্রসর হলাম না। জিপ ঘুরিয়ে আমার অফিসে ছুটে গেলাম।

বন্দি জিয়া : খালেদের 'টেলিফোন-ব্যাট্‌ল'

অফিসে পৌঁছে ফোন করলাম কর্নেল শাফায়েতকে। জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কী শাফায়েত? সে বলল, আমরা মেজরদের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। আপনি তো জানেনই তাদের কথা।

'সি.জি.এস. কোথায়?'

'সি.জি.এস. আমাদের সাথেই আছেন। আমরা সবাই এখন ৪ বেঙ্গল-এ আছি।'

'তোমরা কী জিয়াকে অ্যারেস্ট করেছ?'

'না, ঠিক তা নয়। তাঁকে আমরা বাসায় হেফাজতে নিয়েছি। হি ইজ অল রাইট।'

আমি তাকে বললাম, সব বুঝলাম শাফায়েত, কিন্তু এসব করা কী ঠিক হচ্ছে? সে বলল, স্যার আপনি ফোর বেঙ্গল-এ আসেন। সবাই আছে, এখানে কথা হবে। থ্যাংক ইউ।

সকাল সকাল বেশ কিছু অফিসার আমার অফিসে ছুটে আসলেন। বেশ কিছু জেসিও এবং সৈনিকরাও বাইরে ভিড় করেছে। প্রত্যেকের মুখে হতাশার ছাপ। সবাই অসন্তুষ্ট। সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ বন্দি। এ কেমন কথা? তাদের কেউ আর্মি চীফকে বন্দি করে রাখাটা মোটেই গ্রহণ করতে পারছে না। খালেদ মোশাররফ ও শাফায়েত এটা বুঝতেই পারলো না, তাদের এ ধরনের পদক্ষেপ কত বড় ভুল হলো। তাদের এই ভুল পদক্ষেপ জেনারেল জিয়ার ইমেজ তাদের অলক্ষেই একদিনেই আকাশচুম্বী করে তুললো। প্রতিটি সৈনিকের সহানুভূতি জিয়ার দিকে আকৃষ্ট হলো। এর জন্য জিয়াকে কিছুই করতে হলো না। ব্রিগেডিয়ার খালেদ তাঁর অজান্তেই এই একটি মাত্র ভুল পদক্ষেপের জন্য তাঁর মহাবিপদ ডেকে আনলেন। সৈনিকদের মধ্যে জিয়ার জনপ্রিয়তা একদিনেই নীরবে তুঙ্গে চড়ে গেল। সারা ক্যান্টনমেন্টে একটি কথাই সৈনিকদের মুখে মুখে ফিরতে লাগল, 'জিয়া বন্দি'। 'চীফ অব স্টাফ বন্দি'। অফিসারদের এসব কার্যকলাপ মোটেই কারো পছন্দ হলো না।

খালেদের অভ্যুত্থান প্ল্যান ছিল কয়েকজন তরুণ অফিসার দ্বারা প্রণীত একটি হুজুগের প্ল্যান। যা খালেদকে কার্যকর করতে হচ্ছে ঘটনা ঘটানোর পর। তাদের অপারেশন চলছিল বাবুদের মতো অফিসের টেবিলে বসে কাগজে আর টেলিফোনে, বলা যেতে পারে টেলিফোন যুদ্ধ (Telephone Battle), যেখানে ছিল না যুদ্ধের উন্মাদনা ও গতি।

৩ তারিখ সকাল বেলা। ৪র্থ বেঙ্গল হেড কোয়ার্টারে বসে ক্যু'র অন্যান্য অফিসারের উপস্থিতিতে খালেদ মোশাররফ একটি দাবি-নামা প্রস্তুত করলেন। তিনিই ডিক্টেশন দিলেন। বাকিরা মাথা নাড়ল। তিনটি দাবি ছিল :

১। ট্যাংক ও কামান বঙ্গভবন এবং শহর থেকে ক্যান্টনমেন্টে ফেরত পাঠাতে হবে।

২। জিয়া এখন থেকে আর চীফ অব স্টাফ নন।

৩। বঙ্গভবনে বসে ফারুক-রশিদের কার্যক্রমের অবসান ঘটবে। তাদের ক্যান্টনমেন্টে ফিরে 'চেইন অব কমান্ড' মানতে হবে। খন্দকার মোশতাক প্রেসিডেন্ট থাকবেন।

এই সময় ব্রিগেডিয়ার রউফ হাত উঁচু করে বললেন, আমার একটি পয়েন্ট আছে। চার নম্বর পয়েন্ট হবে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে আর্মি চীফ ঘোষণা করতে হবে। কর্নেল চিশতিরও একই কথা। খালেদ কিছু বললেন না। মৃদু হাসলেন। এক পর্যায়ে ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান বলেছিলেন, জিয়াকে ক্যান্টনমেন্টে রাখা ঠিক হবে না। তাকে দূরে কোথাও সরিয়ে নেয়া উচিত কিন্তু তার কথায় তখন কেউ কান দেয়নি।

খালেদ মোশাররফের কাঁধে জেনারেলের র‍্যাংক পরিয়ে দিচ্ছেন নৌ-বাহিনী প্রধান এম এইচ খান এবং বিমান বাহিনী প্রধান এম এ জি তোয়াব।
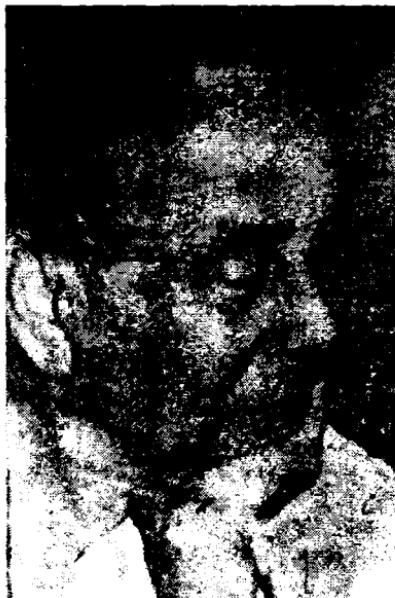
ঘরোয়া পরিবেশে জেনারেল জিয়া, পাশে কর্ণেল হামিদ। সর্ববামে জেঃ মান্নান সিদ্দিক ও জেঃ মহাবতজান চৌধুরী।

রাষ্ট্রপতির সাথে নিহত চার আওয়ামী লীগ নেতা সর্বজনাব তাজ উদ্দিন, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

জেনারেল এম এ জি ওসমানী

মেজর জেঃ খলিলুর রহমান

দেশের পরিস্থিতি বিস্ফোরণমুখ হয়ে উঠলো। যে কোনো মুহূর্তে তুমুল গোলাগুলি শুরু হয়ে যেতে পারে। কিন্তু অবাক ব্যাপার, জনসাধারণ সম্পূর্ণ বে-খবর। শহরের রাস্তাঘাটে জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কোথাও ভয়ভীতি বা বিভ্রান্তির কোনো চিহ্নই নেই। অফিস আদালতে শুধু ফিস্‌ফাস্, গুঞ্জন, নানা জিজ্ঞাসা।

বঙ্গভবনে সরকার বলতে তখন একমাত্র প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আর তার সাথে বর্ষীয়ান জেনারেল ওসমানী। খালেদ মোশাররফের পক্ষ থেকে একটি ডেলিগেশন বঙ্গভবনে রওয়ানা দিতে প্রস্তুত হলো। ডেলিগেশনে ছিলেন কর্নেল মালেক (সাবেক মন্ত্রী), কর্নেল মান্নাফ ও কর্নেল চিশতি। বঙ্গভবনে ঢুকতে তাদের দস্তুরমতো ফারুক-রশিদের অনুমতি নিতে হয়। কারণ ক্যান্টনমেন্ট ও বঙ্গভবনে দুই প্রান্তে তখন যুদ্ধাবস্থা বিদ্যমান। এক দেশের দূতরা অন্য দেশে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে যাচ্ছে! সারাদিনই উভয়প্রান্তে টেলিফোনে কথাবার্তা আপস-আলোচনা চলতে থাকে। সকালবেলা ডালিম এসেও কথাবার্তা বলে যায়। সারাদিন দূতদের আনাগোনা, সলা-পরামর্শ।

খন্দকার মোশতাক খালেদের দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে কেবিনেটের অনুমোদন ব্যতীত কোনো সিদ্ধান্ত দিতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বললেন, আমি পদত্যাগ করবো। ওসামনী অবশ্য সৈনিকদের ক্যান্টনমেন্টে ফিরিয়ে নেয়ার প্রস্তাবে একমত হলেন। ওসমানীর প্রস্তাবে মোশতাকও রাজি হলেন। কিন্তু মেজর রশিদ রাজি হলো না।

ক্যান্টনমেন্টে মেজরদের ফেরত পাঠানোর দাবির কথা মেজর রশিদ শুনতে পেয়ে সে তৎক্ষণাৎ এসে মোশতাক সাহেবকে বললো, স্যার, আমরা কিছুতেই ওখানে ফিরে যাবো না। এর চেয়ে বরং আমাদের দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেন। রশিদ প্রস্তাব দিলো, দরকার হলে বিদেশি প্লেনের ব্যবস্থা করতে হবে। ফারুক দেশত্যাগে রাজি ছিলো না। কিন্তু রশিদ তাকে বুঝিয়ে রাজি করায়। এসব শুনে মোশতাক ঘাবড়ে যান, তিনি কাঁদোকাঁদো কণ্ঠে বলেন, তাহলে বাবা আমাকেও তোমাদের সাথে বাইরে যেতে দাও।

মেজরদের দেশত্যাগ

অনেকক্ষণ আলোচনার পর খন্দকার মোশতাক প্রস্তাব দেন মেজরদের ক্যান্টনমেন্টে না পাঠিয়ে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিতে। ওসমানী এ নিয়ে খালেদের সাথে আলোচনা শুরু করলেন। কর্নেল মালেক খালেদকে টেলিফোনে এই পরিস্থিতির কথা জানালে তিনি এ ব্যাপারে আরো আলোচনার জন্য তাদের ক্যান্টনমেন্টে ফিরে আসতে বলেন।

অতঃপর ৪র্থ বেঙ্গলে খালেদের হেডকোয়ার্টারে এ নিয়ে মিটিং বসলো। উপস্থিত ছিলেন এয়ার মার্শাল তোয়াব, এ্যাডমিরাল খান, ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান, ব্রিগেডিয়ার রউফ, কর্নেল মালেক প্রমুখ। বহুক্ষণ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হলো এই মুহূর্তে শান্তির খাতিরে তাদের দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়াই মঙ্গলজনক হবে। বাংলাদেশ বিমানের একটি প্লেন ব্যবস্থা করা হবে।

শেষ পর্যন্ত উভয়পক্ষের সম্মতিতে মেজরদের দেশত্যাগ করার সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়। এয়ার মার্শাল তোয়াবকে তাদের দেশত্যাগ, প্লেনের ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট দেশের ভিসা ইত্যাদির দায়িত্ব দেয়া হয়। তাকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে তড়িৎ ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেয়া হয়। ফারুক এবং রশিদ উভয়েই বলে, আমরা শুধু রক্তপাত এড়াবার জন্য দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত নেই। আমাদের শক্তি ওদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। ফারুক বলে, আমি তো তখনই ট্যাংক নিয়ে সরাসরি ক্যান্টনমেন্টে মার্চ করে ৪৬ ব্রিগেড উড়িয়ে দিতে প্রস্তুত ছিলাম। যদিও মেজর রশিদের দেশত্যাগের অতি আগ্রহের কারণ নিহিত ছিল 'অন্যত্র' (?)

৩ নভেম্বর দুপুরের দিকে পুলিশের আইজি বঙ্গভবনে ফোন করলে জেনারেল খলিল ফোন ধরেন। আইজি তাকে জানান, গত রাত্রে আর্মির লোকজন জেলে ঢুকে চার আওয়ামী লীগ নেতাকে হত্যা করেছে। তিনি চমকে ওঠেন! সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছুটে গিয়ে প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারি মাহবুব আলম চাষীকে সংবাদটি দিয়ে প্রেসিডেন্টকে জানাতে বলেন। চাষী তখনই প্রেসিডেন্টের কাছে গিয়ে সংবাদটি দেন। রুম থেকে বেরিয়ে এসে চাষী বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ঘটনা জানেন'। ঐদিনই বঙ্গভবন ও ক্যান্টনমেন্টে যুদ্ধাবস্থার উত্তপ্ত পরিবেশ বিদ্যমান থাকায় সংবাদটি জেঃ খলিল আর কাউকে শোনাননি, চেপে যান। তার কথা হলো, আমি ডিফেন্স স্টাফ প্রধান। আমার দায়িত্ব প্রেসিডেন্টকে ঘটনাটি জানানো। আমি তাই করেছিলাম। অন্যান্যকে বলাবলি করতে যাবো কেন?

ওদিকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অফিসাররা সারাদিন পরিশ্রম করে মেজরদের দেশত্যাগের ব্যাপার চূড়ান্ত করতে সক্ষম হন। ৩ নভেম্বর সন্ধ্যায় বাংলাদেশ বিমানের একটি প্লেন তেজগাঁও বিমান বন্দরে অপেক্ষা করছিল। অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত ফারুক-রশিদসহ ১৭ জন সদস্য বিমানে আরোহণ করে। তারা তাদের স্ত্রীদেরও সঙ্গে নিয়ে যায়। মেজর শাহরিয়ার তার বান্ধবীকেও সাথে নিয়ে যায়। প্লেনে আরোহণের সময় বিপদ আশঙ্কা করে মেজররা তাদের অস্ত্রশস্ত্র সাথে রাখতে চায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেগুলো ফেলে রেখে যেতে হয়। যাওয়ার সময় তাদের বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। সন্ধ্যা ৮-৪৫ মিনিটে প্লেন তেজগাঁও বিমান বন্দর ত্যাগ করে।

চট্টগ্রামে রিফিলিং করে প্লেনটি আবার সরাসরি ব্যাংকক রওয়ানা দেয়।

মেজরদের দেশত্যাগের পর বঙ্গভবনে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। খালেদ মোশাররফ চাইছিলেন মোশতাক রাষ্ট্রপতি হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবেন। কিন্তু মোশতাক বললেন, তিনি ইতিমধ্যেই পদত্যাগ করেছেন। এখন তিনি তার নিজ বাসভবনে চলে যাবেন। বহুক্ষণ বিতর্ক চলার পর মোশতাক দুটি শর্তে রাষ্ট্রপতি থাকতে সম্মত হলেন—

প্রথমত, সেনাবাহিনীকে তার প্রতি আনুগত থাকতে হবে এবং সশস্ত্রবাহিনীর প্রধানদের তার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, মন্ত্রিসভাকে বৈঠকে বসতে দিতে হবে এবং মন্ত্রিসভাকে তার প্রতি সমর্থন প্রকাশ করতে হবে। ব্রিগেডিয়ার খালেদের কাছে এইসব মোটামুটি মনঃপুত

হলেও তিনি দাবি করলেন তাকে জেনারেল জিয়ার স্থলে সেনাবাহিনী প্রধান নিয়োগ করতে হবে। খালেদের এই দাবি এয়ার ভাইস মার্শাল তোয়াব এবং এ্যাডমিরাল এম এইচ খানও সমর্থন করলেন। প্রেসিডেন্ট এবং খালেদ মোশাররফের মধ্যে এসব বিতর্ক রাত এগারোটা পর্যন্ত চলতে থাকে। কিন্তু একগুঁয়ে মোশতাক কেবিনেটের অনুমোদন ছাড়া চীফ অব স্টাফ পরিবর্তন করতে অস্বীকার করেন। জেঃ ওসমানীও মোশতাককে সমর্থন করেন।

কুখ্যাত জেল হত্যা

২/৩ নভেম্বর গভীর রাতে সবার অজ্ঞাতে সংঘটিত হলো বিশ্বের এক জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড। রিসালদার মোসলেম উদ্দিনের নেতৃত্বে একটি সৈন্যদল গাড়ি করে সেন্ট্রাল জেলে পৌঁছায়। তারা ভেতরে ঢুকে অন্তরীণ আওয়ামী লীগ নেতাদের বাইরে নিয়ে যেতে চায়। জেলার আব্দুল আওয়াল সশস্ত্র সৈন্য দেখে ভেতরে ঢোকার অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। এ নিয়ে তার সঙ্গে ঘাতক দলের অনেকক্ষণ কথা কাটাকাটি হলো। তারা জোর করে ঢুকে যেতে চাচ্ছিল। কারাগারে পাগলা ঘণ্টা বেজে উঠল। ডি.আই.জি. ও আই.জি. (প্রিজন) গেটে ছুটে আসলেন।

জেল গেট থেকে আই.জি. (প্রিজন) সরাসরি বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্ট মোশতাককে জেল গেটে মোসলেমউদ্দিন এর আগমন ও ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা অবগত করেন। মোশতাক জলদ গম্ভীর কণ্ঠে তাদের জেলে ঢুকার নির্দেশ দেন। হতবাক আই.জি.! খোদ প্রেসিডেন্ট বেআইনি নির্দেশ দিলে বেচারা আই.জি./ ডি.আই.জি. কী করতে পারে?

ঘটনার ২১ বছর পর বর্তমানে জেল হত্যার প্রামাণ্য দলিল উদ্ধার করা হয়েছে। দীর্ঘ ২১ বছর গুরুত্বপূর্ণ ফাইলটি জেলখানার আই.জি. প্রিজনের কক্ষে ফাইলের স্তূপে চাপা পড়েছিল। গত ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ তারিখে তা বহু খোঁজাখুঁজির পর উদ্ধার করা হয়। এতে দেখা যায় খন্দকার মোশতাক এবং মেজর রশিদ চার জাতীয় নেতাকে হত্যার জন্য সরাসরি নির্দেশ প্রদান করেন। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী তৎকালীন আই, জি (প্রিজন) জনাব নুরুজ্জামানের লিখিত রিপোর্ট থেকে এ তথ্য সন্দেহাতিতভাবে প্রমাণ হয়েছে। তাঁর রিপোর্ট গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বইয়ের পরিশিষ্ট 'গ'-তে সংযোজন করা হলো। প্রেসিডেন্টের নির্দেশে মোসলেমউদ্দিন ও তার ঘাতক দলকে জেলের ভেতরে প্রবেশ করতে দেয়া হয়। আই.জি ও ডি.আই.জি. তাদের পিছন পিছন অনুসরণ করেন। এ সময় মোসলেম উদ্দিনকে ভয়ংকর দেখাচ্ছিল, সম্ভবত সে মাতাল ছিল।

তাজউদ্দিন এবং নজরুল ইসলাম ১নং সেলে ছিলেন। পরবর্তী সেলে ছিলেন মনসুর আলী ও কামরুজ্জামান। তাদেরকে তাজউদ্দিনের সেলে এনে জড়ো করা হয়। তারপর খুব কাছে থেকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দিয়ে তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করা হয়। তাদের মধ্যে তিনজন সঙ্গে সঙ্গেই মারা যান। তাজউদ্দিনের পায়ে ও হাঁটুতে গুলি লাগে, প্রচণ্ড রক্তক্ষরণে ধীরে ধীরে তিনিও মারা যান। তিনি পানি পানি বলে কাতরাচ্ছিলেন। কিন্তু ভীত বিহ্বল পরিবেশে কেউ এক ফোঁটা পানি এগিয়ে দিতেও সাহস পায়নি। পাশের

সেলে ছিলেন আবদুস সামাদ আজাদ। তার নাম লিস্টে না থাকায় ঘাতকরা তাকে ছেড়ে দেয়। বেঁচে যান আজাদ। কেউ কিছু ভাল করে বুঝে ওঠার আগেই আকস্মিকভাবে ঘটে গেল এই হত্যাকাণ্ড। এর কিছুক্ষণ পরে নায়ক আলীর নেতৃত্বে আর একটি ইউনিফরম পরা ঘাতকদল আসে এবং মৃত চার নেতার ওপর বেয়নেট চার্জ করে ও দ্বিতীয় দফা গুলি বর্ষণ করে।

ঘটনাটি এতোই বর্বরোচিত ছিল যে মুখ খুলে কেউ কিছু বলতেও সাহস পায়নি। সৈনিকদের কী প্রয়োজন পড়েছিল, একটি রাজনৈতিক দলের নেতাদের জেলের ভেতরে ঢুকে হত্যা করার? এর একমাত্র কারণ মনে করা হয়, খন্দকার মোশতাক আহমদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ঐসব রাজনৈতিক নেতা। কোনো কারণে যদি তার বিরুদ্ধে পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, তাহলে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তার প্রতিপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের প্রথম আভাসেই নির্মূল করে দেয়ার পূর্ব প্রণীত প্ল্যানটিই মোসলেম উদ্দিন নীল নকশার শিডিউল অনুযায়ী কার্যকর করে। কারাগারের অভ্যন্তরে এরকম নির্মম ঘটনা ইতিপূর্বে আর কখনো ঘটেনি। সমগ্র জেল খানায় নেমে আসে ভয়, ভীতি ও বিষাদের ছায়া।

৪ নভেম্বর

সারাদিন সেনা ছাউনির সর্বত্র একই জল্পনা-কল্পনা—আর্মি চীফ জিয়াকে কেন বন্দি করে রাখা হবে? এটা কোন ধরনের আর্মি? এসব কী ধরনের খেলা? অফিসারদের মধ্যে যদি ক্ষমতা নিয়ে এভাবে কাড়াকাড়ি চলে তাহলে সেপাইরা কোনদিকে যাবে? এটা কী ভারতীয় চক্রান্ত? খালেদ কী ভারতের চর? ধর্ম-কর্ম কী বন্ধ হয়ে যাবে? চলে ঢালাও কানা-ঘুষা। ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে-বাইরে সর্বত্র চলে অশুভ জল্পনা-কল্পনা।

এখানে অবাক হওয়ার ব্যাপার হলো, মাত্র কিছুদিন পূর্বে সপরিবারে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান সেনাবাহিনীর সদস্যদের হাতে নিহত হন, কিন্তু তার মৃত্যু ঘটনা নিয়ে সৈনিকরা উত্তেজিত হয়নি, বিশেষ মাথাও ঘামায়নি, অথচ জিয়াউর রহমানের বন্দি হওয়ার ঘটনায় অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে সৃষ্টি হলো প্রবল অসন্তোষ। দুদিন ধরে ক্যান্টনমেন্টে দারুণ অনিশ্চয়তার ছাপ। সেনাসদরে গুঞ্জন। কাজকর্ম সব বন্ধ। অসন্তোষ চরমে।

খবর ছড়িয়ে পড়লো, জিয়াউর রহমান সেনাপ্রধান পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। চাপের মুখেই তা করেছেন। একখানা সাদা কাগজে তার স্বেচ্ছায় পদত্যাগ পত্রে দস্তখত নেয়া হয়েছে। একই পত্রে পেনশনের আবেদন করেছেন। খালেদের পক্ষ থেকে ব্রিগেডিয়ার রউফ তার কাছে গিয়ে পদত্যাগপত্র সই করিয়ে নিয়ে আসেন। গৃহবন্দি জিয়া পদত্যাগপত্রে সই করতে বাধ্য হয়েছেন। এতে জিয়ার প্রতি সবার সহানুভূতি আরো বেড়ে গেলো।

সকাল বেলা ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট। বেলা সাড়ে আটটার দিকে সেখানে খালেদ শাফায়েতের হেডকোয়ার্টার দেখতে গেল। ওটা তখন রীতিমতো আর্মি অপারেশন হেডকোয়ার্টার। বহু তরুণ অফিসার আশেপাশে জটলা করছে। আমার জিপ থেকে

নামতেই দেখি অদূরে বারান্দায় খালেদ উত্তেজিতভাবে পুলিশের ডিআইজি ই. এ. চৌধুরীর সাথে কথা বলছে। তাকে শক্তভাবে চার্জ করছে, কেন এসব আগে জানালেন না? খালেদের উচ্চ কণ্ঠ। তীব্র আর্তনাদ! আমার মনে হলো গুরুতর কিছু ঘটেছে।

এমতাবস্থায় সামনে একজন জুনিয়ার অফিসারকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, কী ব্যাপার? কী হয়েছে? সে বললো, স্যার, গত রাত্রে জেলে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। চারজন আওয়ামী লীগ নেতা মারা গেছেন। আমি বিস্তারিত কিছু জানি না।

হত্যাকাণ্ড ঘটনায় খালেদকে খুবই বিব্রত মনে হলো। মাত্র গত রাত্রেই সে ফারুক-রশিদ গ্রুপের মেজরদের দেশ ত্যাগ করতে অনুমতি দিয়েছে। জেল হত্যাকাণ্ড ঘটনার কথা জানলে সে অবশ্যই সবাইকে আটকে রেখে বিচার করতো। খবরটি যখন জানাজানি হলো, ততক্ষণে পাখিরা হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে গেছে।

খালেদ-শাফায়েত তখনই সিদ্ধান্ত নিলো, মোশতাককে আর প্রেসিডেন্ট রাখা চলবে না। বিকল্প খুঁজতে হবে। ৪র্থ বেঙ্গলের পরিবেশটি তখন বেদনাবিধুর, থমথমে। আমি বাইরেই দু-একজনের সাথে কথা বলে তাড়াতাড়ি আবার স্টেশন হেডকোয়ার্টারে ফিরে এলাম।

৪ নভেম্বর। সকাল ১০টা। উন্মুক্ত বঙ্গভবন। ক্যান্টনমেন্ট থেকে যে যখন পারছে ছুটে গিয়ে বঙ্গভবনে ঢুকে পড়ছে। খালেদ মোশাররফ নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানকে সাথে নিয়ে বঙ্গভবনে পৌঁছলেন। হাতে তার জেনারেল জিয়ার স্বহস্তে লিখিত পদত্যাগপত্র। এখন তাকে সেনাপ্রধান নিয়োগ করার পথে আর কোনো বাধাই নেই। তবু বেরসিক মোশতাক জেনারেল ওসমানীর সাথে আলোচনা করে আবার দৃঢ়তার সাথে বলেন, তিনি মন্ত্রিসভার অনুমোদন ব্যতীত কোনো বড় সিদ্ধান্ত দেবেন না। মন্ত্রিসভার বৈঠক বিকেলেই ডেকেছেন।

মেজরা চলে যাওয়ার পরপরই খন্দকার মোশতাক পদত্যাগ করতে চান, কিন্তু খালেদ তাকে চালিয়ে যেতে অনুরোধ করেন, যদিও শাফায়েত জামিল তাকে পছন্দ করছিল না। আগের দিন মোশতাক দুটি শর্ত দেন। শর্ত দুটো খালেদ মোশাররফ মোটামুটি মেনে নেন।

নতজানু খালেদ

আসলে এই সময় উচ্চাকাঙ্ক্ষী খালেদ দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিলেন। তিনি ক্ষমতা চাচ্ছিলেন। তিনি চীফ অব স্টাফ হতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু রক্তপাত না করে কৌশল প্রয়োগে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি জিয়াকে সরিয়ে 'চীফ' হতে চাচ্ছিলেন। রাষ্ট্রপতি কে থাকে না-থাকে, তাতে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিলো না। তিনি নাচতে নেমে ঘোমটা দিচ্ছিলেন।

খালেদ নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রেসিডেন্টের যথাযথ অনুমোদনসহ চীফ অব স্টাফ হতে চাচ্ছিলেন, শক্তি প্রয়োগ করে নয়। এই পয়েন্টেই তিনি মোশতাকের কাছে নতজানু হয়ে পড়েন। আর সুযোগ বুঝে চতুর মোশতাক ঐ সময় তার সাথে 'ইঁদুর-বেড়াল' খেলা শুরু করেন। এভাবে খালেদ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে আসল কাজ ভুলে যান।

খালেদ বরাবরই ছিলেন একজন দক্ষ ও প্রতিভাবান অফিসার। কিন্তু ঐ মুহূর্তে তিনি যারপরনাই অদক্ষতার পরিচয় দেন, যার ফলাফল তাঁর জন্য মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনে। বারবার প্রশ্ন জাগে, অভ্যুত্থানের নায়ক ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ একটি নাজুক মুহূর্তে তাঁর তুচ্ছ প্রমোশনের জন্য এভাবে খন্দকার মোশতাকের পিছনে কেন নতজানু হয়ে ছোটাছুটি করলেন? এরকম অদক্ষতার পরিচয় খালেদ জীবনে আর কোনোদিন তাঁর কর্মক্ষেত্রে দেখাননি। একজন ক্ষমতাধর সেনানায়ককে কীভাবে প্রমোশন নিতে হয়, ঐদিনই কিছুক্ষণ পর কর্নেল শাফায়েত জামিল বঙ্গভবনে প্রবেশ করে দেখিয়ে দিলো।

দুপুরের বঙ্গভবনে চলছে দেন-দরবার, আলাপ-আলোচনা। বঙ্গভবনে উর্দীপরা অফিসারদের এক কক্ষ থেকে অন্য কক্ষে দ্রুত আনাগোনা। উত্তপ্ত আলোচনা। বিভিন্ন মতবাদের অফিসাররা ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত। সলাপরামর্শ। বঙ্গভবনে অস্ত্রধারীদের উপস্থিতিতে বিশৃঙ্খল অবস্থা। পরিস্থিতি হয়ে ওঠে জটিল ও বিষাক্ত। ক্ষমতার সর্বোচ্চ ভবনে পৌঁছে সবাই ক্ষমতার মসনদে বসার স্বপ্ন দেখতে থাকে। যে কোনো মুহূর্তে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলো। উন্মুক্ত পিস্তল, স্টেনগান কাঁধে তরুণ অফিসারদের আনাগোনা। ইউনিফরমধারী লোকজনদের ভারি বুটের খট্ খট্ শব্দে প্রকম্পিত বঙ্গভবন। ঘন ঘন ব্যস্ততা। ওসমানী, খালেদ, তোয়াব, এম এইচ খান, জেনারেল খলিল উপস্থিত। 'বন্দুকের নলই সকল ক্ষমতার উৎস'— বস্তুত ঐ মুহূর্তে বঙ্গভবনে সেই পরিস্থিতিই বিরাজ করছিল।

একটি উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে মোশতাক আহমদ ২৬ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভার বৈঠক করছিলেন। বৈঠকে জেলহত্যা তদন্তের জন্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। সভায় জেলহত্যা নিয়ে এবং ফারুক-রশিদের দেশ ত্যাগ নিয়েও উত্তপ্ত বিতর্ক হয়। মন্ত্রীরা বিভিন্ন জন বিভিন্ন প্রসঙ্গ উত্থাপন করে সময় নষ্ট করছিলেন। সভার প্রারম্ভেই ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, রিয়ার এ্যাডমিরাল এম এইচ খান ও এয়ার ভাইস মার্শাল তোয়াব ভেতরে এসে সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য ও প্রেসিডেন্টকে মেনে চলার প্রতিজ্ঞা পাঠ করেন। এতে মন্ত্রীরা যথেষ্ট স্বস্তি অনুভব করে গলা খুলে কথা বলতে থাকেন।

এক পর্যায়ে মন্ত্রিপরিষদে খালেদ মোশাররফকে চীফ অব স্টাফ নিয়োগের ব্যাপারে কিছুটা বিতর্কের সৃষ্টি হয়। প্রেসিডেন্ট তার উপদেষ্টার সুপারিশে চীফ অব স্টাফ নিয়োগ করতে পারেন। তবে ওসমানী স্পষ্ট ভাষায় জোর গলায় জানিয়ে দিলেন যে, সেনাপ্রধান নিয়োগের ব্যাপারে সাধারণ নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। এতে খালেদ মোশাররফের সাথে ওসমানী ও মোশতাকের বেশ কিছুটা উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়।

সারাদিন ধরে চলছে মিটিং আর মিটিং। কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না, সবকিছু 'লেজে গোবরে অবস্থা' ওদিকে দুপুরের পর ক্যান্টনমেন্টে ৪র্থ বেঙ্গল হেড কোয়ার্টারে হতাশা চরমে ওঠে। অভ্যুত্থানের নেতা খালেদ মোশাররফ সেই যে সকালে বঙ্গভবনে

গিয়েছেন, আর তাঁর খবর নেই। তাঁর সাথে টেলিফোনেও কোনো যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। তিনিও মন্ত্রীদের সাথে মিটিং-গোলকধাঁধায় আটকা পড়ে গেছেন। সেখানে তাঁর প্রমোশন নিয়ে ফাইট করছেন।

ক্যান্টনমেন্টে শাফায়েত জামিল অস্থির হয়ে ওঠে। সন্ধ্যার দিকে কর্নেল মালেককে সঙ্গে নিয়ে বঙ্গভবনের দিকে ছুটে গেল। বঙ্গভবনে ঢুকেই সে চিৎকার দিয়ে ওঠে, কোথায় খালেদ মোশাররফ? সবাই বলল; স্যার, তিনি কেবিনেট রুমে মিটিং করছেন।

সশস্ত্র শাফায়েতের অনুপ্রবেশ

যখন মন্ত্রিসভায় উত্তপ্ত আলোচনা চলছিল, তখন ঘটে এক নাটকীয় কাণ্ড। আকস্মিকভাবে সজোরে দরজা ধাক্কা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন ডাণ্ডা হাতে কর্নেল শাফায়েত জামিল। পিছনে স্টেনগান হাতে পাঁচজন সশস্ত্র অফিসার। ভীত সন্ত্রস্ত মন্ত্রিসভার সদস্যগণ। তারা আসন ছেড়ে ছুটে পালাতে উদ্যত। মেজর ইকবাল (পরবর্তীতে মন্ত্রী) খন্দকার মোশতাকের দিকে স্টেনগান তাক করে বলতে থাকেন, আপনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার দেখেছেন কিন্তু বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেজর দেখেননি। এখন দেখবেন। ওসমানী অসম সাহসে মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন, বললেন, খোদার ওয়াস্তে গোলাগুলি করবে না। তোমরা এসব পাগলামি বন্ধ করো। বেঁচে গেলেন মোশতাক। উত্তপ্ত মুহূর্তে উন্মুক্ত স্টেনগান যে কোনো সময় গর্জে উঠতে পারতো। বঙ্গভবন চত্বরে ৩২ নম্বর রোডের রক্তাক্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে ঘটতে থেমে গেল।

শাফায়েত জামিল খন্দকার মোশতাকের পদত্যাগ দাবি করে বললেন, আপনি একজন খুনি। আপনি জাতির পিতাকে খুন করেছেন। আপনার সরকার অবৈধ। আপনার ক্ষমতায় থাকার কোনো অধিকার নেই। আপনাকে এখনই পদত্যাগ করতে হবে। মোশতাক মাথা নেড়ে তখনই রাজি হন।

এই সময় শাফায়েত মোশতাকের সাথে বেশ রূঢ় ব্যবহার করে। ওসমানী প্রতিবাদ করে বলেন, ওনার সাথে অশোভন ব্যবহার করা ঠিক হবে না। খোদার ওয়াস্তে তোমরা এসব বন্ধ করো। রক্তপাত ঘটিও না। শাফায়েত বলল, আপনি চুপ থাকুন। আপনি উপদেষ্টা হিসেবে এতদিন কী উপদেশ দিয়েছেন? জেনারেল খলিল প্রতিবাদ করে বলেন, দেখো, ওনাকে এভাবে অপমান করা উচিত হবে না। দয়া করে শান্ত হও। শাফায়েত জামিলের চিৎকার, আপনি চুপ থাকুন। আর কথা বলবেন না। আপনি জেল হত্যার কথা জানতেন, তাও ওদের যেতে দিয়েছেন। আপনাকেও অ্যারেস্ট করা হলো। শাফায়েত এই সময় উত্তেজিত। আর তার অফিসাররা শুধু সংকেতের অপেক্ষায়।

শাফায়েত যখন চিৎকার দিয়ে ভেতরে ঢোকে, তখন খালেদও বসে ছিল। আসলে উত্তেজিত শাফায়েতের অবস্থা দেখে সেও কিছুটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। উত্তপ্ত পরিবেশ। নাজুক পরিস্থিতি। জেনারেল ওসমানী উঠে তখন শাফায়েতকে, খালেদকে

এবং অন্যান্যকে শান্ত থাকার আহ্বান জানাচ্ছিলেন। এই সময় কেবিনেট মিটিং-এর পরিবেশ সম্পূর্ণ এলোমেলো হয়ে যায়। এক সময় কর্নেল মালেক শাফায়েতকে বুঝিয়ে কোনোক্রমে কক্ষের বাইরে নিয়ে যান। সবাই এবার হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। মন্ত্রিসভার কার্যক্রম আবার শুরু করা হয়।

ওসমানী তাদের বললেন, তোমাদের যা যা প্রস্তাব মিটিং-এ বলে যাও। মিটিং-এ সবই পাস করা হবে। অতঃপর কর্নেল এম. এ. মালেক ভেতরে ঢুকলেন। তিনি পয়েন্টগুলো বলে যাচ্ছিলেন। বেশ কিছু প্রস্তাব গৃহীত হলো–

১। মুজিব হত্যা এবং জেলহত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা হবে।
২। খালেদ মোশাররফকে 'চীফ অব স্টাফ' নিযুক্ত করা হবে।
৩। মোশতাক প্রেসিডেন্ট হিসেবে থাকবেন, যতক্ষণ না অন্য ব্যবস্থা হয়। তবে তিনি অসুস্থতার জন্য পতত্যাগ করবেন বলে সম্মত হন।
৪। বঙ্গভবন থেকে সব সৈনিক ক্যান্টনমেন্টে ফিরে যাবে।

মন্ত্রিসভার বৈঠক চললেও তখন খালেদ মোশাররফ, শাফায়েত জামিল পালাক্রমে ঘোরাফেরা করে পয়েন্ট দিচ্ছিলেন। বন্দুকের নলের মুখে ঐ সময় বেশ কিছু কাগজপত্রে মোশতাকের জবরদস্তি সই নেয়া হয়। দীর্ঘরাত পর্যন্ত মিটিং চললো। রাত্রি প্রায় ২টায় মিটিং শেষ হলে কর্নেল মালেক মন্ত্রীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, ভদ্রলোকগণ, ৪ জন ছাড়া আপনারা বাকি সবাই বাসায় যেতে পারেন।

সর্বনাশ! এটা আবার কোন নির্দেশ। চার নেতাতো শেষ। এবার কোন চারজন সবাই চমকে উঠলেন! শাহ মোয়াজ্জেম, তাহের উদ্দিন ঠাকুর, ওবায়দুর রহমান, নূরুল ইসলাম মঞ্জুর। তারা ভয়ে কাঁপতে থাকলেন। বাকিরা উর্ধ্বশ্বাসে বঙ্গভবন ত্যাগ করে নিজ নিজ বাসার দিকে ছুটে চললেন। যমদূতদের হাত থেকে ছাড়া পেয়েছেন, এটাইতো আল্লাহর রহমত!

ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করে সেনাবাহিনী প্রধান করা হয়। এয়ার মার্শাল তোয়াব ও এ্যাডমিরাল এম এইচ খান হাস্যরত খালেদের কাঁধে মেজর জেনারেলের র‍্যাংক পরিয়ে দেন। পরদিন বাংলাদেশ অবজারভার পত্রিকার প্রথম পাতায় তাঁর হাস্যরত ছবিটি ছাপানো হয়। দুর্ভাগ্য খালেদের! মাত্র ৭২ ঘন্টা তিনি মেজর জেনারেলের র‍্যাংকটি ধরে রাখতে পেরেছিলেন।

দীর্ঘ ম্যারাথন মিটিং-এর ক্লান্ত শ্রান্ত বিধ্বস্ত মোশতাক, রাত তিনটায় বঙ্গভবনে তার শোবার ঘরে প্রত্যাবর্তন করলেন। তার এবং তার মন্ত্রিসভার শেষ মুহূর্ত। বর্ষীয়ান উপদেষ্টা জেনারেল ওসমানী তার সাথে কোলাকুলি করে তার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। ওসমানী বললেন, 'Sorry oldman, we played a bad game. Let us forget and forgive.'

গভীর রাত। ওসমানী বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁর বাসায় যাওয়ার গাড়ি নেই। বললেন, এখন আমি আর ডিফেন্স উপদেষ্টা নই। সুতরাং সরকারি গাড়ি ব্যবহার করবো না। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কর্নেল মালেক এগিয়ে এসে বললেন, স্যার, আপনি

আমার গাড়িতে আসুন। আমি আপনাকে বাসায় পৌঁছে দেবো। ওসমানী তার গাড়িতে করেই গভীর রাতে বাসায় ফিরলেন।

বঙ্গভবনে যখন খালেদ মোশাররফ প্রেসিডেন্ট মোশতাকের সাথে এইসব দর কষাকষিতে ব্যস্ত, তখন তার অজান্তেই ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে বিভিন্ন ইউনিটের সৈনিকবৃন্দ এবং শহরে জাসদের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা সশস্ত্র লোকজনদের ভেতর আঘাত হানার গোপন প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে।

৪ নভেম্বর কর্নেল তাহেরের উপস্থিতিতে মোহাম্মদপুরে এবং এলিফেন্ট রোডে একটি বাসায় জাসদ বিপ্লবী গ্রুপের গোপন সভা অনুষ্ঠিত হয়। বেশ কিছু সৈনিক প্রতিনিধিও সেখানে উপস্থিত ছিল। সভায় বিস্তারিত প্রোগ্রাম আলোচনা করা হয়। বিপ্লবীরা তাদের নেতাদের তড়িৎ আঘাত হানার জন্য উত্তেজিত করতে থাকে। ক্যান্টনমেন্টে প্রচুর লিফলেট বিতরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাহেরের নেতৃত্বে তারা জিয়াকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে মুক্ত করে আনবে। সবার মুষ্টিবদ্ধ প্রতিজ্ঞা।

বলাবাহুল্য, জিয়া বন্দি হওয়ার পূর্ব মুহূর্তেই বন্ধুবর তাহেরকে অভ্যুত্থানের মেসেজ পাঠাতে সক্ষম হন এবং তাকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানান। অবস্থাদৃষ্টে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এসব ব্যাপারে জিয়ার সাথে তাহেরের আগেভাগেই একটি সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহের এ রকম পরিস্থিতির জন্য মোটামুটি তৈরি ছিলেন। এবার ক্যান্টনমেন্টে হঠাৎ করে উদ্ভূত সৈনিক অসন্তোষের সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলেন না। তিনি দলের লোকজনদের বললেন, Now or never ...... তারা কর্নেল তাহেরের নির্দেশে তৎক্ষণাৎ ক্যান্টনমেন্টের বাইরে ভেতরে গোপন তৎপরতা জোরদার করলো। বিভিন্ন ইউনিটের সমমনা সৈনিকদের সাথে তারা যোগাযোগ স্থাপন করলো।

৫ নভেম্বর

সকালবেলা আর্মি হেডকোয়ার্টারে মিটিং। সভাপতিত্ব করেন আর্মির নবনিযুক্ত 'চীফ অব স্টাফ' মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ বীর উত্তম। কাঁধে তার ঝলমল করছে নতুন র‍্যাংক। উপস্থিত হয়েছেন নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধান, ডি.জি.এফ. আই. রক্ষীবাহিনী প্রধান, আইন মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, এটর্নি জেনারেল। তারা দীর্ঘ আলোচনায় লিপ্ত হলেন, কীভাবে শান্তিপূর্ণভাবে আইনগত দিক বজায় রেখে মোশতাক আহমদের কাছ থেকে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা প্রধান বিচারপতির কাছে হস্তান্তর করা যায়।

সভায় অন্যান্য বিষয়ও আলোচনা হয়। সিদ্ধান্ত হয়, বঙ্গভবন থেকে ল্যান্সার ও টু-ফিল্ড সৈন্যদের DISARM করে সন্ধ্যায়ই ক্যান্টনমেন্টে ফেরত পাঠানো হবে। কিন্তু পরে অকস্মাৎ খালেদ কী মনে করে তাঁর সিদ্ধান্ত পাল্টালেন; বললেন, থাক্, তাদের অস্ত্রসহই ক্যান্টনমেন্টে ফেরত যেতে দাও। তা না হলে তারা ঘাবড়ে যাবে। অন্য সমস্যা দাঁড়াবে। দয়ার্ত খালেদ মোশাররফ! তার পক্ষ থেকে এটি ছিল 'ভুল সিদ্ধান্ত'।

ঐ দিনই অস্ত্রশস্ত্রসহ বেঙ্গল ল্যান্সার ও টু-ফিল্ডের বাকি সৈন্যরা ক্যান্টনমেন্টে সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসে।

৫ তারিখ সন্ধ্যা ১০ ঘটিকা। জেনারেল খালেদ মোশাররফ নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানদের সাথে নিয়ে বঙ্গভবনে পৌঁছেন। খন্দকার মোশতাক আহমদ তখনও প্রেসিডেন্ট। তাঁরা তার কাছ থেকে পদত্যাগপত্র (অসুস্থতার কারণে) এবং অন্যান্য আরো কিছু কাগজপত্র শেষবারের মতো সই করিয়ে নিয়ে আসেন।

রাত সাড়ে এগারোটায় বিদায়ী প্রেসিডেন্ট মোশতাক আহমদ পুলিশ প্রহরায় বঙ্গভবন থেকে বিদায় নিয়ে তার আগামসিহ লেনের বাসায় প্রত্যাবর্তন করেন। শেষ হলো তার ২ মাস ২০ দিন ব্যাপী শাসন-আমল। ৫ নভেম্বর ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বিভিন্ন ইউনিটের সৈনিকদের কিছু গোপন বৈঠক হয়। সর্বত্র বিদ্রোহের উত্তাপ। বন্দি জিয়াকে বের করে আনার সংকল্প। কী অবাক কাণ্ড! ক্যান্টনমেন্টের বাইরে ভেতরে গোপনে এতসব ঘটে যাচ্ছে। কিন্তু খালেদ-শাফায়েত সম্পূর্ণ বেখবর। তারা ক্ষমতার পঙ্কিলে জড়িয়ে গেছে। তারা বুঝতেই পারেনি, তাদের পায়ের তলা থেকে দ্রুত মাটি সরে যাচ্ছে। সর্বত্র উল্টো হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

৪ নভেম্বর শহরে আওয়ামী লীগের বিরাট মিছিল। মিছিলের অগ্রভাগে খালেদ মোশাররফের মাতা ও ছোট ভাই রাশেদ মোশাররফ। তারা শ্লোগান তুলছে, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার চাই। ৫ নভেম্বর সকল পত্র-পত্রিকায় তাদের সচিত্র সংবাদ বের হলো। এসব ছবি দেখে খালেদ খুবই ভেঙে পড়ে। সে ফোন করে বললো; মা, তোমরা আমাকে শেষ করে দিলে। আমি এখন আর বাঁচবো না। তোমরা কেন এসব করতে গেলে?

চতুর্দিকে ঘূর্ণি হাওয়া। আওয়ামী লীগের মিছিলের সাথে খালেদের 'ক্যু' এক হয়ে পড়ে। সবাই ধরে নিল 'ক্যু' আর মিছিল, ভারতের কারসাজি। আবার বুঝি ভারতীয় আগ্রাসন অত্যাসন্ন? খালেদ বুঝি ভারতের চর! জনসমর্থন ঐ সময় সম্পূর্ণভাবে খালেদের প্রতিকূলে চলে যায়।

দুর্ভাগ্য খালেদের। ৫ নভেম্বর থেকে বাইরে ভেতরে সবকিছু তার বিপক্ষে যেতে শুরু করে। কিন্তু তখনও খালেদ কিছুই বুঝতে পারে না। ক্ষমতার উত্তাপে ছিল এতোই অন্ধ!

ক্যান্টনমেন্টেও খালেদের অবস্থান ভালো ছিলো না। একমাত্র বেঙ্গল রেজিমেন্টগুলোর মধ্যেই মোটামুটি তাঁর সমর্থন ছিল। খালেদ ঢাকায় তাঁর নড়বড়ে অবস্থা শক্তিশালী করার জন্য কর্নেল হুদার রংপুর ব্রিগেডের ১০ম বেঙ্গল এবং ১৫ বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ঢাকায় মুভ করার নির্দেশ দেন। কর্নেল নওয়াজিশের ১০ম বেঙ্গল বগুড়া থেকে খুব তাড়াতাড়ি ৫ নভেম্বর ঢাকার সাভারে এসে উপস্থিত হয়।

মেজর জাফর ইমাম (সাবেক মন্ত্রী) রংপুর থেকে তার ইউনিট ঢাকায় পাঠাবার জন্য সেখানে সমস্ত সিভিল বাস রিকুইজিশন করেন। জাফর ইমাম খালেদকে সাহায্য করার জন্য আগেই ঢাকায় এসে উপস্থিত হন। পরে অবস্থা খারাপ দেখে আবার ৭

নভেম্বর রংপুর ফিরে যান। পরে ৯ নভেম্বর তার ইউনিটের সৈনিকরা তাকে তাড়া করলে আবার ঢাকা পালিয়ে আসেন। তার ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল হুদাও এসেছিলেন ঢাকায় খালেদের পাশে। তিনি আর ফিরে যেতে পারেননি, সৈনিকদের হাতে নিহত হন।

৫ নভেম্বর দুপুরের দিকে জেনারেল খালেদ মোশাররফ একবারই আমাকে টেলিফোন করেছিলেন স্টেশনের অবস্থা জানার জন্য। আমি তাকে স্পষ্ট বলেছিলাম, পরিস্থিতি কিন্তু মোটেই সুবিধার নয়। আমি তাঁকে আরো বলেছিলাম, তুমি বরং ক্যান্টনমেন্টের সব সৈনিক এবং অফিসারদের ডেকে তাদের সবকিছু বুঝিয়ে শান্ত করো। সে বললো, আমি করবো। এর মধ্যে আপনি স্টেশন সিকিউরিটির ব্যবস্থা নিন যাতে বাইরের কোনো পলিটিক্যাল এলিমেন্ট অনুপ্রবেশ না করতে পারে।

৬ নভেম্বর

৬ নভেম্বর সকাল ৯ ঘটিকা। নবনিযুক্ত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম দেশের ষষ্ঠ প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। জমজমাট বঙ্গভবন। উপস্থিত সকল ঊর্ধ্বতন সিভিল ও মিলিটারি কর্মকর্তাবৃন্দ। হাসিখুশি জেনারেল খালেদ মোশাররফ। নতুন প্রেসিডেন্ট আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম। তারা ঘুরে ফিরে সবার সাথে করমর্দন করছেন। ক্লিক! ক্লিক! সর্বত্র সক্রিয় ক্যামেরা, টেলিভিশন। আনন্দমুখর পরিবেশ।

বেলা ১১টার দিকে জেনারেল খালেদ মোশাররফ বাইরে থেকে আগত ফরমেশন কমান্ডারদের নিয়ে কনফারেন্স করলেন। উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লার ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিঃ আমজাদ। যশোহর ব্রিগেডের ব্রিঃ শওকত, রংপুর ব্রিগেডের কর্নেল হুদা। যশোহরের ব্রিগেড কমান্ডার মীর শওকত আলী খালেদকে কড়া স্যালুট দিয়ে গভীরভাবে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, Sir, Congratulation I salute the chair. খালেদ হাসলেন।

আসলে ৬ তারিখ প্রকৃত অবস্থা হলো, সকাল থেকেই ক্যান্টনমেন্টের পরিস্থিতি খুবই ঘোলাটে হয়ে ওঠে। এমনকি খবর পেলাম খালেদের ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকরাও উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তাদেরই কমান্ডিং অফিসার কর্নেল আমিনুল হক (পরে ব্রিগেডিয়ার) এক সময় কোথা থেকে আমাকে স্টেশন হেডকোয়ার্টারে ফোন করে বললো, স্যার, আপনারা বসে খামাখা কী করছেন? আমি তার কথা শুনে অবাক হলাম। কারণ খালেদের অপারেশন হেডকোয়ার্টারই ছিল ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট। সেখানেই এখন উল্টো হাওয়া বইছে।

ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত বিভিন্ন সার্ভিস কোর ইউনিটগুলোর অবস্থার অবনতি ঘটলো। আমার পাশেই সেকেন্ড ফিল্ড রেজিমেন্ট। খবর পেলাম তারা আবার বিদ্রোহ করতে গোপনে তৈরি হচ্ছে। সকাল থেকে বিভিন্নজন এসে বিভিন্ন কথা বলতে থাকে। চারিদিকে নানান গুজব। আমার বিশ্বস্ত হাবিলদার সিদ্দিকুর রহমান এসে জানালো, স্যার দেখেন আজ রাত কীভাবে পার হয়। তার মুখে মুচকি হাসি। আমি তাকে ধমক

দিয়ে এসব কথা প্রকাশ্যে বলতে মানা করলাম। যদিও আমাদের অজ্ঞাতেই আমার হেড কোয়ার্টারের আশেপাশেই বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠছিল।

ক্যান্টনমেন্টে বহু লিফলেট বিতরণ করা হলো। সবকটিই অফিসারদের বিরুদ্ধে সেপাইদের উত্তেজিত করে বিদ্রোহের উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়েছে। অবস্থা খুবই ঘোলাটে হয়ে উঠল। বিভিন্ন ইউনিট থেকে ঘন ঘন টেলিফোন আসতে থাকলো। অনিশ্চিত অবস্থায় সবাই অস্থির। চতুর্দিকে টগবগ অবস্থা। দরকার শুধু একটি স্ফুলিঙ্গের।

আমি দুপুরে কর্নেল খুরশিদ ও মামুনকে ফোন করলাম। সেনানিবাস আর্মি টেনিস কোর্টে জেনারেল জিয়া, জেনারেল শফিউল্লাহ, মামুন, খুরশিদ ও আমি প্রতিদিন নিয়মিত টেনিস খেলতাম। এই ক'দিনের গণ্ডগোল আর টেনশনে আমাদের খেলা ছিল বন্ধ। আর টেনশন ভাল লাগছে না। বললাম, আজ খেলা হোক। সিদ্ধান্ত হলো আজ থেকে আমরা আবার টেনিস শুরু করবো।

বিকাল ৫ ঘটিকা। আমি ও কর্নেল খুরশিদ টেনিস খেলছিলাম। এমন সময় হুঁ হুঁ শব্দে হুটার বাজিয়ে কালো লিমোজিন গাড়িতে চড়ে এলেন জেনারেলের ফ্ল্যাগ উড়িয়ে নব নিযুক্ত চীফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ। তিনি টেনিস কোর্টের পাশ দিয়ে বঙ্গভবন থেকে বাসায় ফিরছিলেন। আমরা খেলা বন্ধ করে তার দিকে তাকালাম। গাড়ি থেকে হাসিমুখে হাত নেড়ে আমাদের সম্ভাষণ জানালেন জেনারেল খালেদ মোশাররফ।

আমরাও হাত নেড়ে প্রত্যুত্তর দিলাম। এটাই ছিল তাঁর সাথে আমাদের শেষ দেখা। এরপর কিছুক্ষণ তিনি তাঁর ক্যান্টনমেন্টের বাসায় অবস্থান করে সন্ধ্যায় বেরিয়ে যান। আর ফিরে আসেননি। স্ত্রী সালমা সন্ধ্যারাতে প্রাইভেট গাড়ি নিয়ে দুটি মেয়েসহ খালেদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। ছোট মেয়ে বাপকে ছেড়ে যেতে চাচ্ছিলেন না। খালেদ তাকে কোলে নিয়ে আদর করলেন।

মাগরেবের আজানের সাথে সাথেই তাড়াতাড়ি খেলা শেষ করে আমরা বাসায় ফিরলাম।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। বাতাসে বারুদের গন্ধ। রাস্তাঘাট শান্ত হয়ে এলো। সর্বত্র ঝড়ের পূর্বাভাস। সবাই যেন এক অজানা আশঙ্কায় কান পেতে রইলো। থমথমে পরিবেশ।

চারিদিকে প্রচারপত্রের ছড়াছড়ি। অফিসারদের রক্তচাই। বন্ধ হোক তাদের বাড়াবাড়ি, বন্ধ হোক ক্ষমতার কোন্দল। 'সেপাই সেপাই ভাই ভাই' অন্ধকারের আড়ালে চলে আঘাত হানার গোপন প্রস্তুতি চূড়ান্ত।

সন্ধ্যা ৬টা। ৪৬তম ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার। শাফায়েত জামিল তার দলবল নিয়ে ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টে করছে সলাপরামর্শ। বঙ্গভবন গুঁড়িয়ে দিতে হবে। কাজের কোনো অগ্রগতি হচ্ছে না বঙ্গভবনে। ব্লাডি সিভিলিয়ান স্টাফদের দ্বারা কিচ্ছু হবে না। এদেরকে কাজ শিখিয়ে দিতে হবে। খালেদ মোশাররফও ওখানে গিয়ে সিভিলিয়ান

হয়ে গেছে। এখনো 'মার্শাল ল' ডিক্লেয়ার করতে পারেনি। 'মার্শাল ল' অ্যাডমিনিস্ট্রেটার হিসেবে এখনও তার নাম বা কারো নাম বেতারে ঘোষণা করেনি। এদেশ চলবে কীভাবে?

বঙ্গভবন, রাত দশটা।

সেনাপ্রধান খালেদ মোশাররফ। সারাদিন তিনি ব্যস্ত রইলেন মার্শাল ল'র আইন-কানুন ঘাঁটাঘাঁটি করে। তাকে কেন চীফ মার্শাল ল' অ্যাডমিনিস্ট্রেটর করা হবে না? এই নিয়ে কতো দেন-দরবার! সিভিলিয়ান প্রেসিডেন্ট কীভাবে সি-এম-এল-এ হতে পারে? আর্মি চীফ প্রেসিডেন্টের নিচে থাকবে, অসম্ভব। তিনি জোরালো যুক্তি দেখালেন, তাকে সিএমএলএ করতেই হবে। আইয়ুব খান চীফও ছিল, CMLA-ও ছিল। অন্যরা সবাই বললো, স্যার, সময় গড়িয়ে যাচ্ছে, আপনি এখন ডিসিএমএল-এই হোন। অন্য চীফেরাও তাই চান। কিন্তু খালেদ নারাজ। ক্ষুদ্র নেভী, এয়ারফোর্স চীফরা সেনাপ্রধানের সমকক্ষ থাকবে, এটা কেমন দেখাবে? সে কাগজপত্র ঠিকমতো বানাতে বলে।

মাথা গরম হয়ে ওঠে শাফায়েত জামিলের। কর্নেল মালেককে নিয়ে সে ক্যান্টনমেন্ট থেকে ছুটে যায় বঙ্গভবনে। কাগজপত্র ছুড়ে ফেলে দেয় সে। টেবিলে তার ছড়ি ঠুকতে থাকে। কীসের এত বিলম্ব? রেডিও টিভিতে মাশার্ল ল'র কথা কখন ঘোষণা দেবে? কোথায় চীফ? ফোনে কথা বলে বাসায় অবস্থানরত খালেদ মোশাররফের সাথে, এসব কী শুরু করেছেন স্যার? এসব ছেলেখেলা নাকি? আসল কাজ কিছুই হচ্ছে না। সারাদেশ তাকিয়ে আছে। আপনি এক্ষুণি আসুন। শাফায়েতের কণ্ঠ উত্তপ্ত। রাত তখন সাড়ে দশটা।

বঙ্গভবন। রাত-১১টা।

খালেদের কপালে বুঝি আরাম নেই। ছুটে যান বঙ্গভবনে। সবাই তাঁর অপেক্ষায়। সবাই মিলে তাঁকে বোঝায়; স্যার, খোদার ওয়াস্তে আপনারা তিন প্রধান ডি-সি-এম-এল-এ-ই থাকুন। প্রেসিডেন্টকে CMLA থাকতে দিন। তা না হলে টেকনিকাল সমস্যা হয়ে যাবে।

'ওকে, ওকে, তাই হোক। তোমরা সবাই বেশি বোঝো। ধীরে সুস্থে কাগজপত্র তৈরি করো। ঘোষণা রেডিও টিভিতে আজ নয়, আগামীকাল যাবে।'

হায় আগামীকাল! সেই আগামীকালের সূর্য পূর্বাকাশে উঠেছিল বটে। কিন্তু জেনারেল খালেদ মোশাররফের পক্ষে দেখে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়ে ওঠেনি!

ক্যান্টনমেন্ট। রাত-১১টা।

বঙ্গভবনে যখন খালেদ-শাফায়েত মার্শাল ল'র কাগজপত্র তৈরিতে ব্যস্ত, ঢাকা সেনানিবাসে তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থা। রাতের আবছা অন্ধকারে সচল হয়ে উঠল বিভিন্ন ইউনিট। চঞ্চল টু-ফিল্ড রেজিমেন্ট। তারা সবাই প্রস্তুত। সুবেদার মেজর

আনিসুল হক চৌধুরী। তাকে ঘিরে দাঁড়াল জওয়ানরা। তিনি মেজর মহিউদ্দিন ও মোস্তফাকে অনুরোধ করলেন, স্যার জওয়ানরা তৈরি। আপনি আমাদের সাথে থাকুন। মহিউদ্দিন রাজি।

পাশে ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট। খালেদের প্রিয় ব্যাটালিয়ন। তবু গোপনে তাঁর কমান্ডিং অফিসার কর্নেল আমিনুল হক, অ্যাডজুট্যান্ট ক্যাপ্টেন মুনির কিছু বিশ্বস্ত সৈনিক নিয়ে তৈরি হয়ে রইলেন। ক্যান্টনমেন্টের উত্তর প্রান্তে সার্ভিস কোরের ইউনিট, মেডিকেল, সাপ্লাই ব্যাটালিয়ন, এএমই, অর্ডিন্যান্স ডিপো সবাই একসূত্রে নিজেদের গেঁথে নিলো। উত্তেজিত সৈনিকরা রাত সাড়ে ১১টা থেকেই ব্যারাক ছেড়ে অন্ধকারে প্রকাশ্য রাস্তায় নেমে পড়লো দলে দলে।

কী ঘটতে যাচ্ছে কেউ জানে না। কিন্তু কিছু একটা ঘটবে, এটাই সবাই জানে। উত্তর প্রান্তে সিগন্যালস, ইঞ্জিনিয়ার্স, লাইট এ্যাক-এ্যাক ইউনিটগুলোর জওয়ানরাও প্রস্তুত। আজ সবাই 'ভাই ভাই। চক্রান্তবাজ অফিসারদের আজ আর রক্ষা নাই'।

ক্যান্টনমেন্টের বাইরে প্রস্তুত রয়েছে জাসদের বিপ্লবী বাহিনীর ইউনিফরম পরিহিত সশস্ত্র লোকজন। তারা জমায়েত হয়েছে ইব্রাহিমপুর, এয়ারপোর্ট, মহাখালী, বনানী পয়েন্টে। লেঃ কর্নেল আবু তাহের বীর উত্তর তাদের নেতা। একটি সাদা জিপে করে রাতের অন্ধকারে তাকে ক্যান্টনমেন্টের উত্তম প্রান্তে দক্ষিণ প্রান্তে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেল। তার গণবাহিনীর লোকজন ইতিমধ্যে বিভিন্ন ইউনিটের সৈনিকদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে ফেলেছে। সারাদিন তারা লিফলেট বিলি করে সৈনিকদের উদ্বুদ্ধ করেছে। এখন তারা চূড়ান্ত আঘাত হানতে ক্যান্টনমেন্টের চতুর্পার্শ্বে বাইরে-ভেতরে অবস্থান নিয়েছে। সার্বিকভাবে ফায়ারিং অপারেশন শুরু করার 'চূড়ান্ত ঘণ্টা' টু-ফিল্ড, ইঞ্জিনিয়ারিং, লাইট এ্যাক এ্যাক-এর সুবেদার মেজরগণ এবং কর্নেল তাহেরের বিপ্লবী নেতারা আলোচনা করে আগেই তৈরি করে ফেলেছে।

বড় কোনো প্ল্যান নাই, প্রোগ্রাম নাই, ব্রিফিং নাই, তবু সবাই প্রস্তুত। 'বাস্তিল দুর্গের পতন' ঘটাতেই হবে, এই সবার মরণপণ। টার্গেট একটাই—জিয়াউর রহমানের বাসভবন। লক্ষ্য অভিন্ন। জিয়াকে বন্দিদশা থেকে বের করে আনা।

'H' hour. চরম মুহূর্ত। রাত ১২টা।

এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের জন্য সবাই অধীর অপেক্ষায়। উন্মোচিত হতে যাচ্ছে এক অভাবনীয় ঘটনা। শতাব্দীর ব্যবধানে একটি আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ!

বঙ্গভবন। রাত ১২টা।

ক্যান্টনমেন্টের বাইরে-ভেতরে যখন রাতের অন্ধকারে আঘাত হানার ক্রান্তিলগ্ন ঘড়িতে ঘনিয়ে আসছে। তখন বঙ্গভবনে বসে মিটিং করছেন জেনারেল খালেদ মোশাররফ। তাঁর সাথে শাফায়েত জামিল, কর্নেল মালেক, কর্নেল হুদা, মেজর হায়দার, জিল্লুর রহমান। তখন পর্যন্ত তারা ক্যান্টনমেন্টে তাদের বিরুদ্ধে ধূমায়িত সেনা বিদ্রোহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কী অবাক কাণ্ড? অবিশ্বাস্য ব্যাপার। ক্ষমতার আবর্তে পড়ে তারা সম্পূর্ণ অন্ধকারে নিমগ্ন।

বসে আছেন খালেদ মোশাররফ। টেলিফোন বেজে উঠল। ধরলেন খালেদ। ৪৬ ব্রিগেড থেকে কে যেন ফোন করে জানালো, ক্যান্টনমেন্টে ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়নের সৈনিকরা হাতিয়ার জমা দিচ্ছে না। তারা কারো কথা শুনছে না। তিনি রেগে গিয়ে টেলিফোন তুলে সরাসরি ঐ ব্যাটালিয়নের সুবেদার মেজরের সাথে কথা বলেন। একটু পরেই খালেদ খবর পেলেন সৈনিকরা একটি অস্ত্রাগার ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা করছে। তিনি মেজর হাফিজকে পাঠালেন পরিস্থিতি দেখে আসতে।

এসব শুনে খালেদ একটু ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, মনে হচ্ছে কেউ Counter 'ক্যু' করার চেষ্টা করছে। তাইতো মনে হয়! তখন পাশে উপবিষ্ট কর্নেল মালেক বঙ্গভবন থেকে ক্যান্টনমেন্টে তার বাসায় স্ত্রীর কাছে টেলিফোন করলে সেপাইদের বিদ্রোহের কথা প্রথম জানতে পারেন। স্ত্রী বললেন, সর্বনাশ! এখানেতো সাংঘাতিক ফায়ারিং হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সবাই যে যেদিকে পারে ছুটে পালাতে লাগলো। জেনারেল খালেদ মোশাররফ সহকর্মী কর্নেল হুদা ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর হায়দারকে সঙ্গে নিয়ে তার প্রাইভেট গাড়ি করে ঝটিকা বেগে বঙ্গভবন থেকে বেরিয়ে যান। তিনি প্রথমে কলাবাগানে তার এক আত্মীয়ের বাসায় গিয়ে খাকি ড্রেস পরিবর্তন করে সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। তারপর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বগুড়া থেকে আনা কর্নেল হুদার ব্রিগেডের ১০ম বেঙ্গল রেজিমেন্টে গিয়ে আশ্রয় নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ওটা তখন শেরেবাংলা নগরে অবস্থান করছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় ১০ বেঙ্গল খালেদের 'কে ফোর্সের' অধীনে তাঁর কমান্ডে যুদ্ধ করেছিল। এছাড়া কর্নেল হুদা ছিলেন ঐ ইউনিটের ব্রিগেড কমান্ডার। অতএব স্বভাবতই খালেদ আশা করেছিলেন, তার প্রিয় ইউনিট তাকে নিরাপদ আশ্রয় দেবে।

কর্নেল মালেক তার স্টাফ কার নিয়ে দ্রুতবেগে বঙ্গভবন থেকে গ্রীনরোড ধরে ছুটে পালাতে থাকেন। তিনিও ১০ম বেঙ্গলে আশ্রয় নিতে যান সাভারে। কারণ একদিন আগে পর্যন্ত ওটা সাভারেই অবস্থান করছিল। কিন্তু ৬ তারিখ তা স্থান পরিবর্তন করে শেরেবাংলা নগরে অবস্থান নেয় তা কর্নেল মালেকের জানা ছিল না। এভাবে অলৌকিকভাবে মালেক বেঁচে গেলেন। সাভারে অনেক খোঁজাখুঁজি করে ১০ম বেঙ্গল রেজিমেন্টকে না পেয়ে তিনি তার বাড়ি মানিকগঞ্জে রওয়ানা দেন। গন্তব্যস্থলের তিন মাইল দূরে থাকতেই গাড়ি থেমে পড়লো। উৎকণ্ঠিত মালেক জিজ্ঞাসা করলেন; ড্রাইভার সাব, থামলেন কেন? জোরে চালান। সে বলল, স্যার পেট্রোল নাই। হায় আল্লা! বিপদের ওপর বিপদ। মালেকের পকেটেও টাকা নাই। অগত্যা সামান্য যা কিছু ছিল, ড্রাইভারের হাতে গুঁজে দিয়ে তিনি হেঁটেই চললেন মানিকগঞ্জ। সেখানে গিয়ে আত্মগোপন করে প্রাণ বাঁচান।

কর্নেল শাফায়াত জামিল বঙ্গভবনে কোনো একটি রুমে বিশ্রাম করছিল। বিদ্রোহ সম্বন্ধে সে কিছুই ধারণা করতে পারেনি। রাত দুটোর দিকে একদল সশস্ত্র বিদ্রোহী সেপাহী তাকে তাড়া করলো। বিদ্রোহীদের দ্বারা তাড়িত হয়ে সে বঙ্গভবনের উঁচু দেয়াল টপকাতে গিয়ে পা ভেঙে ফেলে। পরে আহত অবস্থায় পরায়নরত কর্নেল শাফায়াত জামিল মুন্সিগঞ্জে গিয়ে পুলিশের নিকট থানায় আত্মসমর্পণ করে। জনতার

হাতে ধরা পড়লে তার অবস্থাও খালেদের মতো হত। মেজর হাফিজ উদ্দিন ৪৬ ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে ছিলেন। ত্বরিত গতিতে ভিন্ন দিকে পালিয়ে গিয়ে তিনি নিজে প্রাণ বাঁচান। বাকি অফিসাররাও যে যেদিকে পারে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করে।

মুখে বড় বড় কথা বললেও চরম সন্ধিক্ষণে প্রমাণ মিললো, নিজের ব্রিগেডের সৈন্যদের ওপরই কর্নেল শাফায়েত জামিলের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিলো না। সৈনিকদের তাড়া খেয়ে কমান্ডারের পলায়ন! বাকি অফিসারদের বেলায়ও ঘটে একই দশা।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের 'কে' ফোর্সের দুর্ধর্ষ সেনানায়ক খালেদ মোশাররফ। নিয়তির কী পরিহাস! আজ তিনি সৈনিকদের আক্রোশ থেকে আত্মরক্ষার জন্য একস্থান থেকে অন্যস্থানে পলায়ন করছেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। শেষ পর্যন্ত সৈনিকদের হাতেই করুণভাবে নিহত হলেন খালেদ মোশাররফ। অবসান হলো তার ১২০ ঘণ্টার স্বল্পস্থায়ী অভ্যুত্থান। ধূমকেতুর মতো ঘটল তার উত্থান আর পতন।

খালেদের ব্যর্থ অভ্যুত্থান– একটি পর্যালোচনা

মাত্র ৫ দিন স্থায়ী হয়েছিল ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের রক্তপাতহীন ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থান। আর্মির দুজন সিনিয়ার অফিসারের পরিকল্পনায় সংঘটিত হয়েছিল এই অভ্যুত্থান, কিন্তু ব্যর্থ হলো শোচনীয়ভাবে। নিহত হলেন অভ্যুত্থানের নেতা খালেদ মোশাররফ। খালেদ ছিলেন একজন দক্ষ, অভিজ্ঞ অফিসার। কিন্তু নভেম্বর 'ক্যু' সামাল দিতে গিয়ে নিজেই বেসামাল হয়ে পড়েন। এর আগে তিনি কখনো এত অদক্ষতার পরিচয় দেননি।

৩ নভেম্বরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, ওটার প্রস্তুতি হয়েছিল ঘটা করে প্রায় সবাইকে জানিয়েই। কিন্তু এসেছিল অতি নীরবে, নিঃশব্দে, মধ্যরাতে। একটি বুলেটও ফায়ার হয়নি একটি হত্যাকাণ্ডও ঘটেনি। ভোরবেলা সবাই ঘুম থেকে উঠে জানতে পারে, আর্মির ক্ষমতা বদল হয়েছে। জিয়া আর চীফ অব স্টাফ নেই। তিনি বন্দি। খালেদ মোশাররফ নতুন অধিনায়ক।

কেন সংঘটিত হলো এই অভ্যুত্থান?

সাধারণভাবে মনে করা হয় খালেদ-শাফায়েতের 'ক্যু' ছিল মোশতাক-ফারুক-রশিদ চক্রকে উৎখাত করে আবার আওয়ামী লীগ সরকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থান। ধারণাটি মোটেই সত্য নয়।

খালেদ-শাফায়াতের অভ্যুত্থান মুজিব সমর্থক অথবা আওয়ামী লীগ সমর্থক অফিসার বা সৈনিকদের কোনো অভিযান ছিলো না। আসলে ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থান মুজিব-প্রীতির জন্যে অথবা আওয়ামী লীগকে গদিতে বসাবার জন্যেও করা হয়নি। এটা খালেদ-শাফায়াত ৪৬ ব্রিগেডের কিছু অফিসারের সহায়তায় করেছিলেন স্রেফ তাদের নিজেদেরকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার জন্যে। এটা ছিল প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতা

দখলের একটি লড়াই। কোনো মুজিব ভক্তের মুজিব হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের লড়াই নয়। খালেদ কোনোভাবেই আওয়ামী লীগ অথবা মুজিব সমর্থক কোনো রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সাথে কোনো রকম যোগাযোগও করেননি, করলে হয়তো পরিস্থিতি ভিন্ন আকার ধারণ করতো। তখনকার পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ খালেদকে সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছিল। অভ্যুত্থানে খালেদের কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিলো না।

মেজরদের সহায়তায় জিয়ার উত্থান খালেদ-শাফায়াতকে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। 'কাউন্টার ক্যু' করে তারা ক্ষমতায় ফিরে আসার সশস্ত্র প্রচেষ্টা চালান। এটাই ছিল ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থানের প্রকৃত উপাখ্যান। ব্যর্থ হয় খালেদ-শাফায়াতের এ্যাডভেঞ্চার।

কেন ব্যর্থ হলো খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থান?

১। রাজনৈতিকভাবে সময়টা ছিল অভ্যুত্থানের সম্পূর্ণ প্রতিকূলে। বিভিন্ন কারণে ঐ সময় সাধারণ মানুষের মধ্যে ভারত-বিরোধী মনোভাব প্রকট হয়ে ওঠে। খালেদের অভ্যুত্থানকে ভারতপন্থী এবং বাকশালপন্থী মনে করে সবাই ভীত হয়ে পড়ে। সৈনিকদেরও তাই ধারণা হয়। ঐ সময় এরকম অভ্যুত্থানের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার কথা খালেদ মোটেই পর্যালোচনা করে দেখেননি।

২। আর্মি চীফ অব স্টাফ জিয়াউর রহমানকে বন্দি করে ধরে রাখাটা ছিল একটি ভুল সিদ্ধান্ত। এতে বন্দি জিয়ার স্বপক্ষে সেপাই থেকে নিয়ে সকল স্তরের লোকজনের সহানুভূতি জেগে ওঠে, যা খালেদের বিপক্ষে চলে যায়। বন্দি জিয়ার ইমেজ, মুক্ত জিয়া থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে শেষ পর্যন্ত 'Counter' অভ্যুত্থানের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়—জিয়ার মুক্তি। খালেদ মোশাররফ তার ভ্রান্ত স্ট্র্যাটেজির দ্বারা তাঁর অজান্তেই প্রতিপক্ষ জিয়াউর রহমানকে 'হিরো' বানিয়ে দেন।

৩। ৪ তারিখ আওয়ামী লীগের মিছিলে খালেদের মা ও ছোট ভাই নেতৃত্ব দেয়ায় সবার কাছে খালেদের অভ্যুত্থান pro-আওয়ামী লীগ অভ্যুত্থান হিসেবে সেপাই জনতার কাছে চিহ্নিত হয়ে পড়ে। এটা খালেদের সম্পূর্ণ বিপক্ষে চলে যায়।

৪। অধিকাংশ সৈনিক ধার্মিক ও নামাজী। তারা বহুদিন পর আল্লাহু আকবর, বিসমিল্লাহ, জিন্দাবাদ ইত্যাদি শ্লোগান শুনে খুশি হয়ে মোশতাকের পরিবর্তনকে স্বাগত জানায়। কিন্তু তারা খালেদের প্রত্যাবর্তনকে ধর্মের বিপক্ষে মনে করে শঙ্কিত হয়ে ওঠে।

৫। খালেদ-শাফায়েত শুধু বেঙ্গল রেজিমেন্টের ওপর নির্ভর করে অভ্যুত্থান করেন। প্রধানত এটা ছিল ৪৬ ব্রিগেডের বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যু। এতে স্বভাবতই ঢাকা 'লগ এরিয়া' ইউনিটগুলো যথা—সিগন্যাল্স্, সাপ্লাই, মেডিক্যাল, অর্ডিন্যান্স, ইএমই, ইঞ্জিনিয়ার্স, এ্যাক এ্যাক, বেঙ্গল ল্যান্সার (ট্যাংক) টু-ফিল্ড আর্টিলারি এসব ইউনিট ক্ষেপে যায়। তারা একত্রে মিলে পদাতিক ব্রিগেডের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

৬। খালেদের ক্যু'তে মোটেই পাবলিক সাপোর্ট বা জনসমর্থন ছিলো না। এমনকি পূর্ণ সৈনিক সমর্থনও ছিলো না। সৈনিকদের শক্তিকে তিনি কোনো পাত্তাই দেননি।

কেবল দুজন সিনিয়ার ও কিছু তরুণ অফিসারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সেন্টিমেন্টের ওপর ভরসা করে অভ্যুত্থান হয়। তাই এর ভিত্তি ছিল খুবই নাজুক।

৭। জিয়াকে বন্দি করায় সাধারণ সৈনিকবৃন্দ অফিসারদের মধ্যে ক্ষমতার কোন্দলকে অত্যন্ত ঘৃণ্য চোখে দেখে খালেদের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। অফিসারদের ক্ষমতার কোন্দলে সেপাইদের জড়ানো কেউ ভালো চোখে দেখেনি। মূলত সৈনিকদের এই সেন্টিমেন্টকে পুঁজি করেই জাসদের 'খালেদ বিরোধী' প্রোপাগাণ্ডা প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। আর্মির চীফ অব স্টাফকে বন্দি করে তার অধীনস্থ ডেপুটির জোর করে সেনাপ্রধান হওয়াকে সৈনিকদের কাছে মোটেই গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি।

৮। খালেদের 'ক্যু' ছিল নরম ও মানবিক। প্রধান প্রতিপক্ষ নায়ক জিয়াউর রহমানকে জীবিত রেখেই তিনি ক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিলেন। অথচ ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্ব বড়ই রূঢ়। এখানে চরম নির্দয়তাই সাধারণত সফলতার প্রধান চাবিকাঠি। খালেদ-শাফায়েত সে পথে যাননি, ফলে প্রধান নায়ক জিয়াউর রহমান জীবিত থাকায় অতি দ্রুত তাকে কেন্দ্র করে প্রতি-বিপ্লব সংঘটিত হয়।

৯। ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থান ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে তরুণ মেজরদের দ্বারা পরিচালিত একটি অভ্যুত্থান। তাদের দ্বারা সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দি করা অতি সহজ কাজ হলেও পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ সামলানো সহজ ব্যাপার ছিলো না। খালেদ যখন মধ্য পর্যায় থেকে অপারেশন পরিচালনা শুরু করেন, তখন সবকিছু তালগোল পাকিয়ে গেছে। বঙ্গভবনে প্রতিপক্ষ গ্রুপ ততক্ষণে শক্ত 'অপজিশন' নিয়ে ফেলেছে।

১০। খালেদের অপারেশনে 'গোপনীয়তা' বলে কিছুই ছিলো না। সবাই জেনে যায়। এতে জিয়ার পক্ষে আগাম Counter-অ্যাকশন পরিকল্পনা করা সহজ হয়। এছাড়াও তাদের প্ল্যানে কোনো গতি, আক্রমণ, আঘাত হানা, ধ্বংস, ক্যাপচার, কিছুই ছিলো না। এটা নিছক আলোচনা আর আপসরফার অভ্যুত্থানে পরিণত হয়। দেখে শুনে মনে হয়েছে, এটা যেন বাবুদের একটি Telephone Battle. খালেদ আলোচনা ও ডিপ্লোমেসিতে অযথা সময় নষ্ট করেন। তিনি ক্ষমতা দখল ও ক্ষমতা সংহত করতে বহু সময় অপচয় করেন, যা তার ধ্বংস ডেকে আনে। ক্যান্টনমেন্টে যখন বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠছে, তখনো তিনি বঙ্গভবনে তার প্রমোশন ও রাজনৈতিক আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। তার মতো একজন বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ সামরিক অফিসারের এরকম হেঁয়ালিপনা সবাইকে অবাক করে।

১১। রেডিও, টিভি, সবকিছু বন্ধ রেখে তিনি তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে জাতিকে এবং সশস্ত্র বাহিনীকে কিছুই জানতে দেননি। তিনি যে ক্ষমতায় আছেন, এর সামান্য উত্তাপও কেউ টের পায়নি। জনগণ ও সৈনিকদের প্রভাবিত করার কোনো চেষ্টাই তিনি করেননি। এ কয়দিন তিনি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলেন সৈনিক ও জনগণ থেকে। গণ-মিডিয়া বন্ধ থাকায় সর্বত্র সৃষ্টি হয় নানা গুজব ও বিভ্রান্তি, যা খালেদের সম্পূর্ণ বিপক্ষে কাজ করে।

১২। বঙ্গভবনে তিনি যখন বেহুদা আলোচনায় রত, তখনই ক্যান্টনমেন্টে তার বিরুদ্ধে সেনা-বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠতে থাকে। তিনি ছিলেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সম্পূর্ণ

বে-খবর। ফলে কোনো counter ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করতে পারেননি। অসন্তোষকে কেন্দ্র করে সৈনিকরাও যে সংগঠিত হয়ে কমাণ্ডারদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে বিদ্রোহ করতে পারে— এরকম ধ্যান-ধারণা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর মাথায় আসেনি।

১৩। তাঁর কমান্ডে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ট্রুপস এক চতুর্থাংশও তার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলো না। সৈনিকদের শক্তিকে তিনি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করেন। তরুণ অফিসারদের ওপরই তিনি বেশি নির্ভরশীল ছিলেন।

১৪। খালেদ-শাফায়েত সম্পর্ক ভালো থাকলেও উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (aim) অভিন্ন ছিলো না। শাফায়েত জামিলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, মেজরদের বঙ্গভবন থেকে বহিষ্কার এবং 'চেইন অব কমান্ড' প্রতিষ্ঠা। কিন্তু খালেদ মোশাররফের প্রধান লক্ষ্য ছিল, ক্ষমতা দখল এবং জিয়াকে সরিয়ে নিজে চীফ অব স্টাফ হওয়া। দুই প্রধান ক্যু-নেতার লক্ষ্যের অভিন্নতা না থাকায় খালেদ শুরু থেকেই ইচ্ছে থাকলেও সর্বোচ্চ ক্ষমতার আসনে সরাসরি আরোহণ করতে পারেননি। এছাড়া নেপথ্যে জিয়ার সাথে ছিল শাফায়েত জামিলের মধুর সম্পর্ক। প্রাথমিক অবস্থায় সে জিয়াকে 'চীফ' রেখেই পরিবর্তন আনতে চেয়েছিল। এখন ঐ কাজটিই খালেদ মোশাররফকে নিয়ে করতে হচ্ছিল।

১৫। ফারুক-রশিদের দৃঢ় অভিমত, ৩রা নভেম্বরের অভ্যুত্থানের নেপথ্য নায়ক জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশাররফ নয়। অর্থাৎ জিয়া-শাফায়েতের গোপন সমঝোতায়ই ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। জিয়াকে তার বাসায় শাফায়েতের ট্রুপসের তত্ত্বাবধানে 'নিরাপদে' আটকে রাখা হয়। প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতা দখলের ঐ দিনগুলোতে বিভিন্ন গ্রুপ বিভিন্ন মতলবে ভয়ংকর গোপন খেলায় মত্ত ছিলো যা উদ্‌ঘাটন করা বেশ কঠিন ব্যাপার। এসব ভবিষ্যৎ অনুসন্ধিৎসুদের গবেষণার ব্যাপার। পরবর্তীতে ঐ অভ্যুত্থানের বিদ্রোহীদের প্রতি, বিশেষ করে শাফায়েত জামিলের প্রতি জিয়ার সদয় ব্যবহার এই ধারণা বদ্ধমূল করে।

১৬। শাফায়েতের ৪৬-তম পদাতিক ব্রিগেডের শক্তিকে খালেদ Over Estimate করেছিলেন। পদাতিক ব্রিগেডই সর্বেসর্বা। অন্যান্য সার্ভিস কোরের ইউনিটগুলো সব ফালতু, এমনিতরো ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি তাদের শক্তিকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করেন। অথচ পরবর্তীতে দেখা গেল এসব সার্ভিস ইউনিট, ল্যান্সার, আর্টিলারি এদের সম্মিলিত শক্তি তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে এক ঐতিহাসিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়।

১৭। সর্বোপরি এসব এ্যাডভেঞ্চারের ক্ষেত্রে ভাগ্য (Luck) বিরাট ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে ভাগ্যলক্ষ্মী খালেদের সপক্ষে ছিলো না, যার জন্য মুক্তিযুদ্ধের একজন জনপ্রিয় সমরনায়ক হয়েও শেষবেলায় তাঁর ভাগ্যে নেমে এলো ব্যর্থতার গ্লানি। সৈনিকদের হাতেই করুণভাবে মৃত্যুবরণ করতে হলো এই বীর সেনানায়ককে।

৭ নভেম্বর, ১৯৭৫
ঐতিহাসিক সেপাই বিদ্রোহ

৭ নভেম্বর ১৯৭৫ সাল। রাত ১২টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সংঘটিত হলো ঐতিহাসিক সেপাই-বিদ্রোহ। স্থান ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট। প্রচণ্ড গোলাগুলি, চিৎকার আর হট্টগোলের মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হলো শতাব্দীর এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত।

রেড টেপ্ অফিসারদের দাপটে শিহরিত আধুনিক পেশাদার সেনাবাহিনীতে বর্তমান যুগেও যে ভয়াবহ সেপাই বিদ্রোহ ঘটতে পারে, তা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। অথচ তাই ঘটে গেল।

সেপাইদের পদভারে প্রকম্পিত ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট। অফিসাররা ভয়ে কম্পমান। ১৮৫৭ সালের ২৯শে মার্চ ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল এই উপমহাদেশের প্রথম সেপাই বিদ্রোহ। কলকাতার ব্যারাকপুর থেকে শুরু হয়েছিল বিদ্রোহের প্রথম অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, তারপর ছড়িয়ে পড়ে সারা ভারতবর্ষে। দিল্লি, আগ্রা, লখনৌ, মীরাট, কানপুর সর্বত্র। বিদ্রোহী সেপাইরা শেষ মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহকে দিল্লির সিংহাসনে বসাতে চেয়েছিল, কিন্তু ব্যর্থ হয় তাদের অভ্যুত্থান। ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলে প্রাণ বলি দেয় শত শত সৈনিক।

শতাব্দীর ব্যবধানে এই উপমহাদেশে সংঘটিত হলো দ্বিতীয় সেপাই বিদ্রোহ। ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ সাল। ঢাকার সেনানিবাসে পুনরাবৃত্তি হলো ইতিহাসের আর একটি রক্তাক্ত অধ্যায়ের। ১৮৫৭ সালের সেপাই বিদ্রোহে সেপাইরা মোটেই লাভবান হয়নি, বরং ফাঁসির বেদিতে বলি দিতে হয়েছিল বহু প্রাণ। ১৯৭৫ সালের সেপাই বিদ্রোহেও সেপাইরা খুব বেশি একটা লাভবান হয়নি, তবে একচ্ছত্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। ঐতিহাসিক বিপ্লবের মধ্য দিয়েই তাঁর উত্থান।

রাত ১২টা। সুবেদার মেজর আনিসুল হকের ইঙ্গিতে টু-ফিল্ড রেজিমেন্টের লাইন থেকে একটি ট্রেইসার বুলেট আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে অন্ধকার ভেদ করে আকাশে উঠল। এটাই ছিল সংকেত। ক্যান্টনমেন্টের উত্তরপ্রান্তে 38 LAA রেজিমেন্ট প্রচণ্ড শব্দে আকাশে এ্যাক্ এ্যাক্ গান ফায়ার করে তার জবাব দিলো।

ব্যাস আর যায় কোথায়—সারা ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে বাইরে চতুর্দিক থেকে হাজার হাজার বুলেট ছুটে গেল আকাশে। ট্যাঃ ট্যাঃ ট্যাঃ ট্যাঃ ট্যাঃ। ট্যারর। ট্যার-র-র-র-র.......

শুরু হলো উপমহাদেশের দ্বিতীয় সেপাই বিদ্রোহ।

এক মুহূর্তেই অন্ধকারের আবরণে ঘুমিয়ে থাকা ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট সচল হয়ে উঠল। চারিদিকে বুলেট আর বুলেট। ফায়ার আর ফায়ার। আলোয় আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল সারা ক্যান্টনমেন্ট। আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্ত্রীর ধাক্কায় চমকে উঠলাম। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখি অদ্ভুত কাণ্ড। চারিদিকে গুলি আর গুলি। দূরে চতুর্দিকে মানুষের উল্লাস আর চিৎকার ধ্বনি। আলোর ছটায় আকাশ লালে লাল।

আমার বুঝতে বাকি রইল না। এটাই সেই প্রত্যাশিত সেনা-অভ্যুত্থান। যার পদধ্বনি আমরা গত ক'দিন ধরেই শুনতে পাচ্ছিলাম। এটি ছিল তিন মাসের ব্যবধানে ঢাকা সেনানিবাসে তৃতীয় সেনা-অভ্যুত্থান।

চতুর্দিকে অবিরাম গোলাগুলি আর চিৎকার ধ্বনি।

অবস্থা ভালো করে পরখ করার জন্য আমি হামাগুড়ি দিয়ে দোতলার উঁচু ছাদে উঠলাম। লক্ষ করলাম এয়ারপোর্ট, ইব্রাহিমপুর, বনানী ও ক্যান্টনমেন্টের উত্তর প্রান্তে ইঞ্জিনিয়ার্স, সিগন্যাল লাইনের দিক থেকে বহু লোক একসাথে আকাশে বাতাসে গুলি ছুড়তে ছুড়তে আমার বাসা বরাবরই এগিয়ে আসছে। দেখতে দেখতে শত শত মানুষের চিৎকার আর গুলির শব্দ একেবারে আমার বাসার কাছে এসে পৌঁছে গেল। এরি মধ্যে দেখি বড় বড় রাস্তা দিয়ে একটি জিপ মাইক নিয়ে শ্লোগান দিয়ে ছুটে চলছে, "সেপাই সেপাই ভাই ভাই"।

জেনারেল জিয়ার বাসা আমার বাসা থেকে দুশো গজের মধ্যে। ছাদের ওপর থেকে পুরো দৃশ্যই দেখা যাচ্ছিল। দেখলাম উন্মত্ত সৈনিকবৃন্দ তাঁর বাসার দিকে ছুটে যাচ্ছে। জিয়ার বাসার গেইটের কাছেই সবাই জমায়েত হয়ে ক্রমাগত শ্লোগান দিচ্ছে আর গুলি ছুড়ছে। সেপাই বিদ্রোহের চরম মুহূর্ত। ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত।

"সেপাই সেপাই ভাই ভাই।

জেনারেল জিয়া জিন্দাবাদ।"

কিছুক্ষণের মধ্যে দেখলাম একপাল সৈনিক জিয়ার বাসা থেকে একটি জিপ ঠেলে নিয়ে চিৎকার নৃত্য করতে করতে বেরিয়ে আসছে। স্পষ্ট বুঝলাম জেনারেল জিয়াকে বন্দিশালা থেকে বের করে নিয়ে আসা হচ্ছে। তুমুল হট্টগোল। অদ্ভুত উত্তেজনা।

আমি টেলিফোন উঠিয়ে আমার অফিসে ফোন করলাম। ডিউটি ক্লার্ক ফোন ধরলো। ফোনের মধ্যেই ভেসে আসলো অফিসের ভেতর থেকে বহু লোকজনের হট্টগোল। সে প্রায় কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, স্যার, আমাদের গ্যারেজ ভেঙে বিপ্লবী সৈন্যরা আপনার জিপ ও অন্যান্য গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। কী করবো, স্যার? বললাম, ডিউটি অফিসার কোথায়?—

উনি পালিয়ে গেছেন। আমি কী করবো— বলতে বলতে কে একজন ধমক দিয়ে টেলিফোন তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে রেখে দিলো। বুঝলাম বিপ্লবী কারো কাণ্ড।

ক্যান্টনমেন্টের রাস্তায় তখন সৈন্যরা উন্মাদের মতো ছুটছে আর উল্লাসে শ্লোগান দিচ্ছে। এসব অবলোকন করে আমিও দারুণ উত্তেজিত বোধ করলাম। আমি আর ঘরে বসে থাকতে পারলাম না। এরকম এ্যাডভেঞ্চার দেখার সুযোগ জীবনে আর কখনো

আসেনি। আমি সিভিল ড্রেস পরে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। কাছেই আমার অফিসের দিকে হেঁটে হেঁটে রওয়ানা দিলাম। রাস্তায় অভূতপূর্ব দৃশ্য। সেপাইদের অস্ত্রহাতে লাফালাফি আর উল্লাস। জিয়ার বাসা এবং টু-ফিল্ডের মাঝামাঝি রাস্তায় সব ভিড়। আমার বাসা ও অফিস ছিল এ দুটোরই মাঝামাঝি স্থানে। জিয়াকে মুক্ত করে টু-ফিল্ডে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সবাই এখন সেদিকেই ধাওয়া করছে। আমিও সেদিকে সবার সাথে মিশে আবছা অন্ধকারে একা একা হেঁটে চললাম। অদ্ভুত অনুভূতি। বিজয়ের মিছিলে আমিও শামিল।

সেপাইরা শ্লোগান দিচ্ছে, 'সেপাই সেপাই ভাই ভাই—অফিসারের রক্ত চাই।' শেষোক্ত শ্লোগানটা শুনেই আমি চমকে উঠলাম। এটা আবার কী! সঙ্গে সঙ্গে সামনের মোড় ঘুরে বাসার দিকে মুখ ফিরালাম। বাসায় ফিরে এসে গেইটের দরজা বন্ধ করে দিলাম। বাইরে তখনও চিৎকার আর থেমে থেমে গুলি। আমি ভাবছিলাম, এই আনন্দমুখর রাতে এসব কীসের শ্লোগান! একটু পরেই ফোন এলো। হাবিলদার সিদ্দিকুর রহমান বলল, স্যার আপনি কোথাও বেরুবেন না, আমরা এসে টু-ফিল্ডে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।

তার কথা শেষ হতে না হতেই বাইরে গেইটে দরজায় কয়েকজন সেপাই ধাক্কা দিতে লাগল। আমি দোতলার ওপর থেকে তাদের সাথে কথা বললাম। আপনাকে এক্ষুণি টু-ফিল্ডে যেতে হবে। জিয়া সাহেব সব অফিসারকে ডেকেছেন। আমি বললাম, 'আমি আসছি তোমরা যাও।'

আপনি এই কাপড়েই চলে আসুন। জিয়া সাহেব এক্ষুণি ডাকছেন। তাদের উচ্চকণ্ঠ। আমি বললাম তোমরা যাও। আমি ড্রেস পরেই যাচ্ছি। মনে হলো এরা বাইরের বিপ্লবী সেপাই।

গেইট বন্ধ থাকায় তারা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে অন্য বাসার দিকে চলে গেল। রাত ৩-৪০ মিনিটের সময় হাবিলদার সিদ্দিক এলো, সঙ্গে আরো দুজন সেপাই। আমি তাকে সাথে নিয়ে টু-ফিল্ডের দিকে হেঁটেই রওয়ানা দিলাম। ওটা কাছেই, ৩/৪ মিনিটের রাস্তা। আমার জিপটি তখন বিপ্লবী সৈনিকদের দখলে। তারা ওটা নিয়ে অস্ত্র হাতে ক্যান্টনমেন্টের বিভিন্ন দিকে ঘোরাফেরা করছে। মধ্যরাতেই বিদ্রোহী সৈনিকরা সিওডি-তে অবস্থিত প্রধান অস্ত্রাগারটি ভেঙে সকল অস্ত্র লুট করেছে। এখন সবার হাতে হাতে অস্ত্র। রাস্তায় সৈনিকদের দ্রুত আনাগোনা। তারা আজ মুক্তবিহঙ্গ। অস্ত্র কাঁধে নিজের খেয়ালে ঘুরছে ফিরছে। তাদের মধ্য দিয়ে আমি আর সিদ্দিক এগিয়ে চললাম। আজ সেপাইদের কাছে অস্ত্র। অফিসারেরা নিরস্ত্র। তারা এগিয়ে চলেছে বীরদর্পে। মনে হলো সেপাইদের বিজয় মিছিলে আমিই একাকী এক অফিসার।

মুক্ত জিয়া

টু-ফিল্ডে পৌঁছে দেখি সর্বত্র অস্ত্রধারী সৈনিক গিজ গিজ করছে। কর্নেল আমিনুল হক বারান্দায় পায়চারি করছে। বললাম, জিয়া কই। দারুণ খুশিতে সে হাত মিলিয়ে বলল, আসুন স্যার। বলেই একেবারে জিয়ার রুমে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, স্যার স্টেশন

কমান্ডারও এসে গেছেন। জিয়া হাসলো। চির পরিচিত সেই মুচকি হাসি। আমার সাথে জোরে জোরে হাত মিলালো। সে দাঁড়িয়ে আমার সাথে বুক মিলিয়ে কোলাকুলি করল। বলল, হামিদ বসো, কেমন আছ?

তারপর ঘাড় কাত করে একটু নিচু স্বরে বলল, কথাটা মনে আছে? 'এক মাঘে .... ।'

আমি হাসলাম।

টু-ফিল্ডে কমান্ডিং অফিসার মেজর রশিদের চেয়ারে বসে জিয়াউর রহমান। গায়ে তার ঘি রং-এর পাঞ্জাবি, সাদা পায়জামা। সদ্য মুক্ত জিয়া। মুক্তির পর তাকে খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল। যেন রীতিমতো নায়ক।

অবশ্য ৭ নভেম্বরের সেপাই বিপ্লবের প্রকৃত নায়ক জিয়াই বটে। যেন যুগ যুগ ধরে ঐ মুহূর্তটি তারই জন্য অপেক্ষা করছিল। অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। কামরায় অপর্যাপ্ত আলো। বেশ কজন অফিসার তখন তার কাছে বসে। সবাইকে সৈনিকরা বাসায় বাসায় গিয়ে জবরদস্তি ধরে ধরে এনে টু-ফিল্ডে জড়ো করেছে। মুহূর্তটা সুখের হলেও তাদের যেভাবে ধরে আনা হয়েছে, তা মোটেই সুখকর ছিলো না। বসেছিলেন ব্রিগেডিয়ার শওকত। তার শুকনো হাসি। সেপাইরা যখন তাকে ভিআইপি গেস্ট হাউজে আনতে যায়, তখন তিনি প্রাণের ভয়ে ছুটে পালাচ্ছিলেন।

জিয়ার পাশে বসে তখন কর্নেল নূরউদ্দীন, আজহার, বারী, আবদুল্লাহ, কাশেম, হাবিবুর রহমান আরো কজন। কামরার ভেতর অবশ্য সৈনিকদের কেউ ছিলো না। তারা সবাই বাইরে ভিড় করেছিল। কেউ কেউ তখনও ফাঁকা গুলি ছুঁড়ছিল। সবার মুখে হাসি।

বন্দি জিয়াকে যেভাবে উদ্ধার করা হলো

বন্দি জিয়াউর রহমানকে কীভাবে উদ্ধার করা হলো? তাঁকে খালেদ-শাফায়েত তাঁর বাসভবনেই ফার্স্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি প্লাটুন গার্ড দিয়ে আটকে রেখেছিল। রাত বারোটায় সেপাই বিপ্লব শুরু হয়ে যায়। তখন থেকেই বিপ্লবীরা এবং সেপাইরা বিভিন্ন ইউনিট থেকে বেরিয়ে এসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জিয়ার বাসভবনের চারপাশে সমবেত হতে থাকে। সবারই লক্ষ্যস্থল ছিল জিয়ার বাসভবন।

সবাই সেখানে একত্র হয়ে দুর্গ ভেঙে বন্দি জিয়াকে বের করে আনবে, এই ছিল প্রতিজ্ঞা। সারাদিন ধরে চলে গোপন প্রস্তুতি। বাইরে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার নেতারা এসে যোগাযোগ করে যায় বিভিন্ন ইউনিটের সৈনিক, এনসিও, জেসিওদের সাথে। জিয়াকে উদ্ধার করতে বিভিন্ন ইউনিট নিজেদের উদ্যোগেই বিশ্বস্ত লোক নিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গঠন করে।

টু-ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির এরকম একটি দল মেজর মহিউদ্দিন, মোস্তফা ও সুবেদার মেজর আনিসুল হকের নেতৃত্বে প্রস্তুত থাকে। রাত বারোটায় সেপাই বিদ্রোহ শুরু হওয়ার সাথে সাথে এই গ্রুপটিই প্রথম জিয়ার বাসভবনের গেইটে গিয়ে হাজির

হয়। এই একটি মাত্র গ্রুপের অফিসার থাকায় তারা অন্যদের টেক্কা দিয়ে তড়িৎ প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করতে পারে, বাকিরা পৌঁছুবার আগেই। তারা জিয়ার বাসভবনের গার্ডদের বুঝিয়ে বলল, 'সেপাই সেপাই-ভাই ভাই।' এখন থেকে সেপাই বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। আমরা সবাই জিয়াকে মুক্ত করতে এসেছি। তোমরা গেইট খুলে দাও। ততক্ষণে আশেপাশে বেশকিছু সৈনিক শ্লোগান তুলতে শুরু করেছে। বিপ্লবী ভাইদের ডাকে সাধারণ সৈনিকরাও ব্যারাক ছেড়ে ছুটে আসছে রাস্তায়। 'সেপাই সেপাই–ভাই ভাই! জিয়াউর রহমান জিন্দাবাদ।'

মেজর মহিউদ্দিন, সুবেদার মেজর আনিস এবং টু-ফিল্ডের কিছু সৈনিক যখন জিয়ার বাসার গেইটে পৌঁছে যায়, তখন চতুর্দিকে ভীষণ ফায়ারিং চলছে। ফার্স্ট বেঙ্গলের গার্ডরা যারা তাঁকে বন্দি করে রেখেছিল, প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করে ফায়ার করতে করতে পেছন দিকে পালিয়ে গেল। মহিউদ্দিনের লোকজন জিয়ার বাসার ছাদ লক্ষ্য করে কয়েকবার অটোমেটিক ব্রাস ফায়ার করলো। ভেতর থেকে গার্ডরা আর কোনো জবাব দিলো না। তখন তারা রাইফেলের বাঁট দিয়ে গেইট ভেঙ্গে ফেলে ভেতরে ঢোকে। এই সময় জিয়ার ড্রাইভার বেরিয়ে আসে। সে শ্লোগানমুখর সৈনিকদের জিয়ার বাসার পশ্চিম পাশে কিচেন রুমের দিকে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তারা দরজা খোলার জন্য চিৎকার দিতে থাকে। জিয়া এবং বেগম জিয়া তখন পেছনে করিডোরে বেরিয়ে আসেন। এই সময় বাসার চারিদিকে ফায়ারিং চলছিল। বহু সৈনিক চিৎকার দিতে দিতে বাসায় ঢুকে পড়লো। উত্তেজনায় ভরপুর প্রতিটি মুহূর্ত। মহিউদ্দিন বললো :

'স্যার আমরা আপনাকে নিতে এসেছি। আপনি আসুন।'

জিয়া বললেন, 'দেখ, আমি এখন রিটায়ার করেছি। আমি কিছুর মধ্যে নাই। আমি কোথাও যাবো না। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'স্যার আমরা আপনাকে নিতে এসেছি। আমরা নিয়েই যাব। আপনাকে আমরা আবার চীফ বানাতে চাই। দোহাই আল্লাহর আপনি আসুন।' মহিউদ্দিনের দৃঢ় আহ্বান।

বেগম জিয়া পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি এ রকম গোলাগুলি ও গণ্ডগোলের মধ্যে স্বামীকে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। তিনিও বললেন, 'দেখুন ভাই, আমরা রিটায়ার করেছি। আমাদের নিয়ে টানাটানি করবেন না। দয়া করে আমাদের ছেড়ে দিন।'

মহিউদ্দিন বলল, 'স্যার আপনাকে যেতেই হবে। আপনি আসুন।' বলেই মহিউদ্দিন, আনিস ও অন্য সেপাইরা তাঁকে একেবারে চ্যাংদোলা করে কাঁধে উঠিয়ে অপেক্ষমাণ জিপে নিয়ে তুলে ফেলল। চতুর্দিকে শ্লোগান উঠলো,

"আল্লাহু আকবর!
জিয়াউর রহমান জিন্দাবাদ!
সেপাই সেপাই ভাই ভাই!"

বেগম খালেদা জিয়া তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে অতীব উৎকণ্ঠা ও আনন্দের সাথে অপূর্ব দৃশ্য অবলোকন করে এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে রইলেন। ততক্ষণে আরো বহু সৈনিক, বহু বিপ্লবী এদিক সেদিক থেকে ঘটনাস্থলে জড়ো হয়ে গেছে। জিয়াকে মুক্ত দেখে সবার আনন্দের সীমা নেই। চতুর্দিকে মুহুর্মুহু শ্লোগান। 'জিয়াউর রহমান জিন্দাবাদ।'

তারা সবাই মিলে জিপ ঠেলে নিয়ে চলল টু-ফিল্ড লাইনের দিকে। আর্টিলারির সৈনিকরা তাঁকে বিপুলভাবে ঘেরাও করে রেখেছে। তারাই প্রথম তাঁকে বের করে এনেছে। বেঙ্গল রেজিমেন্টকে টপকে যান্ত্রিক ইউনিটরা আবারো একটি গৌরব ছিনিয়ে নিল। অবশ্য গোলন্দাজদের লাইনে জিয়াকে নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই পাশের ইউনিট ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল আমিনুল হক টু-ফিল্ডে এসে হাজির হন। তাকে দেখে জিয়া খুব খুশি হন। ৪র্থ বেঙ্গল খালেদ মোশাররফকে মদদ দিচ্ছিল। এবার কর্নেল আমিন বেশকিছু সৈন্য নিয়ে জিয়ার পাশে এসে দাঁড়ালো। তার এ্যাডজুট্যান্ট ক্যাপ্টেন মুনিরও এলো। বেঙ্গল রেজিমেন্টও পাশে রয়েছে দেখে তিনি আশ্বস্ত হলেন।

আমি পেশাব করব

জিয়া মুক্ত হয়েই সিনিয়ার অফিসারদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে বলেন। জিয়া মহিউদ্দিনকে বললেন, গতকাল ফরমেশন কমান্ডারদের কনফারেন্স হয়েছে। তাঁরা হয়তো এখনো আছে, তাঁদের ডাকো। বোধহয় VIP গেস্ট হাউসে আছে। মহিউদ্দিন তৎক্ষণাৎ তার জিপ নিয়ে ওদিকে ছুটল। গেস্ট হাউসে পৌঁছে তাঁদের খোঁজাখুঁজি করল। কিন্তু কেউ নেই। ডিউটি-সেপাই বলল, তাঁরা সবাই যাঁর যাঁর স্টেশনে চলে গেছেন, শুধু ব্রিগেডিয়ার শওকত আছেন।

'কোথায় তিনি?'

'উনি ঐ পাশে এরশাদ সাহেবের বাসায় গেছেন।'

সঙ্গে সঙ্গে মহিউদ্দিন ঐদিকে ছুটল। ডাকাডাকি করল, কেউ দরজা খুলল না। তারা সেপাই ব্যাটম্যানকে উঠালো, কিন্তু সেও বলল, উনি এখানে নেই। মহিউদ্দিন রেগে গিয়ে বলল, দরজার তালা খুলে ভেতরে গিয়ে দেখবো। তারা পেছন দরজার তালা খুলে এক একটি রুম খুঁজতে থাকে। হঠাৎ করে মহিউদ্দিন একটি স্টোর রুমের ভেতর একটি বাক্সের পেছনে কাঁচুমাঁচু হয়ে লুকিয়ে থাকা অবস্থায় শওকতকে পেয়ে যায়। মহিউদ্দিন বলল, 'আপনি লুকাচ্ছেন কেন? আসুন, জেনারেল জিয়া আপনাদের ডেকেছেন।' শওকত তখন ভীত সন্ত্রস্ত। তিনি বেরিয়ে আসতে চাচ্ছিলেন না। মহিউদ্দিন বলল, 'তাহলে আপনাকে আমি গুলি করতে বাধ্য হবো। আপনি এক্ষুণি চলুন।' অতঃপর ব্রিগেডিয়ার শওকত কম্পিত দেহে তার সাথে জিপে গিয়ে উঠলেন। জিপ ছুটে চললো। একটুখানি এসেই বললেন, আমি 'পেশাব' করবো। একটু থামো ভাই।

মহিউদ্দিন বিগড়ে গিয়ে বলল, 'স্যার, পেশাব-টেশাব ওখানে গিয়েই হবে। ওখানে ভালো পেশাবখানা আছে।' অতঃপর টু-ফিল্ডে জেনারেল জিয়ার কাছে পৌঁছলে ঘাম দিয়ে শওকতের জ্বর ছাড়লো। টু-ফিল্ডের আশেপাশে আকাশে বাতাসে তখন কেবল ফায়ারিং চলছে। সৈনিকদের উত্তাল ঢেউ তখন টু-ফিল্ডের দিকে। এরপর অন্যান্য অফিসারকে যাকে যেখানে পাওয়া গেল সেখান থেকেই ধরে নিয়ে আসা হলো। সৈনিকরা বিভিন্ন দিকে অফিসারদের বাসায় যাচ্ছে আর তাদের ধরে নিয়ে আসছে। এসময় বহু অফিসার সেপাইদের হাতে লাঞ্ছিত হলেন, অথবা অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হলেন। AHQ এম.পি. ইউনিটের একটি রুমে বেশ কজন সিনিয়ার অফিসারকে সাধারণ কাপড়েই ধরে এনে জড়ো করা হয়েছিল। ঐ ড্রেসেই তাদেরকে নিয়ে আসা হলো। মধ্যরাতে জিয়ার মুক্তির আনন্দ এসব কারণে বহুলাংশে ম্লান হয়ে যায়। অফিসাররা বুঝতে পারছিল না, জিয়ার মুক্তির সাথে অফিসারদের হেস্তনেস্ত করার কী সম্পর্ক রয়েছে? মধ্যরাতের পরিস্থিতি তখন কার নিয়ন্ত্রণে, কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। সৈনিকদের বন্দুকের নলের কৃপার ওপরই সুরত হাল অনেকখানি নির্ভর করছিল।

জিয়াকে মধ্যরাতে যেসময় মুক্ত করে আনা হয়, তখন ছিল তাঁর বাসভবনের চতুর্পার্শ্বে তুমুল গণ্ডগোল, চরম বিশৃঙ্খলা। চতুর্দিকে সেপাইদের তাণ্ডব নৃত্য। চিৎকার, অবিরাম ফায়ারিং। বেশ আবছা অন্ধকার। তাঁকে মহিউদ্দিন-আনিসরা বের করে আনলেও ব্রিগেডিয়ার আমিনুল হকের ভাষ্য কিছুটা ভিন্ন। কর্নেল আমিনুল হক (পরে ব্রিগেডিয়ার) যিনি ৭ নভেম্বর রাতে প্রায় সর্বক্ষণ জিয়ার পাশে ছিলেন, বললেন, 'মধ্যরাতে বিপ্লব শুরু হলে আমি আমার এ্যাডজুট্যান্ট মেজর মুনির এবং ৫ জন বিশ্বস্ত সেপাই নিয়ে তাড়াতাড়ি জেঃ জিয়ার বাসার দিকে ছুটে যাই তাকে উদ্ধার করার জন্য। মাঝপথে আমার কয়েকজন সেপাই খবর দিলো যে, জিয়া সাহেব তাঁর বাসার পেছন দিকের দেয়াল টপকে বেরিয়ে পড়েছেন এবং টু-ফিল্ডের কিছু সেপাই ও বিপ্লবী তাঁকে টু-ফিল্ডের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি ছুটে গিয়ে তাঁকে রাস্তায় পেয়ে যাই। তিনি মহাখুশিতে আমার সাথে কোলাকুলি করেন। টু-ফিল্ডের অফিস কাছে থাকায় আমরা তাঁকে সেখানেই নিয়ে যাই। ঐ সময় তার আশেপাশে আমি এবং মুনির ছাড়া আর কোনো অফিসারই ছিলেন না। একটু পর কর্নেল তাহের আসে। সে তাঁকে বাইরে রেডিও স্টেশনে নিয়ে যেতে চায়। আমি স্পষ্টভাবে তাহেরকে জানিয়ে দেই, জেনারেল জিয়া কোনো অবস্থায়ই বাইরে যাবেন না। এতে তাহের আমার ওপর দারুণ ক্ষেপে যায়। পরে তার ভাইকে নিয়ে চলে যায়। এরপর ধীরে ধীরে অন্যান্য অফিসার আসতে থাকেন। জিয়ার নির্দেশে আমি আমার ফোর বেঙ্গল ট্রুপকে সর্বক্ষণ রেডি অবস্থায় রাখি।' বলাবাহুল্য ঐ মুহূর্তে জিয়ার কন্ট্রোল নিয়ে টু-ফিল্ড ও ৪ বেঙ্গলের মধ্যে কিছু রেষারেষি হয়।

এমপি ইউনিটের হাবিলদার বারী বলল, 'সে এবং আর্টিলারির কিছু সৈনিক গিয়ে জিয়াকে কাঁধে তুলে বের করে নিয়ে আসে।' ঐ সময় জিয়ার বাসভবনের চতুর্পার্শ্বে এতই হট্টগোল, গোলাগুলি ও বিশৃঙ্খল অবস্থা ছিল যে, সঠিক কে বা কারা তাঁকে প্রথম

বের করে আনলো তা চিহ্নিত করা মুশকিল হয়ে পড়েছে। তবে টু-ফিল্ডের মহিউদ্দিন-আনিসের ভাষ্য অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। জিয়ার বাসা থেকে আমার বাসার দূরত্ব মাত্র ২০০ গজ। দোতলার ছাদে উঠে আমি সমস্ত দৃশ্যই বহুক্ষণ ধরে অবলোকন করছিলাম। কিন্তু আবছা অন্ধকার থাকায় ভালো দেখা যাচ্ছিল না। তবে একটি জিপ ঠেলে জিয়ার বাসভবনের গেইট থেকে সামনের রাস্তায় নিয়ে আসা হচ্ছে, তা আমি নিজেই প্রত্যক্ষ করছিলাম। সৈনিকদের ভিড়, তাণ্ডব নৃত্যের কারণে কাউকে অবশ্য চেনা যাচ্ছিল না। প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যে সুস্থভাবে কিছু বুঝতেও পারছিলাম না। কয়েকটি গুলি আমার মাথার ওপর দিয়েই শো শো করে চলে গেল। সমগ্র এলাকা জুড়ে তখন তাণ্ডব নৃত্য আর গোলাগুলি।

৬/৭ নভেম্বরের রাত্রে প্রকৃতপক্ষে বিপ্লব শুরু হয়ে যায় রাত সাড়ে ১১টা থেকে। শত শত সৈনিক জড়ো হয় সিগন্যাল রেজিমেন্ট এবং আর্মি হেডকোয়ার্টারের কাছে স্টাফ রোডের আশেপাশে। তারা শ্লোগান দিচ্ছিল, থেমে থেমে ফাঁকা গুলিও ছুড়ছিল। এয়ারপোর্ট, ইব্রাহিমপুর প্রভৃতি এরিয়াতেও আগাম ফায়ারিং শুরু হয়ে যায়। প্রায় ১০/১২ জন অফিসারকে তখনই আশেপাশের বাংলো থেকে ধরে এনে কর্নেল রহমানের বাসায় ড্রেসিং রুমে আটক করে রাখে। তাদেরকে পরে জিয়ার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়।

জিয়া মুক্ত হয়ে টু-ফিল্ডে আসার কিছুক্ষণ পরই কর্নেল তাহের এসে সেখানে উপস্থিত হন। একটু পরে জিয়া জেনারেল খলিল এবং এয়ার মার্শাল তোয়াবকে শীঘ্র নিয়ে আসতে বলেন। তিনি হয়তো এ দুটো বাহিনীর দিক থেকে অশুভ পায়তারা আশঙ্কা করছিলেন। ডিউটি অফিসার ক্যাপ্টেন জব্বারকে জিপ দিয়ে তখনই তোয়াব এবং জেনারেল খলিলকে ডেকে আনতে পাঠান। কিন্তু বিডিআর হেডকোয়ার্টারে তারা সব গেইট বন্ধ করে দিয়ে কাউকে ঢুকতে দিচ্ছিল না। একদল সৈন্যও সেখানে গিয়ে হাজির হয়। উভয় পক্ষে প্রায় গোলাগুলি শুরু হওয়ার উপক্রম হয়। অবশেষে বিডিআর এর কর্নেল মহাবত জান (পরে জেনারেল ও মন্ত্রী) স্বেচ্ছায় তাদের সাথে যেতে রাজি হলে অবস্থা শান্ত হয়। কর্নেল হাবিব ও জব্বার বহু দেন-দরবার করে ভেতরে ঢুকলেও জেনারেল খলিল তৎক্ষণাৎ আসতে রাজি হননি। বহু পরে বেলা প্রায় সাড়ে সাতটার দিকে জব্বার তাকে টু-ফিল্ডে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। প্রায় একই সাথে তোয়াবও এসে হাজির হন। গাড়ি থেকে নামতেই সুবেদার সারওয়ার জেনারেল খলিলের সাথে বেশ অশোভন ব্যবহার করে। আমি কোনোমতে জেনারেল খলিলকে সরিয়ে জিয়ার রুমে নিয়ে গেলাম।

মধ্যরাতে ক্ষমতার লড়াইয়ের চরম মুহূর্ত

৬/৭ নভেম্বরের মধ্যরাতে কর্নেল তাহেরের বিপ্লবী বাহিনী ও ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত বিভিন্ন ইউনিটের সৈনিকবৃন্দের যৌথ অভ্যুত্থানে খালেদ মোশাররফ ক্ষমতাচ্যুত হন এবং জিয়াউর রহমান গৃহবন্দিত্ব থেকে মুক্ত হয়ে পুনরায় চীফ অব স্টাফের গদিতে সমাসীন হন। এটা জাসদের বিপ্লবী গ্রুপের একক এ্যাডভেঞ্চার ছিল না।

এবার শুরু হলো প্রকৃত ক্ষমতার লড়াই। মূল অভ্যুত্থান পরিকল্পনা করেছিলেন কর্নেল তাহের। তার সাথে জিয়াউর রহমানের কী সমঝোতা হয়েছিল, তা শুধু তারা দু'জনই জানেন। জিয়াকে মুক্ত করার কিছুক্ষণ পরই তাহের টু-ফিল্ড রেজিমেন্টে জিয়ার কাছে ছুটে আসেন। তখন রাত প্রায় ২-৩০ মিনিট। ঐ সময় জিয়ার কক্ষে মাত্র গুটিকয় অফিসার : কর্নেল আমিনুল হক, মেজর মহিউদ্দিন, মেজর জুবায়ের সিদ্দিক, মেজর মোস্তফা, মেজর মুনির, সুবেদার মেজর আনিস, আরো কজন অফিসার ও জেসিও।

জিয়া ও তাহের উভয়ে একে অন্যকে গভীরভাবে আলিঙ্গন করলেন। জিয়া বললেন, তাহের তোমাকে ধন্যবাদ। আমাকে বাঁচিয়েছো।

তাহের বলল, আপনার সাথে আমার জরুরি কথা আছে। এদিকে আসুন প্লিজ।

তাহের তাঁকে নিয়ে কক্ষের একটু নিভৃত কোণে গেল। বহুক্ষণ ধরে তাদের মধ্যে গোপন কথাবার্তা চলতে থাকল। অনেক সময় লাগছে দেখে বাথরুমের প্যাসেজে আদালাভাবে দুটি চেয়ার দেয়া হলো। একসময় তাদের মধ্যে বেশ উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় শুরু হলো। এর ফাঁকে জিয়া বারান্দায় এসে সুবেদার মেজর আনিসকে কানে কানে বললেন, আনিস সাহেব, ওকে কোনোভাবে সরিয়ে দিন এখান থেকে। সাবধান, বহু পলিটিকস্ আছে।

তাহের জিয়াকে টু-ফিল্ড থেকে বের করে রেডিও স্টেশনে নিয়ে যেতে চাইছিল। রেডিও স্টেশনে তার লোকজন উপস্থিত ছিল। তাহের বলল, আসুন, জাতি আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

জিয়া যেতে চাইছিলেন না সঙ্গত কারণেই। এতে তাহের খুবই রেগে যায়। উপস্থিত কর্নেল আমিন, মুনির ও সুবেদার মেজর আনিস তারা জিয়ার পাশে থেকে বলেন, রেডিওতে ভাষণ দিতে হলে রেকর্ডিং যন্ত্র এখানে আনা হবে। তাঁকে এখন বাইরে যেতে দেয়া যাবে না। ভেস্তে যায় তাহেরের প্ল্যান।

কর্নেল তাহের সুবেদার মেজর আনিসকে বললো, 'আপনি আমাকে চেনেন?'

আনিস বলল, জ্বি স্যার, আপনাকে চিনি। তবে এখন আমার সাথে আসুন।'

তাহের বুঝে ফেললো, জিয়াউর রহমান কিছুতেই এই মুহূর্তে ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে তার সাথে বাইরে যাবে না। অগত্যা তাহের তার ভাই ইউসুফ এবং অন্যান্যকে সঙ্গে নিয়ে রাগে বিড় বিড় করতে করতে অত্যন্ত বিমর্ষ মুখে টু-ফিল্ড লাইন ত্যাগ করল। সারা ক্যান্টনমেন্ট জুড়ে তখন চলছে সৈনিকদের আনন্দ উল্লাস।

ক্ষমতার সিংহাসনে বসার সন্ধিক্ষণে দুই বাদশাহ। এক সিংহাসন। মধ্যরাতের ক্ষমতার দ্বন্দ্বের নাটক জমে উঠল। কে কাকে উৎখাত করে! এক জঙ্গলে দুই বাঘের তর্জন গর্জন। এই চরম মুহূর্তে দুজনের মধ্যে যে কোন একজন নিহত হতে পারতেন।

জিয়া তখন টু-ফিল্ড কমান্ডিং অফিসারের বড় কামরায় অফিসার পরিবেষ্টিত হয়ে। আসলে তখনও উপস্থিত অফিসাররা কেউ বুঝে উঠতে পারছিলো না, বাইরের অবসরপ্রাপ্ত একজন অফিসার কর্নেল তাহেরকে জিয়া কেন মুক্তির এই আনন্দঘন মুহূর্তে এত গুরুত্ব দিচ্ছেন! তার সাথে বিপ্লবের কিইবা সম্পর্ক? কেন তাহের এত রাগান্বিত,

উত্তেজিত? তার সাথে এতক্ষণ একান্তে কিইবা আলাপ হল? তার সাথে কী জিয়ার কোনো গোপন সমঝোতা রয়েছে? সবার কাছেই ব্যাপারটা বড়ই রহস্যজনক ঠেকলো। কিন্তু মুক্তির আনন্দঘন মুহূর্তে কেউ এসব তলিয়ে দেখার চিন্তা করেনি।

সুবেদার মেজর আনিস বললো, আমাদের উপস্থিত সবাইকে ছেড়ে তাহেরের সাথে জিয়া সাহেবের এত লম্বা গরম গরম আলোচনা দেখে আমার নিজেরই মাথা গুলিয়ে যায়। প্রথমে আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

সাধারণ সৈনিকদের ধারণা ছিল, জিয়াকে মুক্ত করার পরই সেপাই বিদ্রোহ শেষ হয়ে যাবে। তারা ব্যারাকে ফিরে যাবে, কিন্তু বাইরে বিপ্লবী সৈনিক ও বিপ্লবী নেতাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন, অনেক গভীর। টু-ফিল্ডে কর্নেল তাহেরের আগমন এবং জিয়ার সাথে রাত আড়াইটায় উত্তপ্ত কথোপকথনের পরই রহস্য ঘনীভূত হতে শুরু করল। এবার উন্মোচিত হতে শুরু করলো, বিপ্লবী নেতা কর্নেল তাহেরের দ্বিতীয় পর্বের খেলা।

টু-ফিল্ড রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসারের অফিসে বসে আছেন সদ্যমুক্ত জিয়া। তাকে ঘিরে বসে আছেন ঘর থেকে ধরে আনা অফিসারবৃন্দ। অফিসের বাইরে ভেতরে গিজ গিজ করছে ঢাকা সেনানিবাসের হাজার হাজার সৈনিক। ক্যান্টনমেন্টের চতুর্দিক থেকেই বলয় সৃষ্টি করে সৈনিকরা জিয়ার বাসভবনের দিকে গুলি ছুড়তে ছুড়তে ছুটে আসছিল, তা এখন টার্গেট-পয়েন্টে এসে স্তিমিত হয়ে গেছে। সর্বত্র আনন্দ উল্লাস। তারা মাঝে মাঝে ছুড়ছে ফাঁকা গুলি।

সমস্ত প্ল্যান প্রোগ্রামই ছিল সাধারণ সৈনিকদের এবং বিপ্লবী তাহের গ্রুপের। শত শত সৈনিকের পদভারে টু-ফিল্ড রেজিমেন্ট তখন প্রকম্পিত। এদের মধ্যে বহু সৈনিক দেখা গেল এলোমেলো খাকি ড্রেসে। পায়ে ছিল বুটের বদলে সাধারণ জুতা। অনেকের মাথার টুপিও নাই। এরাই ছিল জাসদের বিপ্লবী সংস্থার সশস্ত্র সদস্যবৃন্দ। সেপাই বিদ্রোহের রাতে খাকি উর্দি পরে তারা মিশে গিয়েছিল ক্যান্টনমেন্টের সাধারণ জওয়ানদের সাথে। উপস্থিত শত শত সৈনিকের মধ্যে কে বিপ্লবী সৈনিক, কে আসল সৈনিক বোঝা মুশকিল হয়ে পড়েছিল। তারাই অফিসারদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগান দিচ্ছিল। রাতের বেলা আমিও তাদের দেখে চিনতে পারিনি। সকালবেলায়ও বিপ্লবীদের উপস্থিতি বুঝতে পারিনি। দুপুরবেলা টের পেলাম। সবার অলক্ষে ক্যান্টনমেন্টে বসে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই বন্ধু ক্ষমতার আঙ্গুর ফল নিয়ে করছে কাড়াকাড়ি। জিয়া দ্রুত তার সেনা ইউনিট ও অফিসারদের নিয়ে তাহেরের প্রাথমিক হামলা প্রতিহত করতে সক্ষম হলেন। টু-ফিল্ডে বসেই বেতার ভাষণ দিলেন। টু-ফিল্ডের অফিসেই রেডিও রেকর্ডিং ইউনিট এনে জিয়ার একটি ভাষণ রেকর্ড করা হলো ভোর বেলা প্রচার করার জন্যে।

সংক্ষিপ্ত ভাষণে জিয়া ঘোষণা করেন, তিনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্বভার হাতে নিয়েছেন। দেশের এই পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীর অনুরোধে তিনি

এই কাজ করেছেন। তিনি সবাইকে এই মুহূর্তে শান্ত থেকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বন্ধ হয়ে যাওয়া অফিস, আদালত, বিমান বন্দর, মিল কারখানা পুনরায় চালু করার অনুরোধ জানান। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ আমাদের সহায়।

জিয়ার সংক্ষিপ্ত ভাষণ সবাইকে আশ্বস্ত ও উদ্দীপিত করে তুলল।

মধ্যরাতের লড়াইয়ে হেরে গেলেন তাহের। জয়ী হলেন জিয়া। ক্ষণিকের জন্য তাহেরের পশ্চাৎপসরণ। সকালবেলা নতুন শক্তি সঞ্চয়ের আশায়। সারা রাত চলে তাদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াই। এক চেয়ার নিয়ে টানাটানি।

জাসদের উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা, যদিও কর্নেল তাহেরের লক্ষ্য ছিল অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল। তাহের সৈনিকদের ১২ দফা দাবি প্রণয়ন করে। এগুলোর মধ্যে ছিল : ব্যাটম্যান প্রথার বিলুপ্তি, অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে ব্যবধান দূর, সৈনিকদের মধ্যে থেকে অফিসার নিয়োগ, বেতন বৃদ্ধি, বাসস্থান ব্যবস্থাকরণ, দুর্নীতিবাজ অফিসারদের অপসারণ, রাজবন্দিদের মুক্তি। বিপ্লবী সৈনিকদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল বিপ্লবের মাধ্যমে ১২ দফার বাস্তবায়ন। তাহেরের মতে, জিয়ার সাথে তার আগেই এসব নিয়ে সমঝোতা হয়েছিল। তাহের ভেবেছিল সেই অধিক বুদ্ধিমান। জিয়াকে ব্যবহার করে সে ক্ষমতায় আরোহণ করবে! কিন্তু তার সেই ক্যালকুলেশন ভুল হয়েছিল।

সেপাই-জনতার বিপ্লব

মধ্যরাতে জিয়াউর রহমানকে কিছুটা কমান্ডো স্টাইলে বিনা বাধায় মুক্ত করার পর সকালবেলা বিপ্লবীদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে শত শত সৈনিক তাদের ইউনিটের ট্রাকে চেপে শ্লোগান দিতে দিতে শহরের দিকে ছুটতে থাকে। শহরে পৌঁছে তারা অবাধে আনন্দমুখর জনতার সাথে মিশে গিয়ে উল্লাস করতে থাকে। নতুন শ্লোগান উঠে 'সেপাই জনতা-ভাই ভাই'। অদ্ভুত এ্যাডভেঞ্চার। রাস্তায় রাস্তায় শ্লোগানমুখর জনতা বেরিয়ে আসে সৈনিকদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতে।

দেখতে দেখতে সেপাই বিপ্লব মোড় নেয় ঐতিহাসিক 'সেপাই-জনতার' বিপ্লবে।

শহরের রাস্তায় মানুষের ঢল। 'সেপাই জনতা-ভাই ভাই।'

ভোরবেলা বেঙ্গল ল্যান্সারের ট্যাংকগুলো প্রবল বেগে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে এলো। সারা রাত তারা শান্তভাবে ক্যান্টনমেন্টের উত্তর কোণে বসে বসে ঘটনা পরখ করছিল। বিপ্লবী সুবেদার সারওয়ারের ডাকে ভোর পাঁচটার দিকে তারা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হয়ে শহরের দিকে ধেয়ে যায়। রাস্তায় রাস্তায় ট্যাংক। জনতা প্রবল উল্লাসে ট্যাংকগুলো ঘিরে ধরে সেপাইদের সাথে মিশে গিয়ে নৃত্য করতে থাকে। সেপাই জনতার উল্লাস ব্যাপক উন্মাদনায় রূপ নেয়। সর্বত্র এক অবর্ণনীয় দৃশ্য।

'সেপাই জনতা-ভাই ভাই। সেপাই বিপ্লব জিন্দাবাদ!'

খালেদ আসলেন

সকাল ৭ ঘটিকা। টু-ফিল্ড রেজিমেন্টের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সৈনিকদের ব্যস্ততা, দ্রুত আনাগোনা প্রত্যক্ষ করছিলাম। তারা হেলেদুলে ঘুরছে ফিরছে আপন খেয়ালে। অন্যসময় হলে অফিসারদের পাশ দিয়ে যেতে তাদের স্মার্ট স্যালুট দিয়ে চলতে হতো। আজ এসব বালাই নেই। আজ তাদের রাজ্যে তারাই রাজা।

এমন সময় সৈনিকদের ভিড় ঠেলে একটি আর্মি ট্রাক শোঁ শোঁ বেগে এগিয়ে এলো। ভেতর থেকে নেমে এলো একজন তরুণ লেফটেন্যান্ট। স্যালুট দিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, স্যার জেনারেল জিয়া কোথায়? জরুরি ব্যাপার আছে। বললাম, কী ব্যাপার আমাকেই বল?

সে বলল, স্যার, খুবই জরুরি, উনাকেই বলতে হবে। আমাকে উনার কাছে নিয়ে চলুন প্লিজ! ঐদিন প্রটোকলের কোনো বালাই ছিলো না। বললাম, আসো আমার সাথে।

আমি তাকে নিয়ে জিয়ার কামরায় ঢুকলাম, তাকে বললাম, এই ছেলেটি তোমাকে কিছু বলতে চায়। লেফটেন্যান্ট ততক্ষণাৎ জিয়াকে একটি স্মার্ট স্যালুট দিয়ে বললো, "Sir, I have come to present you dead body of Kahled Musharraf, Col. Huda and Hyder, Sir." জিয়া অবাক! ব্রিগেডিয়ার খালেদের ডেডবডি। আমার দিকে তাকিয়ে জিয়া বললেন, দেখতো হামিদ কী ব্যাপার? আমি অফিসারকে সাথে নিয়ে বাইরে দাঁড়ানো খোলা ট্রাকের পেছনে গিয়ে উঠলাম। সেখানে দেখি ট্রাকের পাটাতনে খড় চাপা দিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে তিনটি মৃতদেহ। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, কর্নেল হুদা ও কর্নেল হায়দার। খালেদের পেটের ভুঁড়ি কিছুটা বেরিয়ে আসছিল। তাঁকে পেটের মধ্যে গুলি করা হয়েছিল, হয়তোবা বেয়নেট চার্জ করা হয়েছিল। কী করুণ মৃত্যু! আমি জিয়াকে কামরায় গিয়ে বললাম, হ্যাঁ, খালেদ, হুদা আর হায়দারের ডেডবডি। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এগুলো এখন কী করা যায়?' আমি বললাম, 'আপাতত এগুলো CMH-এর মর্গে পাঠিয়ে দেই।' জিয়া বললো, 'প্লিজ হামিদ, এক্ষুণি ব্যবস্থা করো।'

হায় খালেদ মোশাররফ! তিনি ৭ নভেম্বর ক্যান্টনমেন্টে ফিরে এলেন বটে। তবে জীবিত নয়, ফিরে এলো তার প্রাণহীন দেহ।

আমি লেফটেন্যান্টকে ডেডবডিগুলো সিএমএইচ-এ নিয়ে যেতে বললাম। আমার জিপ ছিল না। রাত্রে বিপ্লবীরা আমার জিপটি গ্যারেজ থেকে নিয়ে গেছে। তাকেই রেখে আসতে বললাম।

খালেদ যেভাবে মারা গেলেন

রাত ১২ টায় সেপাই বিপ্লবের খবর পেয়ে জেনারেল খালেদ মোশাররফ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রাইভেট কার নিয়ে বঙ্গভবন থেকে দ্রুত বেরিয়ে যান। তিনি নিজেই ড্রাইভ করছিলেন। তার সাথে ছিল কর্নেল হুদা ও হায়দার। দুজনই ঐদিনই ঢাকার বাইরে থেকে এসে খালেদের সাথে যোগ দেন।

খালেদ প্রথমে ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামানের বাসায় যান। সেখানে তার সাথে পরামর্শ করেন। নুরুজ্জামান তাকে ড্রেস পাল্টিয়ে নিতে অনুরোধ করে। সে তার নিজের একটি প্যান্ট ও বুশ সার্ট খালেদকে পরতে দেয়। কপালের ফের! শেষ পর্যন্ত নুরুজ্জামানের ছোট সাইজের সার্ট প্যান্ট পরেই খালেদকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। যাক, সেখান থেকে খালেদ কলাবাগানে তার এক আত্মীয়ের বাসায় যান। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন এবং কয়েক জায়গায় ফোন করেন। ৪র্থ বেঙ্গলে সর্বশেষ ফোন করলে ডিউটি অফিসার লেঃ কামরুল ফোন ধরে। সে তাকে প্রকৃত অবস্থা অবহিত করে। এবার খালেদ বুঝতে পারেন অবস্থা খুবই নাজুক। তিনি অবস্থান পরিবর্তন করে শেরেবাংলা নগরে অবস্থিত ১০ম বেঙ্গল রেজিমেন্টে আশ্রয় গ্রহণ করতে যান। ১০ম বেঙ্গলকে বগুড়া থেকে তিনিই আনিয়েছিলেন তাঁর নিরাপত্তার জন্য। পথে ফাতেমা নার্সিং হোমের কাছে তাঁর গাড়ি খারাপ হয়ে গেলে তিনি কর্নেল হুদা ও হায়দারসহ পায়ে হেঁটেই ১০ম বেঙ্গলে গিয়ে পৌঁছেন।

প্রথমে নিরাপদেই তারা বিশ্বস্ত ইউনিটে আশ্রয় নেয়। তখনো ওখানে বিপ্লবের কোনো খবর হয়নি। কমান্ডিং অফিসার ছিলেন কর্নেল নওয়াজিশ। তাকে দেয়া হয় খালেদের আগমনের খবর। তিনি তৎক্ষণাৎ টেলিফোনে টু-ফিল্ডে সদ্যমুক্ত জেনারেল জিয়াউর রহমানকে তার ইউনিটে খালেদ মোশাররফের উপস্থিতির কথা জানিয়ে দেয়। তখন ভোর প্রায় চারটা। জিয়ার সাথে ফোনে তার কিছু কথা হয়। এরপর তিনি মেজর জলিলকে ফোন দিতে বলেন। জিয়ার সাথে মেজর জলিলের কথা হয়। এদের সাথে কী কথা হয়, সঠিক কিছু বলা মুশকিল। তবে কর্নেল আমিনুল হক বলেছেন, তিনি ঐ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং জিয়াকে বলতে শুনেছেন যেন খালেদকে কিছুতেই প্রাণে মারা না হয়।

যাহোক ভোরবেলা দেখতে দেখতে সেপাই বিদ্রোহের প্রবল ঢেউ ১০ম বেঙ্গলে গিয়ে লাগতে শুরু করে। সেপাইরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি কর্নেল নওয়াজিশের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তারা খালেদ ও তার সহযোগীদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সেপাইরা তাদের টেনে হিঁচড়ে বের করে আনে। ইউনিটের অফিসার মেজর আসাদের বিবৃতি অনুসারে কর্নেল হায়দারকে তার চোখের সামনেই মেস থেকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে এনে প্রকাশ্যে সৈনিকরা গুলি করে হত্যা করে। বাকি দু'জন উপরে ছিলেন, তাদের কীভাবে মারা হয় সে দেখতে পায়নি। তবে জানা যায় হায়দার, খালেদ ও হুদা অফিসার মেসে বসে সকালের নাস্তা করছিলেন। হুদা ভীত হয়ে পড়লেও খালেদ ছিলেন ধীর, স্থির, শান্ত। তিনি হুদাকে সাহস রাখতে বলেন।

জানা গেছে, মেজর জলিল কয়েকজন উত্তেজিত সৈনিক নিয়ে মেসের ভেতর প্রবেশ করে। তার সাথে একজন বিপ্লবী হাবিলদারও ছিল। সে চিৎকার দিয়ে জেনারেল খালেদকে বলল, 'আমরা তোমার বিচার চাই'!

খালেদ শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'ঠিক আছে তোমরা আমার বিচার করো। আমাকে জিয়ার কাছে নিয়ে চলো।'

স্বয়ংক্রিয় রাইফেল বাগিয়ে হাবিলদার চিৎকার করে বললো, আমরা এখানেই তোমার বিচার করবো।'

খালেদ ধীর স্থির। বললেন, 'ঠিক আছে, তোমরা আমার বিচার করো' খালেদ দু'হাত দিয়ে তাঁর মুখ ঢাকলেন।

ট্যা-র-র-র-র! একটি ব্রাস ফায়ার! আগুনের ঝলক বেরিয়ে এলো বন্দুকের নল থেকে। মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানী খালেদ মোশাররফ। সাঙ্গ হলো বিচার। শেষ হলো তার বর্ণাঢ্য জীবন ইতিহাস।

কর্নেল হুদা প্রথম থেকেই ভয়ে কাঁপছিলেন। খালেদ তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। কামরার ভেতরেই ধরা পড়লেন কর্নেল হুদা। গুলিবিদ্ধ হয়ে সেখানেই প্রাণত্যাগ করেন। কর্নেল হায়দার ছুটে বেরিয়ে যান কিন্তু সৈনিকদের হাতে বারান্দায় ধরা পড়েন। উত্তেজিত সৈনিকদের হাতে তিনি নির্দয়ভাবে লাঞ্ছিত হলেন। তাকে সেপাইরা কিল ঘুষি-লাথি মারতে মারতে দোতলা থেকে নিচে নামিয়ে আনে। সেখানে ঐ অবস্থায়ই একজন সৈনিকের গুলিতে তার জীবন প্রদীপ নিভে গেল। মুক্তিযুদ্ধের বীর সৈনিক কর্নেল হায়দার। ঢাকায় পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বহু কমান্ডো আক্রমণের নেতৃত্ব দেন হায়দার। ১৬ই ডিসেম্বর একাত্তরে পল্টন ময়দানে ঐতিহাসিক আত্মসমর্পণ মুহূর্তে অপূর্ব ভঙ্গিতে স্টেনগান কাঁধে হায়দারকে দেখা যায় জেঃ আরোরা ও নিয়াজীর সাথে মঞ্চের দিকে এগিয়ে যেতে।

ঘটনার নায়ক মেজর জলিল এখনো জীবিত। কিন্তু তার সাক্ষাৎকার নেয়া সম্ভব হয়নি।

ঐ মুহূর্তে ঠিক কী ঘটেছিল 'আজকের কাগজ' পত্রিকায় প্রত্যক্ষদর্শী মেজর আসাদুজ্জামান এভাবে বর্ণনা করেছেন, "মেজর জলিল সাহেব উপরে (দোতলায়) ব্রিগেডিয়ার খালেদ, কর্নেল হুদা ও কর্নেল হায়দারের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। এর কিছুক্ষণ পরেই জোয়ানরা লেঃ কর্নেল হায়দারকে কিল, ঘুসি ও চড় মারতে মারতে নিচে নামিয়ে আনতে লাগল। আমি তখন বেশ দূরে একটা জিপের ভেতর ছিলাম। আমি জিপের দরজা খুলে বের হতেই তিনি আমাকে চিৎকার করে ডেকে বললেন, 'আসাদ সেভ মি।' আমি দৌড়ে তার কাছে যেতে চেষ্টা করি। তার কাছে পৌঁছানোর পূর্বেই পাশে দাঁড়ানো এক জোয়ানের গুলিতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। কতগুলো জোয়ান তাকে ঘিরে রাখলো। চারিদিকে তখন গোলাগুলি চলছে। এই পরিস্থিতিতে কে কী করল, তা ছিল খুবই অস্পষ্ট এবং ঘোলাটে। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে কোনো অফিসারকেই সেদিন দেখতে পাইনি বা কাউকে এগিয়ে আসতেও দেখিনি। অন্য দুজন (খালেদ ও হুদা) কীভাবে মারা গেলেন তা স্পষ্ট বুঝতে পারিনি।"

মোটামুটি এই ছিল ৭ নভেম্বর ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের একটি ইউনিটের খণ্ড চিত্র।

কর্নেল শাফায়েত জামিল রাত্র ১টা পর্যন্ত বঙ্গভবনেই ছিল। মুক্তি পাওয়ার পর জেনারেল জিয়া বঙ্গভবনে ফোন করলে শাফায়েতের সাথেই তার কথা হয়। জিয়া

তাকে সবকিছু ভুলে অস্ত্র ফেলে ক্যান্টনমেন্টে ফিরে আসতে অনুরোধ করেন। শাফায়েত বলে, সে সারেন্ডার করবে না। সকালে দেখা হবে।

কী আশ্চর্য! আসলে শাফায়েত ভয়াবহ সেপাই বিদ্রোহ সম্বন্ধে তখনও ছিল সম্পূর্ণ অন্ধকারে। তার ধারণা ছিল, সে ব্রিগেড কমান্ডার। তার অর্ডারে সৈনিকরা এখনো 'এ্যাটেনশন' হবে। অভিজাত প্রফেশনাল আর্মিতে সৈনিকদের দ্বারা অস্ত্রহাতে 'সেপাই বিদ্রোহ' ঘটতে পারে, তা তাদের কারো মাথায়ই আসেনি। কিছুক্ষণ পরই তার ভুল ভাঙল। একদল বিপ্লবী সৈনিক বঙ্গভবন আক্রমণ করলো। তাদের দ্বারা তাড়িত হয়ে শাফায়েত জামিল বঙ্গভবনের উঁচু দেয়াল টপকে পালাতে গিয়ে পা ভেঙে ফেলে। অবশেষে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে মুন্সিগঞ্জে গিয়ে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে। পরে সেখান থেকে সে জিয়ার সাথে টেলিফোনে আলাপ করে। জিয়া তার কুশল জিজ্ঞাসা করেন। তারপর একজন অফিসার (মেজর মুনির) পাঠিয়ে সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করেন। তাকে পরে সিএমএইচ-এ ভর্তি করা হয়। বিপ্লবীদের হাতে ধরা পড়লে তারও খালেদ মোশাররফের দশা হতো। নেহাৎ ভাগ্যগুণেই শাফায়েত প্রাণে বেঁচে যায়।

৭ নভেম্বরের মধ্যরাতের দুই বিপরীত চিত্র : ক্যান্টনমেন্টের বন্দিশালা থেকে জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করে বাইরে আনা হচ্ছে, অন্যদিকে বঙ্গভবন থেকে ক্ষমতাসীন খালেদ-শাফায়েতরা পালিয়ে যাচ্ছে। নিয়তির কী নির্মম খেলা?

টু-ফিল্ড ব্যারাক

সকাল থেকে টু-ফিল্ড রেজিমেন্টের অফিস-ব্যারাকে সারাদেশের দৃষ্টি নিবদ্ধ। এখন থেকে বঙ্গভবন নয়, টু-ফিল্ড ব্যারাকই সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। এখান থেকেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে পুরো দেশের ভাগ্য। জিয়াউর রহমানের অপারেশনাল হেডকোয়ার্টার তখন টু-ফিল্ড ব্যারাক। সবাই ছুটছে টু-ফিল্ড অভিমুখে। এক রাতেই জিয়াউর রহমানের আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা। যেন যুগ যুগ ধরে এ বিপ্লবটিই অপেক্ষা করছিল তার জন্য।

এলেন জেনারেল ওসমানী, জেনারেল খলিল, এয়ার মার্শাল তোয়াব, অ্যাডমিরাল এম এইচ খানসহ অন্যান্য সিনিয়ার অফিসার। সবাই অভিনন্দন জানালেন জিয়াকে। সকাল আনুমানিক সাড়ে ৮টা। দেখলাম একপাল সৈনিক পরিবেষ্টিত হয়ে সিভিল ড্রেসে কে যেন এগিয়ে আসছে। ক্রাচে ভর দিয়ে লেঃ কর্নেল (অবঃ) আবু তাহের। এত লোকজন নিয়ে সরাসরি সে একেবারে জিয়ার কামরায়ই ঢুকে গেল। আমি ভেবেছিলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা তাহের অন্যান্যের মতো এমনিই হয়তো জিয়াকে অভিনন্দন জানাতে এসেছে। আমার ভুল ভাঙল অবশ্য বেশ কিছুক্ষণ পরে। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ওখানেই কনফারেন্স হলো। উপস্থিত ছিলেন জিয়া, ওসমানী, খলিলুর রহমান, তোয়াব, এমএইচখান, মাহবুব আলম চাষী ও কর্নেল তাহের। বিপ্লবী বাহিনীর তাহের শুধু উপস্থিতই ছিলো না, সে তার জোরালো বক্তব্যও রাখে। বাহিনী প্রধানদের কেউ এ

প্রশ্নও রাখলেন না যে, কীভাবে পলিসি নির্ধারণ মিটিং-এ একজন রাজনৈতিক বিপ্লবী বাহিনীর নেতা উপস্থিত থাকলো!

প্রথমেই রাষ্ট্রপতি কে হবেন, এ প্রস্তাবে জেনারেল ওসমানী খন্দকার মোশতাকের নাম উত্থাপন করলে জেনারেল খলিল এবং আবু তাহের বিরোধিতা করেন। সামান্য আলোচনার পর বিচারপতি সায়েমকেই রাষ্ট্রপ্রধান রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই প্রথমবার জেঃ ওসমানীর মত মতের বিরুদ্ধে যাওয়ার ঘটনা ঘটলো।

সিএমএলএ হিসেবে জিয়া থাকতে ইচ্ছে প্রকাশ করেন, কিন্তু তা হয়নি। জেনারেল খলিল রাষ্ট্রপতির হাতেই ক্ষমতাটি থাকার সপক্ষে যুক্তি দেখান। তাহের তা সমর্থন করে। সুতরাং সায়েমই সি-এম-এল-এ থাকলেন। জিয়াকে অন্য দুই বাহিনী প্রধানের সাথে ডি.সি.এম.এল.এ-র পোস্ট নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হলো। এ সিদ্ধান্ত জিয়ার মনঃপুত ছিলো না, কারণ ভোরেই তিনি CMLA হিসেবে রেডিওতে নিজেকে ঘোষণা দিয়েছিলেন।

সিদ্ধান্ত হয়, দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সাধারণ নির্বাচন দেয়া হবে। সভায় এক পর্যায়ে কর্নেল তাহের সৈনিকদের ১২-দফা দাবির কথা উত্থাপন করে, কিন্তু উপস্থিত কেউ ১২-দফা দাবির প্রতি কোনো সমর্থন দেননি। জিয়াও কিছু বলেননি। তাহের জিয়ার নীরবতায় তখনই সন্দেহপ্রবণ হয়ে ওঠে।

সকাল ৭ টার দিকে ল্যান্সারের কিছু সৈনিক 'মোশতাক আহমেদ জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিতে দিতে খন্দকার মোশতাককে নিয়ে রেডিও স্টেশনে উপস্থিত হয়। তাকে দিয়ে কিছু বলাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহেরের বিপ্লবী বাহিনী তখন রেডিও স্টেশন দখল করে আছে। তার নির্দেশে তারা মোশতাককে কিছু বলতে দেয়নি। মোশতাক এমনিতেই কদিন ধরে মিলিটারিদের ঠেলায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আর ঝামেলার মধ্যে পড়তে চাইলেন না। মানে মানে সটকে পড়লেন। অতঃপর রেডিও স্টেশনের দখল নিয়ে আর্মি ও বিপ্লবীদের মধ্যে সকাল থেকে যথেষ্ট ঠেলাঠেলি ও উত্তেজনা চলতে থাকে। পরে টু-ফিল্ডের সৈন্যরা তা কন্ট্রোলে নেয়।

৭ নভেম্বর জিয়ার জন্য ছিল খুবই ব্যস্ত দিন। ১২ টার দিকে জিয়া ক্যান্টনমেন্টের অবস্থা দেখার জন্য জিপ নিয়ে বের হলেন। সর্বত্র ঘুরলেন। সিগন্যালস, অর্ডিন্যান্স, ইঞ্জিনিয়ার্স, লাইট এ্যাক্ এ্যাক্ সব দিকে চক্কর লাগালেন। কোথাও থামলেন, কোথাও হাত নাড়লেন। সর্বত্র 'জিয়াউর রহমান জিন্দাবাদ'। দু-এক জায়গায় সৈনিকরা বিভিন্ন দাবিও পেশ করল। তারা কিছু অফিসারের ফাঁসি দাবি করল। জিয়া বললেন, 'তোমরা অস্ত্র জমা দাও। শান্ত হও। আমি দাবিগুলো দেখছি।'

৭ নভেম্বর ভোর থেকেই সেপাইরা ছিল লাগামহীন। ছোট বড়ো বহু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যায়। বহু অফিসার বিভিন্নভাবে লাঞ্ছিত হন। ২ ফিল্ড হেডকোয়ার্টারে জিয়ার উপস্থিতি সত্ত্বেও বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটে যায়। কর্নেল মান্নাফ (পরে জেনারেল) আক্রান্ত হলেন। মান্নাফ কী-একটা বেফাঁস উক্তি করে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেপাইরা

তাকে ধরে ফেলল। তাকে প্রায় গুলি করে মেরে ফেলার অবস্থায় মেজর মহিউদ্দিন ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে।

মেজর মতিনকে (পরে বিগ্রেডিয়ার) সেপাইরা পাকড়াও করে চরমভাবে হেস্তনেস্ত করে। তাকেও প্রায় গুলি করার মতো অবস্থা থেকে সুবেদার মেজর আনিস উদ্ধার করে। লেঃ কর্নেল বাহারকে কোয়ার্টারগার্ডে আটকে রাখা হয়। সিনিয়র জেসিওরা তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। মেজর নাসেরও লাঞ্ছিত হলেন একই স্থানে।

কর্নেল রব (পরে জেনারেল), কর্নেল মান্নান ও কর্নেল রশিদকে রাস্তা থেকে সেপাইরা ধরে নিয়ে রেডিও স্টেশনে আটকে রাখে। তারা এক ফাঁকে কোনোক্রমে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচান। ২ ফিল্ডে বিদ্রোহী সৈনিকরা তাদের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল আনোয়ারকে (পরে জেনারেল) একটি রুমে আটকে রাখে। এ ক'দিন বিদ্রোহী সৈনিকরা মেজর মহিউদ্দিন ও সুবেদার মেজর আনিসের কথায়ই চলছিল। কর্নেল আনোয়ারকে তারা সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে। ক্যান্টনমেন্টের অন্যান্য স্থানেও বহু অফিসার বিভিন্নভাবে লাঞ্ছিত হন।

সন্ধ্যায় জিয়া রেডিও স্টেশনে যান। সেখানে নতুন রাষ্ট্রপতি ও বিদায়ী রাষ্ট্রপতির ভাষণ ছিল। সেখানে তাহেরও উপস্থিত ছিল। তারা উভয়ে একত্রে বসে ভাষণ শোনেন। উত্তেজিত সৈনিকরা লিখিতভাবে তাদের ১২ দফা দাবির একখানি কাগজ পেশ করে। প্রায় জোর করে কাগজের ওপর তারা জিয়ার সই নেয়। বেশ বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয় জিয়াকে। অবশ্য জিয়া আগেই অবস্থা অনুধাবন করে সারাক্ষণই তার অনুগত সৈনিকদের দ্বারা নিজেকে পরিবেষ্টিত করে রাখেন।

বেলা ১১টায় আমার ড্রাইভার ল্যান্সনায়েক মনোয়ার আমার জিপ নিয়ে ফিরে এলো। সে কোনোমতে বিপ্লবীদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে জিপটি ফিরিয়ে এনেছে। ইতিমধ্যে আমার গাড়ি দিয়ে বিপ্লবীরা পুরো শহর ঘুরেছে। মনোয়ারকে পিঠ চাপড়ে সাবাস দিলাম। জিপটি নিয়ে আমি তখনই অফিসে গেলাম। সেখানে দেখি অফিসের সামনে একজন সিভিলিয়ানকে পাকড়াও করে সৈনিকরা ভিড় করে হেস্তনেস্ত করছে। আমাকে দেখে তাকে আমার কাছে নিয়ে এলো, বলল, স্যার এ ব্যাটা স্পাই। ক্যামেরা নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে ঢুকে বিভিন্ন জায়গার ছবি তুলছে। ভদ্রলোক ভয়ে কাঁপছিলেন, কারণ উন্মত্ত সেপাইরা রাইফেল বাগিয়ে তাকে শেষ করে দিতে চাইছে। তিনি জোড়-হাতে কাতর কণ্ঠে বললেন, স্যার, আমি দৈনিক ইত্তেফাকের ফটোগ্রাফার আফতাব। সেপাই বিপ্লবের ছবি তুলতে ক্যান্টনমেন্টে ঢুকেছিলাম। এখানে উনারা আমাকে ধরে ফেলেছেন। আমাকে বাঁচান স্যার। আমি তাকে সেপাইদের কবল থেকে উদ্ধার করে অভয় দিয়ে আমার অফিসে নিয়ে বসালাম। বেঁচে গিয়ে চেয়ারে বসে হাঁফ ছেড়ে বললেন, স্যার, এক গ্লাস পানি। আমি তাকে বললাম, সাংবাদিক সাহেব, এত রিস্ক নেয়া উচিত হয়নি আপনার। কানে হাত দিয়ে তিনি বললেন, তওবা আর কখনো না।

অফিসে কোনো কাজ নেই দেখে আমি CMH-এ খালেদ মোশাররফকে দেখার জন্য আবার বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলে ক্যামেরাম্যান হাতজোড় করে বললেন, স্যার, আমাকে মেরে ফেলবে। আমি তাকে আমার সাথে জিপে তুলে সিএমএইচ-এ নিয়ে চললাম। বললাম, আসুন ওখানে দু-একটা ছবি নিতে পারবেন। আবার তার কাকুতি মিনতি। স্যার আমার ভীষণ ভয় করছে। আমাকে ক্ষমা করুন।

সিএমএইচ-এ পৌঁছে দেখি সেখানে খালেদ মোশাররফের লাশ একেবারে মর্গের সামনে খোলা মাঠে নির্দয়ভাবে ফেলে রাখা হয়েছে। চতুর্দিক থেকে সৈনিকরা দলে দলে এসে চার দিনের বিপ্লবের নিহত নেতাকে দেখছে, কেউ থু থু দিচ্ছে। আমি আফতাবকে বললাম খালেদের দুটো ফটো নিতে। আশেপাশে রাইফেল কাঁধে সৈনিকদের দেখে আবার দারুণ ভীত হয়ে পড়ল। কারণ কিছুক্ষণ আগে ফটো নিতে গিয়েই তো বেচারা সেপাইদের হাতে ধরা পড়েছিল। যাক আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে অভয় দিলে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে সে মাঠে ফেলে রাখা খালেদের দু-তিনটি ছবি নিলো। আমি CMH-এর কোনো অফিসারকে পেলাম না। সুবেদার সাহেবকে ডেকে বললাম, খালেদ একজন সিনিয়ার অফিসার, তাই তার লাশটা এভাবে অসম্মান না করে মর্গে তুলে রাখার জন্য। তিনি তখনই লাশটা সরাবার ব্যবস্থা করার জন্য ডোম ডাকতে ছুটে গেলেন। হুদা ও হায়দারের লাশ মর্গেই ছিল।

ঢাকা শহরে জনতার উল্লাস

খবর পেলাম, শহরে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, শহীদ মিনার প্রভৃতি এলাকায় সিপাহী-জনতার মিছিল মিটিং চলছে। তাজ্জব ব্যাপার! সি. এম. এইচ. থেকে ফিরে আমি জিপ নিয়ে শহরের এই অদ্ভুত অবস্থা স্বচক্ষে পরখ করতে বেরিয়ে পড়লাম। শহরে শাহবাগ মোড় পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে। হাইকোর্টের সামনে আর যেতে পারলাম না। হাজার হাজার মানুষ জিপ দেখে 'আল্লাহু আকবর' বলে নৃত্য করতে করতে ছুটে আসলো। আমি বিপদ বুঝে ড্রাইভারকে তাড়াতাড়ি জিপ ঘুরাতে বললাম। কিছুটা শান্ত দেখে কাকরাইলের রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলাম সেদিকেও একই অবস্থা। মিলিটারি গাড়ি দেখলেই আনন্দের আতিশয্যে জনতা তা ঘিরে ধরছে আর জিন্দাবাদ ধ্বনি দিচ্ছে। রেসকোর্সের কাছে কয়েকটি ট্যাংকের ওপর বহু সিভিলিয়ান চড়াও হয়ে ফুর্তি করছে দেখলাম। আমি আর গুলিস্তানের দিকে যাওয়ার সাহস পেলাম না। কাকরাইল থেকেই ঘুরে পুনরায় শাহবাগ হয়ে দ্রুতগতিতে ক্যান্টনমেন্টে ফিরে এলাম। রাস্তায় রাস্তায় সর্বত্র জনতার ঢল। আনন্দ উল্লাস!

একটি ব্যাপার লক্ষ করলাম, জনতার বেশিরভাগ ছিল ইসলামপন্থী। তারা ক্রমাগত নারায়ে তকবির আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিচ্ছিল। জাসদের সমর্থক কোনো মিছিল দেখলাম না। মনে হলো, সাধারণ মানুষ জাসদের জড়িত থাকার কথা কিছুই জানে না। সবাই ছুটছে এক অপূর্ব আবেগে, মুক্তির আনন্দে। অভূতপূর্ব দৃশ্য!

শহরের রাস্তার বিভিন্নস্থানে দেখলাম, সৈনিকরা বিভিন্ন ইউনিট থেকে ট্রাক বের করে এনে রাস্তায় সিভিলিয়ানদের সাথে মিশে মিছিল করছে আর শ্লোগান দিচ্ছে, ‘আল্লাহু আকবর। সেপাই জনতা-ভাই ভাই।’

সেপাই-জনতার বিজয় মিছিল। চতুর্দিকে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। সেপাই-জনতার এমন মিলন দৃশ্য ইতিপূর্বে আর কখনো দেখিনি। সেপাই বিদ্রোহের সাথে জনতার একাত্মতা ঘোষণা, এক ঐতিহাসিক ঘটনা বটে। রাস্তায় কোথাও কোনো অফিসারকে দেখলাম না। দিনটি ছিল যথার্থই সেপাইদের দিন। তাদের জন্য এক বিরাট এ্যাডভেঞ্চার। শতাব্দীর এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত।

বিকাল আনুমানিক ৪টার দিকে আবার টু-ফিল্ডে গেলাম জিয়ার কাছে। বারান্দায় উঠতেই দেখি একটি কক্ষে বসে আছে কর্নেল তাহের। মুখ তার কালো, গম্ভীর, ভারি। তিন-চারজন অফিসার কর্নেল মাহতাব, আবদুল্লা, আমিন তার সাথে বসে। আমাকে সালাম দিলো। জিজ্ঞাসা করলাম, কী ব্যাপার তাহের? তুমি এত গম্ভীর কেন? বললো, স্যার, আপনারা কথা দিয়ে কথা রাখবেন না। মন খারাপ হবে না? তার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না। কর্নেল আমিন মুচকি হেসে আমাকে বারান্দায় নিয়ে গেল। বললো, বুঝলেন না স্যার! ব্যাপারটা তো সব তাহেরের লোকজনই ঘটিয়েছে, এখন জিয়াকে মুঠোয় নিয়ে বারগেন করছে। এখনতো সে জিয়াকে মেরে ফেলতে চায়।

এতক্ষণে বুঝলাম ‘ডালমে কুচ কালা হ্যায়’ সৈনিকদের ক্যান্টনমেন্টে অন্য কোনো বিপ্লবী বাহিনীর উপস্থিতির কথা আমার মাথায়ই আসছিল না। এখন বুঝতে পারলাম আশেপাশে এলোমেলো গোচরের উর্দিপরা লোকজন নিয়মিত সৈনিক নয়? বিপ্লবী বাহিনীর লোক। কর্নেল আমিনুল হককে বললাম, তোমার ফোর বেঙ্গল তোমার কন্ট্রোলে আছে তো?’

‘অবশ্যই।’

‘তাহলে তুমি তোমার লোকজন নিয়ে ডিফেন্স পেরিমিটার তৈরি করে সাবধান থাকো। আমার কাছে তো অবস্থা গোলমেলে মনে হচ্ছে।’

‘জানি না স্যার আজ রাতে কী হবে। তাহের উল্টাসিধা কথা বলছে। তবে আমার লোকজন ঠিক আছে’ আমিন বলল।

‘এখানে টু-ফিল্ডের খবর কী?’

‘টু-ফিল্ড তো সুবেদার মেজর কমান্ড করছে। কোনো অফিসার নেই। বিপ্লবীতে ভরে গেছে। দেখছেন না আশেপাশে।’

‘জিয়া ভেতরে আছে?’

‘স্যার আছেন। আপনি গিয়ে একটু বুঝিয়ে বলুন না। রাত্রে গণ্ডগোল হতে পারে।’

‘হ্যাঁ যাচ্ছি।’

আমি ভেতরে তাঁর কক্ষে গিয়ে দেখি জিয়া বসে সৈনিকদের দেয়া দাবি-দাওয়ার কাগজ পড়ছে। বসতে বলল। তার মেজাজ মোটেই ভালো না। বলল, ব্যাটারা কী

পাইছে! যেখানে যাই সেখানেই দাবি। বললাম, দাবি কয়টা? বিগড়ে গিয়ে বলল, একশোটা। ব্যাটাদের আমি ভালো করে দাবি মিটিয়ে দেবো। আমি বললাম, মনে হচ্ছে আজ রাতে কিছু গণ্ডগোল হতে পারে। তোমার টু-ফিল্ডে থাকা উচিত হবে না। বিপদ কিছুটা সে আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিল। আমার কথা শুনে তার মুখ আরো শুকনো হয়ে গেলো। শুধু বলল, Keep Watch. আমিনকেও বলো চোখ-কান খোলা রাখতে। আরও বলল, তুমি যাও না। টু-ফিল্ডের সুবেদার মেজর আনিসকে তো চেনো। ওনার সাথেও একটু আলাপ করো।

আমি বাইরে এসে আনিসকে খুঁজতে লাগলাম। টু-ফিল্ডের লোকজন বলল, উনি কোথায় যেন জরুরি মিটিং করছেন। এখন তাকে পাওয়া মুশকিল হবে।

আমার কাছে অবস্থা বড়ই ঘোলাটে মনে হলো।

টু-ফিল্ডের আশেপাশে বিভিন্ন রকমের সৈনিক এখানে-ওখানে জটলা করছিল। তারা কে কোন পক্ষের বোঝা মুশকিল হয়ে পড়ল। কর্নেল তাহেরের কথা এবং মুড থেকে আমি স্পষ্ট বুঝলাম, তাহের এবং জিয়ার মধ্যে বড় রকমের মতবিরোধ হয়ে গেছে। তাহেরের ভাষায়, জিয়া বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে দুজনই এখন উন্মুক্ত ময়দানে পরস্পরের মুখোমুখি। রক্তক্ষয়ী সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠল। আমি সুবেদার মেজর আনিসকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পেলাম না। বারান্দায় কর্নেল আমিনকে পায়চারী করতে দেখলাম। তার কপালে চিন্তার রেখা। আমাকে দেখেই বলল, কী স্যার, চীফের সাথে কী কথা হলো? কিছু বললেন নাতো।

'অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। তিনি তোমাকে চোখ-কান খোলা রাখতে বলেছেন। খুব সাবধানে থাকো। তোমার ফোর বেঙ্গল ঠিক রাখো। সুবেদার মেজর আনিসকে দেখেছো? জিয়া কেন জানি না ওর সাথে আমাকে কথা বলতে বলল।'

'ওনাকে এখন পাবেন না। আমিও তাকে খুঁজছি। তাদের টু-ফিল্ডে এখন মিটিং চলছে। বিপ্লবীরা শুনছি আজ রাত্রে অফিসারদের ওপর হামলা চালাবে। আপনি চলে যান স্যার। আমি ইনশাআল্লাহ সব সামলে নেবো।'

অবস্থা আমার কাছে মোটেই সুবিধার মনে হলো না। ঐ সময় টু-ফিল্ডে অফিসার দু-চারজন ছাড়া বিশেষ কাউকে দেখলাম না।

আশেপাশে সৈনিকরা ঘোরাফেরা করছে। জটলা করে কি যেন ফিশফিশ্ করে আলোচনা করছে। তাদের হাবভাব অন্যরকম। কিছুক্ষণ পর আমি ধীরে ধীরে স্থান ত্যাগ করলাম। রাস্তায় দেখি বেশকিছু অফিসার গাড়ি করে, রিকশা করে, ফ্যামিলি নিয়ে ক্যান্টনমেন্টের বাইরে চলে যাচ্ছেন। এমনিতে রাস্তাঘাটে লোকজন নেই। ছম্‌ছম্ অবস্থা। পথে আমার অফিসের সামনে একজনকে দেখলাম। তিনি কর্নেল (পরবর্তীতে মন্ত্রী ও জেনারেল) মাহমুদুল হাসান। তার চোখেমুখে শংকা। ছুটে এসে বললো, স্যার প্লিজ বলুন কী হচ্ছে? অফিসাররা পালাচ্ছে কেন? আমি তাকে বললাম, ব্রাদার, তুমি এক্ষুণি বাসায় ছুটে যাও। পারলে ফ্যামিলি নিয়ে বেরিয়ে যাও। অবস্থা ভালো নয়। কী হচ্ছে, আমিও জানি না। সে উদভ্রান্তের মতো তখনই বাসার দিকে ছুটে চলল।

সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে এক অজানা আতঙ্ক সারা ক্যান্টনমেন্টে ছড়িয়ে পড়ল। রাস্তাঘাট সন্ধ্যার আগেই একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। প্রকৃতপক্ষে ঐ মুহূর্তে ক্যান্টনমেন্টে 'চেইন অব কমান্ড' আর 'ডিসিপ্লিন' বলতে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। বিপ্লবীদের প্রোপাগাণ্ডা, হাজার হাজার বিপ্লবী লিফলেট ইত্যাদির প্রভাবে ইতিমধ্যে সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে যথেষ্ট পরিবর্তন এসে গেছে লক্ষ করলাম। তারা অফিসারদের প্রতি অবজ্ঞাভরে তাকাচ্ছিল। ৪র্থ বেঙ্গল এবং টু-ফিল্ড রেজিমেন্টের কিছু অফিসার, জেসিও এবং সৈনিক জেনারেল জিয়াকে আগলে রেখেছিল। বাদবাকিদের মতিগতি যেন কেমন হয়ে গেল।

৭ নভেম্বর ক্যান্টনমেন্টে সকালবেলা যে পরিবেশ বিদ্যমান ছিল, বিকেলে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন আকার ধারণ করল। অফিসাররা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লো। তারা ধীরে ধীরে সরে পড়তে লাগল। মনে হলো যেকোনো মুহূর্তে তাহেরের জিয়া-উৎখাত প্ল্যান শুরু হয়ে যেতে পারে। দুপুরে সৈনিকরা তিনজন অফিসারের ওপর চালালো।

বাসায় ফিরে দেখি আমার স্ত্রী দারুণ উদ্বিগ্ন। মালপত্র কিছু বেঁধে তৈরি হয়ে বসে আছে। সে বলল, অনেক অফিসার টেলিফোন করেছেন, তারা ফ্যামিলি নিয়ে শহরে চলে যাচ্ছেন। আমরাও আপার বাসায় শহরে চলে যাবো। আমি বললাম, আমি স্টেশন কমান্ডার। সেপাইদের ভয়ে স্টেশন কমান্ডার স্টেশন ছেড়ে পালাতে পারে না। তবে তুমি বাচ্চাদের নিয়ে শহরে চলে যেতে পারো। আমি গাড়ি ডেকে আনি। কিছুক্ষণ চিন্তা করে সে আমাকে ছেড়ে শহরে যেতে রাজি হলো না। বলল, ঠিক আছে, মরলে সবাই একসাথেই মরি।

আমার পুরানো আর্দালি সেপাই সমুজ আলী পাশেই দাঁড়িয়েছিল। সে বলল, ঠিক আছে স্যার, আমি দুটো রাইফেল নিয়ে আপনাদের গার্ড দিমু। চিন্তা করবেন না। বললাম, দুটো রাইফেল কোত্থেকে পেলে?

বললো, 'আরে স্যার, এখনতো ক্যান্টনমেন্টে কেবল অস্ত্র আর অস্ত্র। সি.ও.ডি অস্ত্রাগার ভেঙ্গে সব হাতিয়ার লুট হয়ে গেছে। এখন সব সেপাইর হাতে একটা দুটো ফালতু রাইফেল। আমিও দুটো নিছি। এখন গিয়ে নিয়ে আসি।'

এমন সময়ে নিচে কারা যেন কড়া নাড়লো। সমুজ আলী ছুটে গেল। ভেতরে এসে ঢুকলো সুবেদার কাজী ও হাবিলদার সিদ্দিক।

'সর্বনাশ হয়েছে, স্যার। এক্ষুণি তৈরি হয়ে যান। ফ্যামিলি নিয়ে বাইরে চলে যান। আর দেরি নয় স্যার, চলুন বাইরে। আপনার জিপ নিয়ে এসেছি।'

'কেন কী হয়েছে?'

'স্যার কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না। টু-ফিল্ড লাইনে বিপ্লবীদের মিটিং হয়েছে। জিয়া সাব দাবি-দাওয়া মানেন নাই। আজ রাত্রে সব অফিসারদের মেরে ফেলা হবে। সবাই পাগল হয়ে গেছে। স্যার, চান্স নিয়েন না, এক্ষুণি চলুন।'

'না, না, আমি স্টেশন কমান্ডার। আমি স্টেশন ছেড়ে পালাতে পারি না। তোমরা চাইলে মারতে পারো।'

'দোহাই আল্লার, স্যার, আপনি চলে যান। সব অফিসার চলে যাচ্ছে।'

'না আমি যাবো না। ফ্যামিলিও যাবে না।'

আমার দৃঢ়তা দেখে তারা আর বেশি চাপাচাপি করলো না। তারা নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ আলোচনা করে বলল, সমুজ আলী তুমি থাক, আমরা আবার আসছি। আমার জিপ নিয়ে তারা লাইনে চলে গেল। ২০ মিনিট পর তারা ৪জন সেপাই নিয়ে এবং ৬টি অটোমেটিক চাইনিজ রাইফেল নিয়ে আমার বাসায় ফিরে আসলো। বললো, স্যার আমরা মিটিং করে আপনার সেফটির জন্য চারজন ভলান্টিয়ার সেপাই নিয়ে আসলাম। তারা বাসার ভেতরে থেকে আপনাকে গার্ড দেবে। আমার ব্যাটম্যান সমুজ আলী বলল, আমার রাইফেল দুটা আছে। কুছ পরওয়া নাই। দেখি কোন্ ব্যাটা আসে।

সূর্য ডুবি ডুবি করছে। আকাশে একটি কাকপক্ষীও উড়ছে না। পাখিদের কলকলানিও যেন বন্ধ হয়ে গেছে। চারিদিকে পিন পতন নিস্তব্ধতা।

৭/৮ নভেম্বর। রক্তাক্ত রাত

সন্ধ্যা নেমে এলো। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরই বেঙ্গল ল্যান্সারের ট্যাংকের ঘড়ঘড় শব্দ শোনা গেল বড় রাস্তায়। টেলিফোনে খবর নিয়ে জানলাম, বেঙ্গল ল্যান্সারের সৈনিকরা ট্যাংক নিয়ে ৭র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের লাইনে পৌঁছে মেজর নাসের ও মেজর গাফফারকে তাদের হাতে তুলে দেবার জন্য জোর চাপ প্রয়োগ করছে। খালেদ মোশাররফের ক্যুর সাথে এ দুজন অফিসার জড়িত ছিলেন। তারা ৪র্থ বেঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিল। বেঙ্গল রেজিমেন্টের কর্নেল আমিন, মেজর মুনীর অফিসারদেরকে তাদের হাতে তুলে দিতে অস্বীকৃতি জানালো। কিছুক্ষণ জোর কথা কাটাকাটির পর ট্যাংকাররা ফিরে গেল। অফিসারদ্বয় বেঁচে গেলেন।

রাতের আঁধার ঘনিয়ে এলো। চারিদিকে অজানা আতঙ্কের ছায়া। মাঝে মধ্যে গুলির শব্দ। রাত আনুমানিক ১২টা। গভীর অন্ধকার। আমার নিচতলায় থাকতেন সিগন্যাল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল সামস। হঠাৎ গেইটে তুমুল চিৎকার, হট্টগোল। গেইট ঠেলে ভেঙ্গে ১০/১২ জন সেপাই ঢুকে পড়ল চত্বরে। তারা নিচতলায় কর্নেল সামসের বাসা আক্রমণ করে বসল। অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে তাকে দরজা খুলতে বলে চিৎকার দিতে লাগল। কিন্তু কেউ দরজা খুললো না। সেপাইরা ক্রমাগত লাথি মেরে মেইন দরজা ভেঙে ফেলে ঘরে ঢুকে পড়ল। ততক্ষণে সামসরা সবাই পেছন দরজা দিয়ে পালিয়ে গেছেন। ঘরে কাউকে না পেয়ে প্রবল আক্রোশে তারা খালি ঘরে গুলি চালাতে লাগল। দুটো গুলি উপরের তলায় একেবারে আমার পায়ের তলায় এসে লাগল। ভাবলাম সামস শেষ। কিন্তু তিনি পালিয়ে বেঁচে গেলেন। ভয়ে আমার বাচ্চারা কাঁদতে লাগল।

স্টেশন হেড-কোয়ার্টারের সামনে একদল সৈনিক, মাঝখানে কর্ণেল হামিদ। সামনে বাম থেকে তৃতীয় হাবিলদার সিদ্দিক।

৭ নভেম্বর সৈনিকদের হাতে বহুজন বহুভাবে লাঞ্ছিত হন। চোখ বাঁধা অবস্থায় জনৈক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় ফটোগ্রাফারের ক্যামেরায় এই দৃশ্যটি ধরা পড়ে। ছবি : আফতাব আহমেদ

৭ নভেম্বর ১৯৭৫ সাল সেপাই-জনতার উল্লাস। সেপাইজনতা ভাই ভাই।
ছবি: আফতাব আহমেদ

ঢাকার রাজপথে সেপাইদের ট্রাক মিছিল। জনতার স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাস।
ছবি : আফতাব আহমেদ

টু-ফিল্ড রেজিমেন্ট পরিদর্শনে জেনারেল জিয়া। তার পাশে লেঃ কঃ মহিউদ্দিন আর্টিলারী ও সুবেদার মেজর আনিস চৌধুরী।

বিগ্রেডিয়ার আমিনুল হক

লেঃ জেঃ শওকত আলী

মেঃ জেঃ এম এ মঞ্জুর

নিচতলায় কর্নেল সামসকে না পেয়ে সেপাইরা এবার সিঁড়ি বেয়ে আমার বাসার দিকে ধাওয়া করল। তারা উপর তলায় উঠে আসল। বারান্দায় আমার ব্যাটম্যান সেপাই সমুজ আলী ও অন্য চারজন সেপাই প্রবলভাবে তাদের বাধা দিতে লাগল। কিন্তু তারা ছিল সংখ্যায় বেশি। তাদের ঠেলে এবার তারা একেবারে আমার বেডরুমের দরজায় পৌঁছে হাঁকা-হাঁকি করে দরজা খুলতে বললো। আমার ব্যাটম্যান সমুজ আলী অসম সাহসে বিপ্লবীদের বলতে লাগল, দেখুন ভাই সাহেবরা, আমাদের সাহেবকে কিচ্ছু করলে কিন্তু আমরা আপনাদেরকে ছাড়বো না। আমি দেখলাম দরজা না খুললে বিপ্লবীরা দরজা ভেঙেই ভেতরে ঢুকে পড়বে। অতএব, আমি দরজা খুলে বেরুতে গেলাম। আমার স্ত্রী আমাকে থামিয়ে বললো দাঁড়াও আমি যাবো, বলেই সে দরজা খুলে একেবারে আক্রমণকারীদের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।

লেডিজ দেখে বিপ্লবীরা প্রথমে থতমত খেয়ে গেলো। পর মুহূর্তে সামলে নিয়ে বললো, আপনি সরুন। আমরা আপনাকে চাই না, অফিসারকে চাই। রক্তপাগল সৈনিকরা আমার স্ত্রীকে গুলি করতে পারে ভেবে আমি নিজেই তাড়াতাড়ি দরজার পেছন থেকে বেরিয়ে এলাম। বললাম, আমি কর্নেল হামিদ। তোমরা কী চাও? একজন বিপ্লবী গুলি করার জন্য রাইফেল তুলতেই সমুজ আলী ও অনুগত সেপাইরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে জাপটে ধরলো। সমুজ আলী বলল, খবরদার বলছি, ভালো হবে না। তারা বিপ্লবীকে প্রবলভাবে ঠেলে পেছনে নিয়ে গেল। ঐ ব্যাটাই ছিল লীডার। মনে হলো এরা ভিনগ্রহের বিপ্লবী সেপাই। বাকিদের দু-তিন জনকে সামসের সিগন্যাল ইউনিটের মনে হলো। আমার সেপাইদের দৃঢ়তা দেখে তারা পিছপা হলো। রাগে গরগর করতে করতে তারা ফিরে চলল। একজন বলল, দাবি না মানলে আমরা কোনো অফিসারকে জিন্দা রাখবো না। যাহোক, আমরা কোনোক্রমে এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেলাম। সারারাত আমরা ঘরের আলো নিভিয়ে জেগেই রইলাম। আমার সেপাইরাও জেগে রইলো।

৭/৮ নভেম্বরের ঐ বিভীষিকাময় রাত্রে গভীর অন্ধকারে উন্মাদ সৈনিকরা অফিসারদের রক্তের নেশায় পাগল হয়ে উঠল। ঘটে গেল বেশ কয়েকটি হত্যাকাণ্ড। বহু বাসায় হামলা হল। অনেকে বাসায় ছিলেন না। অনেকে পালিয়ে বাঁচলো। সৈনিকরা মেজর করিম, মিসেস মুজিব, মিসেস ওসমানকে গুলি করে হত্যা করল, মেজর আজিম ও মুজিব চট্টগ্রামে যাচ্ছিলেন। বিপ্লবী সৈনিকরা তাদের এয়ারপোর্টে পাকড়াও করে। আজিমকে গুলি করে হত্যা করে। মেজর মুজিব প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়। অর্ডিন্যান্স অফিসার মেসে সৈনিকরা হামলা করে তিনজন তরুণ অফিসারকে গুলি করে হত্যা করে। এদের মধ্যে ছিলেন মেজর মহিউদ্দিন যিনি শেখ সাহেবের লাশ টুঙ্গিপাড়ায় নিয়ে দাফন করেন। সৈনিকরা বনানীতে কর্নেল ওসমানের বাসায় আক্রমণ করে। ওসমান পালিয়ে যান, তারা মিসেস ওসমানকে গুলি করে হত্যা করে। হকি খেলতে এসেছিল দু'জন তরুণ লেফটেন্যান্ট। তাদের স্টেডিয়ামের পাশে গুলি করে হত্যা করা হয়। অর্ডিন্যান্স স্টেটে দশজন অফিসারকে এক লাইনে দাঁড় করানো হয় মারার জন্য। প্রথমজন এক তরুণ ই.এম.ই. ক্যাপ্টেন। তার পেটে গুলি করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। বাকিরা অনুনয় বিনয় করলে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়। বেঁচে গেল তারা অপ্রত্যাশিতভাবে। একজন টেলিভিশনের

অফিসার মুনিরুজ্জামান। বঙ্গভবনে খালেদের সময় খুবই এ্যাকটিভ ছিলেন। তাকে ধরে গুলি করা হয়। তিনদিন পর তার লাশ পাওয়া যায় মতিঝিল কলোনীর ডোবায়।

সেনাবাহিনী মেডিক্যাল কোরের ডাইরেক্টর কর্নেল (পরে ব্রিগেডিয়ার) খুরশিদ। বিপ্লবীরা তার বাসা আক্রমণ করে কয়েক ঝাঁক গুলিবর্ষণ করে। তিনি পালিয়ে যান। কিন্তু পরে আবার সেপাইদের হাতে ধরা পড়েন। বিপ্লবীরা তার দুই হাত বেঁধে যখন গুলি করতে উদ্যত, ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি অলৌকিকভাবে বেঁচে যান। হঠাৎ আশুরিক শক্তিতে বনবাদাড় ভেঙ্গে তিনি দেন ছুট। তারা পিছনে গুলি ছুড়লেও আর তাকে ধরতে পারেনি। রাস্তার ওপরে অর্ডিন্যান্স স্টেটের অবস্থা ছিল ভয়াবহ। উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকরা দল বেঁধে প্রায় প্রতিটি অফিসার্স কোয়ার্টারে হামলা চালায়। ভীত সন্ত্রস্ত অফিসাররা বাসা ছেড়ে অন্ধকারে পেছনের পানির ডোবায়, ঝোঁপে-জঙ্গলে আত্মগোপন করে সারারাত কাটায়। এই সময় COD-এর কমান্ডিং অফিসার কর্নেল বারী সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। হত্যাকাণ্ডের সময় তিনি জিপে চড়ে ভেতরে যাচ্ছিলেন। গোলাগুলির খবর শুনে তার বিশ্বস্ত ড্রাইভার গেইট থেকেই সজোরে মোড় ঘুরিয়ে তাকে নিয়ে পালিয়ে যায়। COD'র ভেতরে ঢুকলেই নিশ্চিত তিনি বিদ্রোহী সৈনিকদের হাতে মারা পড়তেন।

১২ জন অফিসার মারা পড়েন ঐ রাতে। আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যান বেশ ক'জন অফিসার। নিহত ক'জন অফিসার হলেন— মেজর আনোয়ার আজিম, মেজর মহিউদ্দিন, ক্যাপ্টেন খালেক, ক্যাপ্টেন আনোয়ার, লেঃ সিকান্দার, লেঃ মুস্তাফিজ, বেগম ওসমান ও অন্যান্য। সারারাত ভয়ানক আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে কাটলো। মাঝে মধ্যে থেমে থেমে গুলির আওয়াজ। বিপ্লবী সৈনিকরা সত্যি সত্যিই অফিসারদের রক্ত নেশায় পাগল হয়ে উঠলো। ভাগ্যিস অধিকাংশ অফিসার ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে সন্ধ্যার আগেই শহরে তাদের নাগালের বাইরে চলে যান। সেপাইগণ কর্তৃক আপন অফিসারদের ওপর হামলা কস্মিনকালেও ঘটেনি এর আগে! বস্তুত এসব অবিশ্বাস্য ঘটনা!

৮ নভেম্বর

ভোর হতে না হতেই সারা ক্যান্টনমেন্টে অফিসারদের মধ্যে গভীর আতঙ্কের ছায়া। আপন সেপাইদের কাছ থেকে অফিসাররা ছুটে পালাতে লাগল। কোনো ইউনিটে, হেডকোয়ার্টারে, অফিসে অফিসার নাই। সবাই ছুটে পালাচ্ছে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে। যে যেদিকে পারছে ছুটে যাচ্ছে আশ্রয়ের খোঁজে। প্রস্থানের পথে বহু অফিসার স্টেশন হেডকোয়ার্টারে এসে ভিড় করলেন। বিপ্লবের আকস্মিকতায় সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। বেশিরভাগ অফিসার নিজের জন্য নয়, বরং তাদের পরিবারের নিরাপত্তার চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লেন। ঐদিন সকাল ৮টার সময়ও কয়েকজন অফিসারের ওপর গুলিবর্ষণ করা হলো। বহু অফিসারকে সৈনিকরা নাম ধরে খুঁজতে লাগল। অরাজকতার মধ্যে কে কাকে ধরছে, মারছে, লাঞ্ছিত করছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছিলো না।

নিরাপত্তার অভাবে অফিসাররা সেনানিবাস ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। ভয়াবহ অবস্থা। আমি জিয়াকে বহু চেষ্টা করেও কোথাও পেলাম না। ফোনেও পেলাম না। আমি

তাদের বললাম, আগে প্রাণ বাঁচান। তারপর খবর নিন। কেউ কেউ শহরে আত্মীয়-স্বজন না থাকায় অখ্যাত হোটেলে উঠে আত্মগোপন করলেন। অনেকে স্টেশন হেডকোয়ার্টারে ফোন নাম্বার দিয়ে গেলেন পরিবেশ স্বাভাবিক হলেই তাদের খবর দিয়ে আনার জন্য।

মহান সেপাই বিপ্লব ৮ নভেম্বর সম্পূর্ণ ভিন্ন আকার ধারণ করলো। অফিসার দেখলেই সেপাইরা তাড়া করছে। সেপাইরা বাধ্য করলো তাদের কাঁধের র‍্যাংক নামিয়ে ফেলতে। কেউ র‍্যাংক পরতে পারবে না। আমি যথারীতি অফিসে গেলাম। আমার ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে আসে আমাকে নিতে। অফিসে আমার সুবেদার সাহেব বললেন, স্যার, আপনাকে আমরা সবাই শ্রদ্ধা করি, কিন্তু দয়া করে অফিসের বাইরে গেলে কাঁধে আপনার কর্নেলের র‍্যাংকটা নামিয়ে যাবেন। চতুর্দিকে মহাবিপদ। সব অফিসার তাই করছে। অফিসে আমি র‍্যাংক পরেই থাকলাম কিন্তু জিপ নিয়ে বেরুবার সময় র‍্যাংক নামিয়ে বেরুলাম। আমি জিয়াকে খুঁজছিলাম। সে পাগলের মতো এখানে ওখানে ঘুরছিল। চতুর্দিকে গণ্ডগোল থামাতে ক্যান্টনমেন্টের সবখানে ছুটে গিয়ে সেপাইদের এসব কাণ্ড বন্ধ করতে বললো। তারা বিভিন্ন দাবি পেশ করল। জিয়া বলল, আগে তোমরা অস্ত্র জমা দাও। আমি সব দাবি মানবো।

কর্নেল তাহেরের ইঙ্গিতে বিপ্লবী সৈনিকরা এখন একেবারে উল্টে গেছে। বিপ্লবীরা জিয়াকেও হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে। জিয়া সৈনিকদের ১২ দফা দাবি মানতে অস্বীকার করছে। সৈনিকদের কাছে প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। যে ১২ দফা দাবির ভিত্তিতে কর্নেল তাহের ও তার বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা সশস্ত্র বিপ্লব ঘটিয়ে জিয়াকে মুক্ত করেছে, সেই দাবিগুলো মানতে প্রতিশ্রুতি দিয়ে জিয়া এখন পিছিয়ে গেছে। এখন তারা জিয়াকে হত্যা করবে। সব অফিসার হত্যা করবে– বিপ্লবীদের আস্ফালন।

সৈনিকদের বিপ্লব এবার নতুন মোড় নিল।

শহীদ মিনার ও বিশ্বাসঘাতক জিয়া। তাকে উৎখাত চাই। অফিসারদের রক্ত চাই! রক্ত চাই।

বেলা ১০টার দিকে সৈনিকদের একটা বড় মিটিং হলো ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের গ্রাউন্ডে। সুবেদার কাজী জানালো, জিয়া সাহেবকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তিনি আসবেন। তবে আমাকে ওদিকে যেতে মানা করলো। সে একদল সৈনিক নিয়ে ওদিকে চলে গেল। সৈনিকদের ঐ উন্মুক্ত সভায় বেশ কজন বিপ্লবী সৈনিক বিপ্লবী ভাষণ দেয়। বহু দাবির কথা বলা হয়। ঐ মিটিং-এ প্রায় সবাই ছিল সশস্ত্র। আনাড়িদের হাতেও ছিল স্বয়ংক্রিয় রাইফেল। সভাতেই একজনের স্বয়ংক্রিয় রাইফেল থেকে আপনা-আপনি গুলি বেরিয়ে গেল। দুজন সৈনিক ঘটনাস্থলেই নিহত এবং কয়েকজন আহত হলো। জিয়া বললেন, আপনারাই দেখুন, ডিসিপ্লিন না থাকলে কী অবস্থা হয়। জিয়া স্পষ্ট ভাষায় সৈনিকদের বললেন, আপনারা হাতিয়ার জমা দিন। শৃঙ্খলার মধ্যে আসুন। ব্যারাকে তাড়াতাড়ি ফিরে যান। অযথা রক্তপাত করবেন না। আপনারা ক্যান্টনমেন্টে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনুন।

আসলে ঐ সময় সৈনিকরা খুবই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল। অফিসারদের তারা ক্যান্টনমেন্টের যেখানেই পেয়েছে তার র‍্যাংক খুলে ফেলেছে। ধরে অপমান করেছে। মিটিং-এ একজন বিপ্লবী সৈনিক সম্বোধন করলো, জনাব জিয়াউর রহমান ....। সঙ্গে সঙ্গে জিয়া তাকে সংশোধন করলেন, আমি 'জনাব জিয়া নই, আমি জেনারেল জিয়া। সৈনিক নেতা থতমত খেয়ে গেলো। অতঃপর সামলে নিয়ে আবার বলতে শুরু করলো।

সৈনিক সমাবেশে জিয়ার আকুল আহ্বান তারা আমল দিলো না। হিংসাত্মক পরিবেশের কোনো উন্নতি হলো না। বরং জাসদ তাদের ১২ দফা দাবি না মানা পর্যন্ত অস্ত্র জমা না দেয়ার জন্য সৈনিকদের নির্দেশ দিলো। বহু লিফলেট বিতরণ করা হলো। ওগুলোতে জিয়া এবং অফিসার শ্রেণিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করা হলো।

৮ নভেম্বর ঢাকা সেনানিবাসে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃশ্য। অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে বিশ্বস্ততা নষ্ট হয়ে গেছে। সৈনিকদের সামনেই অফিসাররা ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে পরিবার পরিজন নিয়ে পালাতে লাগল। সৈনিকরা কৌতুকভাবে দেখতে লাগল। অবশ্য বহু ইউনিটের বিশ্বস্ত সৈনিক নিজেরাই তাদের অফিসারদেরকে ছাউনির বাইরে পার করে দিয়ে আসে। সৈনিকদের ভয়ে অফিসারদের ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে পলায়ন—এ রকম ঘটনা কোনোদিন কোথাও ঘটেছে বলে মনে হয় না। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। এসব পরিস্থিতি আজ কল্পনাও করা যায় না।

সকাল থেকে জিয়া চতুর্দিকে ঘুরছে! সৈনিকদের সাথে সরাসরি কথা বলছে। তবু তারা সেনাপ্রধানের কথায়ও কান দিচ্ছে না। কমান্ড কন্ট্রোল ও শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছে।

আমি এক সময় অনুমান বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে জিয়াকে আর্মি হেডকোয়ার্টারে গিয়ে ধরতে পারলাম। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, জিয়া মলিন মুখে তার চেয়ারে বসে শূন্যে তাকিয়ে আছে। তাকে স্টেশনের এইসব অবস্থা অবহিত করলাম। বললাম, অফিসাররা সবাই ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। কোনো সিকিউরিটি নাই। জিয়া বলল, হামিদ, আমি সব দেখেছি। সকাল থেকে ঘুরছি। আমার করবার কিছুই নেই। আমি ওদের বুঝাচ্ছি। কিন্তু কেউ বুঝতে চায় না। তারা পাগল হয়ে গেছে। বলো কী করি? তুমি তো পুরানো অফিসার, স্টেশন কমান্ডার। তুমিও একটু বুঝাও না। তবে সেইফ থেকে ঘোরাঘুরি করো। ফ্যামিলি পারলে বাইরে পাঠিয়ে দাও। তার সাথে কথা বলে বুঝলাম ঐ মুহূর্তে সেও অসহায়। তাকে এত অসহায়, এত বিধ্বস্ত অবস্থায় আমি আর কোনোদিন দেখিনি। সৈনিকরা যেখানে অফিসারের নির্দেশ মানা দূরের কথা, তাদের রক্ত চাচ্ছে, সেখানে সে কিইবা করতে পারে?

৭ তারিখ সকালবেলা যে ছিল বিজয়ী বীর, জনপ্রিয় সম্রাট; ৮ তারিখ সকালবেলা তাকে মনে হলো সমস্যা জর্জরিত পরাজিত মুকুটহীন এক সম্রাট! দু-চারটি কথার পর আমি চলে আসছিলাম; জিয়া বলল, অফিসারদের ডাকো। আমি তাদের সাথে আগামীকাল নয়টায় হেডকোয়ার্টারে কথা বলবো। রণক্লান্ত জিয়া। ভাবলাম রেস্ট করুক। আমি বেরিয়ে এলাম। আমি DMO নূরউদ্দীনকে গিয়ে জিয়ার অভিপ্রায় জানালাম।

প্রায় সব অফিসারই ক্যান্টনমেন্ট ত্যাগ করে শহরে চলে গিয়েছিলেন। যারা স্টেশন হেডকোয়ার্টারে ফোন করলেন তাদের বললাম অন্য সবাইকে জানাতে যে, আগামীকাল নয়টায় আর্মি হেডকোয়ার্টারে আসতে। খবর পেলাম শহরেও বেশ কয়টি বাড়িতে সৈনিকরা হামলা করেছে অফিসারদের খুঁজতে গিয়ে। এসব ছিল কোনো কোনো অফিসারের বিরুদ্ধে কিছু জওয়ানের ব্যক্তিগত আক্রোশের জের। ঢাকা সেনানিবাস সেপাই বিদ্রোহের দিনগুলোতে একটি হিংস্র জঙ্গলের রূপ নেয়। জিয়া সিনিয়ার জে-সি-ও-দের মাধ্যমে ক্রমাগত আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, সেপাইরা যাতে অফিসারদের রক্তপাত না করে তার জন্য সর্বত্র আকুল আবেদন জানাতে লাগলেন।

একা সে কী করবে? জিয়ার আর্মি হেডকোয়ার্টারেও অফিসাররা নেই। প্রাণ ভয়ে সবাই পালিয়েছে। গুটি চার অফিসার আর্মি হেডকোয়ার্টারে জিয়ার পাশে। এর মধ্যে একমাত্র কর্নেল (পরে লেঃ জেনারেল) নূরউদ্দীনকেই নিয়মিত টেবিলে কার্যরত দেখতে পেলাম। আর সবাই পালিয়েছে। রাত্রেও জিয়ার সাথে বিভিন্ন সৈনিক গ্রুপের নেতৃবৃন্দের সাথে ঘন ঘন মিটিং হচ্ছিলো। বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে কথা হচ্ছিলো। একই সাথে জাসদ পার্টির কিছু লোকজনও বাসায় গিয়ে তার সাথে আলাদাভাবে আলোচনা করছিলো।

জিয়াই এককভাবে আলোচনা ও কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে জিয়া ছাড়া আর কারো সাথে কোনো কথা বলে লাভও ছিলো না। কারণ একমাত্র জিয়াই জানতেন ওদের সাথে তার কী সমঝোতা হয়েছিল। জাসদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মতে তাদের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা জিয়ার মুক্তির জন্য নভেম্বরের সশস্ত্র অভ্যুত্থানে জড়িত হয়, তাহেরের সাথে জিয়ার একটা গোপন ১২ দফাভিত্তিক পূর্ব সমঝোতার ভিত্তিতে। ১২ দফার দাবিগুলোর বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী একটি শ্রেণিহীন বাহিনীতে পরিণত হতো। তাদের প্রস্তাবিত 'বিপ্লবী কাউন্সিল' গঠিত হলে সেখানে জিয়ার ক্ষমতাও বহুলাংশে খর্বিত হয়ে পড়তো। মুক্তি পাওয়ার পর জিয়া এসব বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করেই তাদের দাবি মানতে অস্বীকার করেন।

৮ নভেম্বর সারাদিন অফিসাররা পালাতে লাগল। এমনকি তরুণ ব্যাচেলার অফিসাররাও ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে চলে গেছে। ফ্যামিলিওয়ালাতো সবাই তাদের পরিবার সরিয়ে নিলো। খোদ জিয়ার শ্যালক লেঃ সাইদ ইস্কান্দারকেও ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে পালিয়ে যেতে হলো। গতরাত্রে বিপ্লবীরা ব্রিগেড অফিসার মেস আক্রমণ করলে সাঈদসহ তরুণ অফিসাররা কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পেছন দিকে পালিয়ে যায়। আমার স্ত্রীও বলল শহরে তার বোনের বাসায় চলে যেতে, কিন্তু আমি আবার বললাম, স্টেশন কমান্ডারকে যদি সেপাইদের ভয়ে ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে পলাতে হয়, তাহলে আমার আর্মি ছেড়ে দেয়াই উচিত। অন্যদের কথা স্বতন্ত্র।

আমার সুবেদার কাজী ও বিশ্বস্ত হাবিলদার সিদ্দিকও বলল, সব অফিসার রাতে ফ্যামিলিসহ চলে গিয়েছেন, আপনি অন্তত ফ্যামিলি শহরে পাঠিয়ে দেন। আমি রাজি হলাম না। বললাম, মারলে তোমরাইতো মারবে। তারা লজ্জায় মুখ ঢেকে বললো, স্যার আমাদের লাশের ওপর দিয়ে আপনাদের মারতে পারবে। হাবিলদার সিদ্দিক

বললো, স্যার একটু আগে আপনার স্টাফ অফিসার মেজর আলাউদ্দিনকে ক্যান্টনমেন্ট পার করে দিয়ে এলাম বোরখা পরিয়ে।

'বোরখা পরিয়ে?'

'জ্বি স্যার, আমাদের জিপে আমার পাশে বসিয়ে মহিলাদের বোরখা পরিয়ে তাকে পার করলাম। কী করবো স্যার!'

সে বলল, আরো অনেক বোরখাধারী অফিসারকে এভাবে রাস্তায় দেখা গেছে। তাদের সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতেই কিছুক্ষণের মধ্যে হঠাৎ দেখি রিকশা চড়ে দু'জন লেডিজ আসছেন। একজন শাড়ি পরা, অন্যজন বোরখাধারী। আমার কৌতূহল হলো। রিকশা থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এদিকে কোথায় যাচ্ছেন? হিমশিম খেয়ে বোরখাধারী মোটা মহিলা বোরখা ফাঁক করে তার চেহারাখানা দেখালেন। বললেন, আসসালামালেকুম স্যার! বোরখার ভেতর থেকে কর্কশ পুরুষ কণ্ঠ! সিদ্দিকের কথাই ঠিক। শাড়িপরা মহিলা আসল, বোরখাধারী নকল। বোরখাধারী অফিসারকে আমি চিনে ফেললাম। সেপাইদের দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে যাওয়ার সব রকম উপায়ই তখন অফিসাররা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাকে বললাম, Cheer up. এগিয়ে যাও। বাম দিকে গেলে ভালো হবে। একজন গোয়েন্দা সিনিয়ার অফিসার মেয়েদের শাড়ি পরে বনানীর দিকে পালানোর সময় সেপাইদের হাতে ধরা পড়েন। তার অবস্থা দেখে সেপাইরা হেসে কুটিকুটি।

৮ নভেম্বর অবশ্য অফিসারদের ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে থাকার মতো কোনো পরিবেশ ছিলো না। বিপ্লবী সৈনিকদের প্ররোচনায় সাধারণ সৈনিকরাও ঐদিন ভিন্ন মূর্তি ধারণ করেছিল। এসব অবস্থা স্বচক্ষে না দেখলে কারো পক্ষে এখন বিশ্বাস করা কঠিন। বহু বছর পর আজ যখন ঘটনাগুলোর স্মৃতিচারণ করি, তখন মনে হয়, এরকম ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আমার ইউনিফরমের মর্যাদার জন্য ক্যান্টনমেন্টে ফ্যামিলি নিয়ে অবস্থান করে এত রিস্ক নেয়া মোটেই উচিত হয়নি।

দুপুর ১২টা। আর্মি হেডকোয়ার্টারে জেনারেল জিয়ার অফিস কক্ষ থেকে বের হয়ে আমি কর্নেল নূরউদ্দীনের সাথে অপারেশন রুমে বসেছিলাম। এমন সময় নারায়ণগঞ্জ থেকে একটি টেলিফোন কল এলো। প্রথম নূরউদ্দীন কথা বলল, তারপর আমি। আওয়াজ স্পষ্ট। থানা থেকে পুলিশ অফিসার বলছে, একজন আর্মি অফিসারকে কে বা কারা হত্যা করে রাস্তার ডাস্টবিনের কাছে ফেলে রেখে গেছে। ফোনের অপর প্রান্ত থেকে পুলিশ অফিসার বললেন, মৃত অফিসারের পরিচয় থেকে তার নাম কর্নেল মালেক বলে জানা গেছে। আহারে মালেক! কর্নেল মালেক আমার বন্ধু মানুষ। তার নাম শুনে আমি খুবই মুষড়ে পড়লাম। সেখান থেকে আমরা তৎক্ষণাৎ একটি গাড়ি পাঠালাম মালেকের লাশ উদ্ধার করে নিয়ে আসার জন্যে। বিকেলে লাশ নিয়ে উদ্ধার পার্টি ফিরে আসলে দেখা গেল লাশটি কর্নেল মালেকের নয়, মেজর নূরুল আজিমের। দুজন দেখতে প্রায় এক রকমের বিধায় এই বিভ্রাট হলো। বেচারা আজিম। বিপ্লবী সৈনিকরা তাকে এয়ারপোর্টে চিনতে পেরে ধরে নিয়ে গুলি করে। তার ছয়টি ছোট বাচ্চা-কাচ্চা এতিম হয়ে গেলো। তার সাথে আর একজন অফিসার মেজর মুজিব

বিপ্লবীদের কবলে পড়ে নেহাৎ বুদ্ধিবলে কোনোক্রমে মুক্ত হয়ে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়। এসব ঘটনা শুনে অফিসাররা দারুণ আতঙ্কিত হয়ে পড়ল।

৯ নভেম্বর

সকাল নয়টা। শহর থেকে এবং আশপাশ থেকে জনা ত্রিশেক অফিসার আর্মি হেডকোয়ার্টার-এ সমবেত হয়েছিলেন। তারা প্রায় সবাই সিভিল ড্রেসে। যে কজন ইউনিফরম পরে ছিলেন তারা র‍্যাংক পরেননি। র‍্যাংক দেখলেই সেপাইরা ধরে টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছে। অদ্ভুত অবস্থা। সবারই মুখে চোখে ভীতির ছায়া। সেপাইদের আক্রমণে অফিসারদের মৃত্যুসংবাদ, লুটপাট, বিচ্ছিন্ন আক্রমণ সবাইকে আতঙ্কগ্রস্ত করে রেখেছিল। জিয়া এলেন। সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। নিচু স্বরে বললেন, আপনারা সরে পড়েছেন। ঠিক আছে। এই সময় ফ্যামিলি দূরে রাখাই ভালো, আমি চেষ্টা করছি ওদের বোঝাবার। ইনশাল্লাহ্ শীঘ্র সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনারা ধৈর্য ধরুন। সেপাইরা কিছু উত্তেজিত আছে। But you must face them ....

ক্ষুদ্র ভাষণ দিয়ে তার প্রস্থান। ভীত সন্ত্রস্ত অফিসারগণ তার কথায় কেউ কোনো আশার বাণী খুঁজে পেলো না। তাড়াতাড়ি যার যার পথে নীরবে প্রস্থান করলো। যাওয়ার পথে জিয়া আমাকে বললেন, হামিদ, আগামীকাল দশটার দিকে আমার কাছে আসো।

১২ তারিখ জিয়াউর রহমান বিভিন্ন ইউনিটের জেসিও এবং এনসিওদের সাথে বেশ কিছু মিটিং করলেন। তাদের অনুরোধ করলেন, সৈনিকদের ব্যারাকে ফিরে আসার এবং অস্ত্র জমা দেয়ার জন্য বুঝিয়ে বলতে। তাদের দাবি-দাওয়া আস্তে আস্তে মানা হবে। জে-সি-ও-রা শান্ত হলেও সেপাইরা অশান্তই থেকে গেল। জিয়া তাদের দাবি-দাওয়া না মানাতে তারা বিদ্রোহী মনোভাব নিয়ে ঠাঁয় বসে রইল। বিভিন্ন দিকে তারা মিটিং করতে থাকল। জিয়া সুকৌশলে জেসিও এবং এনসিওদের তার কাছে ভেড়াতে সচেষ্ট হলেন। ঐ সময় একমাত্র জিয়া ছাড়া আর সব কমান্ড চ্যানেল ভেঙে যায়। আর্মি চীফ অব স্টাফ জেনারেল জিয়া সরাসরি জেসিও, এমন কি সেপাই প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করছিলেন। টু-ফিল্ডের সুবেদার মেজর আনিসুল হক চৌধুরী এই সময় জিয়ার পাশে থেকে সৈনিকদের বোঝাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

সারাদিন কোনো বড় রকম হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেনি। অবশ্য পুরোদিন ক্যান্টনমেন্টে কোনো অফিসারও ছিলেন না। অফিস কাজকর্ম ছিল সম্পূর্ণ বন্ধ। সর্বত্র বিরাট অচলাবস্থা। অরাজকতা। অফিস, ব্যারাক সেপাইদের দখলে। বিপ্লবীরা সর্বত্র ঘুরে ফিরে সৈনিকদের উত্তেজিত করছিল। দাবি-দাওয়ার প্রচুর লিফলেট সর্বত্র বিতরণ করছিল।

অবাক ব্যাপার! ঢাকা শহরে ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা। সাধারণ মানুষ অনেকেই ক্যান্টনমেন্টের এই অস্বাভাবিক ঘটনার কথা টেরও পায়নি।

খালেদের দাফন

৯ তারিখ দুপুরে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের এক চাচা শহর থেকে আমার সাথে যোগাযোগ করলেন খালেদের লাশটি নিয়ে যাওয়ার জন্য। ভয়ে খালেদের পরিবার পালিয়ে বেড়াচ্ছে। গত দুইদিন ধরে অবহেলায় লাশটি পড়ে আছে। কেউ আসছে না। আমি তাকে তখনই স্টেশন হেডকোয়ার্টারে চলে আসতে বললাম। তিনি ক্যান্টনমেন্টে আসতে রাজি হলেন না। অগত্যা বনানী স্টেশনের কাছে নিয়ে খালেদের লাশ তার হাতে পৌঁছে দেয়া হলো। তিনি সেনানিবাস গোরস্থানে খালেদকে দাফন করার অনুমতি চাইলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি দিলাম। কিছুক্ষণ পর ফোন করে বললেন, তার কাছে কোনো লোকজন নাই। যদি কবরটা খুঁড়ে দেয়া যায়। আমি তৎক্ষণাৎ ক্যান্টনমেন্টে বোর্ড অফিসারকে ডেকে ব্রিগেডিয়ার খালেদের কবর খুঁড়তে ৩/৪ জন সিভিলিয়ান মালি পাঠাবার ব্যবস্থা করলাম।

বিকেলে আবার তিনি ফোন করলেন, খালেদের আত্মীয়-স্বজন সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত। তারা সন্ধ্যার দিকে খালেদকে দাফন করতে চান। তাই একটু সিকিউরিটির ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করলেন। আমি বললাম, দেখুন আপনি কী সেপাই গার্ড চাচ্ছেন? তিনি বললেন, তওবা, তওবা। তখন আমি বললাম, আমি নিজে সন্ধ্যার সময় ওখানে হাজির থাকবো। আপনারা নির্বিঘ্নে খালেদকে নিয়ে আসুন। তিনি আশ্বস্ত হলেন। ধন্যবাদ জানালেন।

সন্ধ্যাবেলা ঘোর অন্ধকার। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। রাস্তার লাইটের স্তিমিত আলোতে ক্যান্টনমেন্ট গোরস্থানে তড়িঘড়ি করে খালেদের দাফন কার্য সমাধা করা হলো। এসময় উপস্থিত ছিলেন মাত্র ৫/৬ জন অতি নিকট আত্মীয় ও চাচা। আর শুধু আমি ও আমার ড্রাইভার ল্যান্স নায়েক মনোয়ার।

খালেদ মোশাররফের দাফন কার্য শেষে আমি স্টাফ রোডে খালেদের বাসা হয়ে ফিরে আসছিলাম। বাসার গেইট থেকে দেখলাম বেশ কজন সেপাই ঘুরপাক করছে। ঘরের দরজা খোলা, তালা ভাঙা। আমি ড্রাইভারকে বললাম দরজাটা গিয়ে বন্ধ করে দিতে এবং সেপাইদের বলতে এখান থেকে চলে যেতে। আর্মি হেডকোয়ার্টারে গেলাম। সেখানে গিয়ে হেডকোয়ার্টার উইং-এর সুবেদার মেজরকে খোঁজাখুঁজি করে বের করলাম। তাকে বললাম, ব্রিগেডিয়ার খালেদের বাসায় লুটপাট হচ্ছে। কিছু গার্ডের ব্যবস্থা করুন। তিনি আকাশ থেকে পড়লেন, বললেন, স্যার গার্ড কোথা থেকে দেবো? সেপাইরাইতো এখন আমাদের কমান্ড করছে। সবকিছু তো এখন তাদের দয়ার ওপর।

সন্ধ্যায় এই সময় ক্যান্টনমেন্টে আমি ঘোরাফেরা করছি দেখে তিনি খুবই আতঙ্কিত হলেন। বললেন, স্যার, আপনি তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যান। সেপাইদের মতিগতি ভালো না। আপনার বিশেষ ক্ষতি হতে পারে। তার কথায় আমি সম্বিৎ ফিরে পেলাম। আমি জিপ ঘুরিয়ে তাড়াতাড়ি বাসার পথ ধরলাম।

এভাবে শেষ হলো একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'কে-ফোর্সের' দুর্ধর্ষ কমান্ডার খালেদ মোশাররফ বীর উত্তমের শেষকৃত্য। গোপনে, অন্ধকারে, সবার অগোচরে!

১০ নভেম্বর

জিয়া ৯/১০ তারিখ রাত থেকে যশোহর থেকে আনা কর্নেল সালামের (পরে জেনারেল) কমান্ডো ব্যাটালিয়নের লোকজন দ্বারা সেনা হেডকোয়ার্টার ঘেরাও করে নিজে সেখানে অবস্থান নেন। এভাবে প্রকারান্তরে ব্রিগেডিয়ার শওকত সুকৌশলে তার ব্রিগেডের লোকজন দ্বারা জিয়ার চতুর্পার্শ্বে বেড়াজাল সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। জিয়াও এবার নিজেকে বিপ্লবী টু-ফিল্ড, ল্যান্সার ও জাসদপন্থীদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে সেনাসদরে পৌঁছে মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগলেন। যদিও তার অজান্তেই চতুর মাকড়শার দল তার চারপাশে দ্রুত নতুন ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে শুরু করে দিলো।

গতরাতে কোনো সহিংস ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। কোনো গোলাগুলির আওয়াজও শোনা যায়নি। অফিসাররা শহর থেকে টেলিফোনে নিজেদের ইউনিটের জেসিওদের সাথে যোগাযোগ রাখছিলেন।

সকাল ১০টার সময় আমি আর্মি হেডকোয়ার্টারে জিয়ার কাছে গেলাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, হামিদ, স্টেশনের খবর কী? আমি বললাম, আজতো মোটামুটি ভালোই দেখেছি। সে বলল, তোমাকে ডাকলাম, আমি তোমাকে লগ এরিয়া কমান্ডার বানাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তুমি তাড়াতাড়ি ব্রিগেডিয়ার রউফকে রিপ্লেস করো। লগ এরিয়াতে তোমার বহু কাজ রয়েছে। বুঝতেই পারছো, প্রথম কাজই হচ্ছে এখন কমান্ড কন্ট্রোল ফিরিয়ে আনা। সৈনিকদের ব্যারাকে ফিরিয়ে আনা। তাদের কাছ থেকে অস্ত্র উদ্ধার করা।

বেঙ্গল রেজিমেন্টগুলো কন্ট্রোলেই আছে। সমস্ত সমস্যা দাঁড়িয়েছে তোমার লগ এরিয়া ইউনিটগুলো নিয়ে। সার্ভিস কোরের ইউনিটগুলো একেবারে ওয়াইল্ড হয়ে গেছে। এছাড়া তোমার কমান্ডে রয়েছে বেঙ্গল ল্যান্সার ইউনিট। ট্যাংক নিয়ে এরা যা ইচ্ছে তা করে বেড়াচ্ছে। এদের সবাইকে যেভাবেই হোক তোমার কন্ট্রোলে আনতে হবে। ঢাকার ইউনিটগুলোর কাছে তুমিতো ভালোভাবেই পরিচিত। স্টেশন কমান্ডার হিসেবে তোমাকে সবাই চেনে। অতএব, তাড়াতাড়ি টেকওভার করে কাজ শুরু করে দাও। এখন অর্ডার-সর্ডারের অপেক্ষা করো না। কোনো অফিস ফাংশন করছে না। তুমি কালকের মধ্যেই টেকওভার করো। এখন যাও।

আমি চলে যাচ্ছিলাম। আবার ডেকে বলল, দেখ, তুমি জান, বহু 'ব্লাডি বিপ্লবী আর্মভম্যান' ক্যান্টনমেন্টে ঢুকে গেছে। ওদেরকে শক্ত হাতে কন্ট্রোল করতে হবে। ৪৬ ব্রিগেডের কর্নেল আমিনের সাথে যোগাযোগ রাখবে। সেই এখন অ্যাকটিং কমান্ডার।

আমি লগ এরিয়া হেডকোয়ার্টারে গেলাম। সেখানে কোনো অফিসারই ছিলো না। সুবেদার মেজরকে ডেকে বললাম, আগামীকাল আমি আসবো। তারা অবশ্য আমাকে ভালো করেই চিনতো। আমি আসছি শুনে তারা খুবই খুশি হলো। ঐদিন বিকেলের দিকে আবার আর্মি হেডকোয়ার্টার-এ গেলাম। অপারেশন রুমে নূরউদ্দীনের কাছে কয়েকজন অফিসারকে সিভিল ড্রেসে বসে থাকতে দেখলাম। এমন সময় কে একজন

এসে বলল, স্যার, চীফ আপনাকে ডাকছেন। আমি সোজা ভেতরে গেলে জিয়া বলল, হামিদ তুমি যাও তো, 38 LAA রেজিমেন্টের জওয়ানরা হাতিয়ার জমা দেবে না বলে জানিয়েছে। তারা রাস্তাঘাটে ফায়ার শুরু করেছে। দেখতো কিছু করতে পারো কি-না। আমি তাকে হেসে বললাম, ওরাতো আমার কমান্ডে নয়। ওরা কী আমার কথা শুনবে? বললো, তবু যাও, একটু দেখো। স্টেশন কমান্ডার হিসাবে তোমাকে তারা চিনবে।

আমি কি আর করি। বললাম, আচ্ছা যাই। আমি DMO কর্নেল নূরউদ্দীনের কামরায় ফিরে এসে দেখি সেখানে আর্টিলারির কর্নেল আনোয়ার (পরে জেনারেল) এবং কর্নেল সুফী (পরে জেনারেল) বসে আছে। আমি আনোয়ারকে বললাম; এই যে আনোয়ার, তুমি তো আর্টিলারির কমান্ডার। চলো একটু এ্যাক এ্যাক্ রেজিমেন্ট ঘুরে আসি। ওখানে গণ্ডগোল হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠলো, স্যার আমি জানি, কিন্তু যাবো না। Why should I kill myself for nothing. কর্নেল সুফী তার পাশে বসে ছিল। বললাম; চলো সুফী, তুমি আসো। সে ইনফেন্ট্রির অফিসার, তবু সে রাজি হলো। এমন সময় টু-ফিল্ড আর্টিলারির সুবেদার মেজর আনিস এসে হাজির। আমি তাকে বললাম, চলুন আনিস সাহেব, ৩৮ এ্যাক-এ্যাক রেজিমেন্টের জওয়ানরা হাতিয়ার জমা দিচ্ছে না। গোলমাল করছে। চলুন একটু ঘুরে আসি। তিনি রাজি হলেন। সুফীকে ধন্যবাদ দিয়ে আনিসকে আমার জিপে বসিয়ে ওদিকে চললাম।

এয়ারপোর্ট বড় রাস্তার উপর গিয়ে দেখি সেখানে ক্রমাগত ফায়ারিং হচ্ছে। রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ। আমরা দু'জন রেল ক্রসিং-এর কাছে গাড়ি থেকে নেমে টুপি খুলে বারবার ইশারা করতে লাগলাম ফায়ারিং থামাতে। প্রায় পাঁচ মিনিট চেষ্টার পর তারা ফায়ারিং বন্ধ করল। আমরা তখন জিপ চালিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে গেলাম। কাছে যেতেই আবার কয়েক রাউন্ড গুলি আমাদের মাথার ওপর দিয়ে ফায়ার করলো। সুবেদার মেজর আনিস বলল, আর এগুনো ঠিক হবে না স্যার, আপনি একটু বসুন। প্রথমে আমি তাদের সাথে কথা বলি। তারপর আপনি আসুন। খুবই সাহসী জেসিও বটে।

সে বেপরোয়াভাবে সামনে এগিয়ে গিয়ে চিৎকার করে বলল, শোনো! আমি টু-ফিল্ডের সুবেদার মেজর আনিস। ফায়ার থামাও। বলেই তিনি সোজা তাদের কাছে গিয়ে কথাবার্তা বলতে থাকলেন। ওখানে আরো কয়েকজন জেসিও এগিয়ে এলো। সেপাই অভ্যুত্থানের দিনগুলোতে সুবেদার মেজর আনিস ছিলো একজন বড় মাপের সৈনিক-নেতা। দেখলাম তার সাথে সবাই শ্রদ্ধাভরে কথা বলল। ৩ / ৪ মিনিট কথা হলো। সে ফিরে আসলো, বলল, স্যার, ফিরে চলুন, আপনার যাওয়া লাগবে না। আজ সন্ধ্যার আগেই তারা সব হাতিয়ার জমা দিতে রাজি হয়ে গেছে। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। জিপ ঘুরিয়ে আর্মি হেডকোয়ার্টারে ফিরে এসে জিয়াকে বললাম, ফায়ারিং বন্ধ হয়েছে। তারা সন্ধ্যার আগেই অস্ত্র জমা দেবে। জিয়া বলল, থ্যাংক ইউ। বললাম, সুবেদার মেজর আনিসকে সাথে নিয়েই গিয়েছিলাম। বলল, He is very useful JCO. তাকে এখানে থাকতে বলো। আমিও কথা বলবো।

কমান্ডার লগ এরিয়া

আমি ১১ তারিখ লগ এরিয়া কমান্ডারের অফিসে গিয়ে কমান্ড নিলাম। অর্থাৎ খালি চেয়ারে গিয়েই বসলাম। ব্রিগেডিয়ার রউফকে তখন গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছিল। হেড কোয়ার্টারে তখন কোনো অফিসার নেই। সুবেদার মেজর, ক্লার্ক, সেপাইরা ছিল। আমাকে চার্জ বুঝিয়ে দেয়ার মতোও কেউ ছিলো না। সব কিছুই গোলমেলে। আমি সুবেদার মেজরকে বললাম, আগামীকাল থেকে আমি নিয়মিত অফিসে বসবো। সব ইউনিটে যেন তা অফিস অর্ডারের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়।

১৬ ব্রিগেডের কর্নেল আমিনুল হককে ফোন করলাম। আমিন খুব খুশি হলো। বলল, স্যার, আমার ৪৬ ব্রিগেড ট্রুপস সব আমার কন্ট্রোলে আছে। এখন আপনি লগ এরিয়ার সব ইউনিট কন্ট্রোলে আনেন। দরকার হলে আমিও সাপোর্ট দেবো। জেনারেল জিয়া এখন খুবই অসুবিধায় আছেন। চীফ আমাকেও বলেছেন, আপনার সাথে যোগাযোগ রেখে ক্যান্টনমেন্ট ইউনিটগুলোতে কমান্ড-কন্ট্রোল ফিরিয়ে আনতে।

প্রকৃতপক্ষে কর্নেল আমিনুল হকই গত ২/৩ দিন ধরে তার ৪র্থ বেঙ্গলের কিছু বিশ্বস্ত ট্রুপ নিয়ে জিয়াকে আগলে রেখেছিল। এর মধ্যে যশোহর থেকে কর্নেল (পরে জেনারেল) সালামের কিছু কমান্ডো ট্রুপ নিয়ে আসা হয়েছে। এছাড়া ব্যক্তিগতভাবেও জিয়া তার কিছু বিশ্বস্ত সৈনিক তার পাশে জড়ো করতে সক্ষম হয়েছেন।

জিয়া এই সময় বিভিন্ন ইউনিটের জেসিও, এনসিও, এমনকি সেপাইদের প্রতিনিধিদের সাথে অফিসে, বাসায়, ঘনঘন সরাসরি আলোচনা চালিয়ে তাদের বোঝাতে থাকেন।

আমি লগ এরিয়া কমান্ডারের দায়িত্ব গ্রহণ করে পরদিন থেকে একা একাই স্টাফ কার নিয়ে ঢাকার ইউনিটগুলোতে চক্কর দিতে থাকি। সিগন্যালস্, সাপ্লাই ব্যাটালিয়ন, মেডিক্যাল, অর্ডিন্যান্স, ইএমই, বেইজ ওয়ার্কশপ, সিওডিএমপি সব ইউনিটেই অরাজক অবস্থা। আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার ইউনিটগুলোর সৈনিকদের মুখোমুখি হয়ে তাদের বোঝাতে থাকি। এসব ইউনিটের সৈনিকদের বেশিরভাগই ছিল শিক্ষিত। তারা ১২ পয়েন্ট দাবির যৌক্তিকতার কথা সর্বত্র আমাকে তুলে ধরল। ব্যাটম্যান প্রথা, তাদের বেতন ভাতা, তাদের ধীরগতি প্রমোশন, তাদের বাসস্থান, তাদের পজিশন ইত্যাদি সব পয়েন্টই ছিল যথার্থ। আমি বললাম, আমিও তোমাদের অধিকাংশ দাবি সমর্থন করি। আমি নিজে চীফকে অনুরোধ করবো এগুলো মেনে নিতে। তারা বলল, স্যার, জেনারেল জিয়াকে আমরা মুক্ত করেছি, খালেদকে মেরেছি, কিন্তু তিনি এখন আমাদের দাবিগুলো মানতে অস্বীকার করছেন। তিনি কথা দিয়ে কথা ফিরিয়ে নিয়েছেন। আমি ব্যারাকে গিয়ে তাদের বোঝাতে লাগলাম, জিয়া এসব দাবির প্রতি সহানুভূতিশীল। তিনি আইনশৃঙ্খলা ফিরে আসলেই এক এক করে ব্যবস্থা নিবেন। তাকে একটু সময় দিতে হবে। তারা আশ্বাস দিলো আর কোনো গণ্ডগোল হবে না।

সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি ছিল বেঙ্গল ল্যান্সার রেজিমেন্টে। ফাইটিং ইউনিট, শক্তিশালী ট্যাংক। ১৩ তারিখ উন্মুক্ত মাঠে পুরো ইউনিটের ছয়-সাতশো সৈনিককে একত্র করে তাদের সামনে ভাষণ দিলাম। তাদের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল মোমেনও ছিলেন। তাদের কাছে আকুল অনুরোধ জানালাম অস্ত্র নামিয়ে শৃঙ্খলায় ফিরে আনতে।

তারা বেশ কটি প্রশ্ন রাখল, বললো জিয়াউর রহমান কথা রাখেন নাই। প্রকাশ্যে মিটিং-এ দু'তিন জন বিভিন্ন প্রশ্ন তুললো। বিপ্লবী সুবেদার সারওয়ার কড়া দাবি রাখলো। আমি সবাইকে আশ্বাস দিয়ে আশ্বস্ত করলাম। তারা শান্ত থাকবে বলে আমাকে হাত তুলে কথা দিলো। কথা দিলো এখন আর কোনো গণ্ডগোল করবে না।

আমি সেখান থেকে সরাসরি জিয়ার কাছে আর্মি হেডকোয়ার্টার-এ গেলাম এবং তাকে ল্যান্সার সৈনিকদের সাথে আমার মিটিং-এর কথা অবগত করলাম। জেনারেল শওকত বসেছিলেন। তিনি ঐ মুহূর্তে ব্যাহত সিজিএস-এর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। শওকত বললেন, এদের তোষামোদ করে কোনো লাভ নেই। জিয়াও তাকে সমর্থন করলেন, বললেন, হ্যাঁ, আর তোষামোদ নয়, আমি তাদের ইনফেন্ট্রি ডিভিশন দিয়ে ঠাণ্ডা করবো। Just wait and see. আমি বোঝালাম এসব দরকার হবে না। তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরেছে। এখন এমনিতেই শান্ত হয়ে যাবে। কিন্তু তিনি আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করলেন। শওকতের কথাই ঠিক, তিনি বললেন।

এ কয়দিন আমি প্রতিটি বিদ্রোহী ইউনিটে ছুটে বেড়ালাম। সবখানেই সৈনিকরা আমাকে অকপটে শান্ত থাকবে বলে কথা দিলো। অবস্থার উন্নতির প্রেক্ষিতে আমি লগ এরিয়ার সকল অফিসার ইউনিটে ফিরে আসার জন্য শক্ত নির্দেশ পাঠালাম। প্রায় সবকটি ইউনিটেই অফিসাররা ফিরে আসলেন। অনেকে ফ্যামিলি নিয়েও ক্যান্টনমেন্টে ফিরলেন। অনেক ইউনিটে জেসিও এবং সৈনিকরা নিজেরা গিয়ে গাড়ি করে অফিসারদের সসম্মানে ফিরিয়ে আনলো।

আমার অধীনস্থ লগ এরিয়ার ১৩টি ছোট বড় ইউনিটের সৈনিকরাই ছিল সবচেয়ে বেশি বিদ্রোহী। ১২ তারিখ থেকে বেশিরভাগ অফিসার ক্যান্টনমেন্টে নিজ নিজ ইউনিটগুলোয় ফিরে আসতে শুরু করেন। ১৪/১৫ তারিখের দিকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট প্রায় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো।

এবার সেপাই-অফিসার ভাই ভাই

সৈনিকগণ তাদের অফিসারদের আবার যথাযথ সম্মান দেখানো শুরু করলো। তাদের পূর্ব ব্যবহারের জন্য সবাই দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলো। প্রায় প্রতিটি ইউনিটে এখন সৈনিকগণের সাথে অফিসারদের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠান পরে পুনর্মিলন পালন করা হলো। রক্তাক্ত যুদ্ধের পর এসেছে শান্তি। এবার 'সেপাই-অফিসার ভাই ভাই' করমর্দন, গলাগলি, কোলাকুলি, হাসি মশকরা—সর্বত্র আনন্দমুখর দৃশ্য। এসব দৃশ্য এখন মনে হলে রীতিমতো হাসির উদ্রেক হয়।

এই সময় জেনারেল জিয়াকে সঙ্গে নিয়ে আমি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের প্রায় সব বিদ্রোহী লগ এরিয়া ইউনিট পরিদর্শনে গেলাম। অবশ্য আমার ইউনিটগুলোতে নিয়ে যাওয়ার আগে জিয়া বারবার আমাকে বলে দেয়, কোনো সেপাই তার কাছে ১২ দফার দাবির কথা তুলতে পারবে না। তাদের দাবি শুনতে শুনতে সে অতিষ্ঠ হয়ে গেছে। অতএব আমি আগে থেকেই সিনিয়ার জেসিও-দের সেইভাবে নির্দেশ দিয়ে রাখি। COD'র বিশাল অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়ে গিয়েছিল। এসব লুণ্ঠিত অস্ত্র নিয়েই গত কয়দিন

ধরে বিপ্লবীরা সারা ক্যান্টনমেন্টে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। আমাকে নিয়ে সি-ও-ডি ভিজিটে গিয়ে এসব অবস্থা দেখে তাদের অফিসারদেরকে সেপাইদের সামনেই দারুণ বকাবকি করলো। তাদের কমান্ডার কর্নেল বারি অনুপস্থিত ছিলেন। ডাইরেক্টর কর্নেল মান্নান সিদ্দিকীকে (পরে জেনারেল) সামনে পেয়ে খুব একচোট নিলো। বলল, এখানে তোমরা সব অফিসার মেরুদণ্ডহীন। একজন অফিসার সেপাইদের সামনে দাঁড়ালে এমনটি ঘটতো না।

জিয়া এই সময় বিভিন্ন ইউনিট পরিদর্শনে যাওয়ায় নিয়ম-শৃঙ্খলার দ্রুত উন্নতি ঘটল। অফিসারদের মধ্যেও প্রবল সাহসের সঞ্চার হলো। সবাই বুঝতে পারলো সেনাপ্রধান এখন আর অসহায় নন, তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সক্ষম। এর ফলে ইউনিট কমান্ডাররাও দ্রুত সক্রিয় হয়ে উঠলো। এসব পরিস্থিতিতে বুদ্ধিমানরা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। বিভিন্নজন বিভিন্ন মতলবে এবার জোট বেঁধে সেনাপ্রধানের কাছে ভেড়ার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ল, তারাও যারা ক'দিন আগেও জিয়ার নাম শুনলেই নাক সিঁটকাতো।

এই সময় এই পরিস্থিতিতে ব্রিগেডিয়ার শওকত তার স্বকীয় স্টাইলে জেনারেল জিয়ার পাশে শক্তভাবে অবস্থান নিয়ে জিয়াউর রহমানকে গাইড করতে থাকেন। তিনি ৫ তারিখে যশোহর থেকে ঢাকায় আসেন খালেদ মোশাররফের মিটিং-এ যোগদান করতে। ৬/৭ তারিখ রাত্রে সৈনিকরা তাকে ধরে জিয়ার কাছে নিয়ে আসে। ঢাকায় এসেই তার লবিং শুরু হয়ে যায়। তিনি জিয়াউর রহমানকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একটি নতুন নবম ডিভিশন সৃষ্টি করে তাকে প্রমোশন দিয়ে ডিভিশন কমান্ডার বানিয়ে ঢাকায় একটি অনুগত বাহিনী সৃষ্টি করার তদবির করতে থাকেন। কদিন পর এরশাদ ঢাকা আসলে তিনিও তার বন্ধু শওকতের প্রমোশনের প্রতি জোর সমর্থন দেন। জিয়া তার যুক্তি ও চাতুর্যপূর্ণ কথায় সায় দেয়। গড়ে ওঠে নতুন নবম ডিভিশন। শওকত প্রমোশন নিয়ে হলেন মেজর জেনারেল। এই সময় শওকত আকস্মিকভাবে জিয়াকে আঁকড়ে ধরে খুবই প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। এরশাদের আগমনে তার জোটের বাঁধন আরো শক্ত হয়ে উঠলো। তারা দুজন তখন হরিহর আত্মা! অবাক বিস্ময়ে দেখলাম, যশোহর থেকে যে কমান্ডার খালেদ মোশাররফের আহ্বানে সাড়া দিয়ে উল্কার বেগে ঢাকায় ছুটে আসেন, তিনি একদিনেই লেবাছ পরিবর্তন করে স্রেফ বাক-পটুতার যাদুমন্ত্রে জিয়ার শুভাকাঙ্ক্ষী সেজে তার পদতলে স্থান করে নেন! জিয়াকে তিনি বোঝালেন, আমিতো স্যার আপনাকেই উদ্ধার করতে ঢাকায় এসেছিলাম, খালেদকে সমর্থন দিতে নয়।

এরশাদের আগমন

ভারতের নয়াদিল্লীতে একটি কোর্সে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার এরশাদ। তার কোর্স অসমাপ্ত রেখেই শওকত তার বন্ধুবর এরশাদকে ঢাকায় ফিরিয়ে আনতে তৎপর হন। তাই হলো, কোর্স অসমাপ্ত রেখেই তাকে ঢাকায় ফিরিয়ে আনেন জিয়াউর রহমান। কোর্সের মধ্যেই তাকে মেজর জেনারেল র‍্যাংকে প্রমোশন দেয়া হয়। এক বছরে তার দুটি বড় প্রমোশন! এ নিয়ে সৈনিকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হলো।

ঢাকায় এনে জিয়া তাকে ডেপুটি চীফ অব স্টাফ বানালেন। এরশাদের ত্বরিত প্রমোশন নিয়ে সৈনিকদের অসন্তোষের কথা জেসিও-দের মারফত জিয়া জানতে পারলেন, কিন্তু তখন কিছু করবার ছিলো না। আমাকে ডেকে জিয়া বললেন, হামিদ তুমি এরশাদকে সাথে নিয়ে তোমার ইউনিটগুলোর সৈনিকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দাও। ওর ব্যাপারে জওয়ানরা কিছু প্রশ্ন তুলেছে। বেচারা 'সাদা-সিধে-নম্র মানুষ' কিন্তু দেখো, ব্যাটরা কী সব প্রশ্ন তুলেছে। তার কথা শুনে আমার ফিক করে হাসি উঠল। জিয়া বলল, কেন, তোমার তকলিফটা কী? বললাম, কিছু না। এমনিতেই হাসলাম। ১৯৮১ সালে চট্টগ্রামে একটি ষড়যন্ত্রমূলক অভ্যুত্থানে জিয়া নিহত হলে তার ঐ কথাটি তখন আমার বারবার মনে পড়ছিল।

যাক্, পরদিনই মেজর জেনারেল এরশাদকে সাথে নিয়ে আমার লগ এরিয়া ইউনিটগুলো ভিজিটে বের হলাম। এরশাদকে প্রথমে 'ইনফরমালী' ইউনিটগুলোতে নিয়ে ঘুরলাম। এরশাদ ছিলেন তখন সাধারণ সৈনিকদের কাছে একেবারেই একটি 'অজ্ঞাত' নাম। অথচ জিয়ার বদৌলতে তিনি একলাফে সামনের কাতারে। জিয়ার এই 'সাদাসিধে-নম্র-বেচারা' মানুষটিই দেখতে দেখতে একদিন পূর্ণ ব্যাঘ্রে পরিণত হয়েছিল!

প্রথম ভিজিটিং ইউনিট ছিল মেডিক্যাল ব্যাটালিয়ন ও সিএমএইচ। সৈনিকদের একত্র করা হলো। তিনি কোনোমতে দু-চারটি কথা আওড়ালেন। মেডিক্যাল ডাইরেক্টর কর্নেল খুরশিদ আমার পাশে বসা ছিল। আমাকে খোঁচা মেরে বললো, হামিদ ভাই, জওয়ানদের দেইখ্যা ওর ডর লাগত্যাছে নাকি? ভেতরে হাওয়া একটু কম মনে হইত্যাছে। বললাম, দেখেন, দুদিন গেলেই আপনা-আপনি ফুলে উঠবে।

সবাই এরশাদকে প্রথম প্রথম তাই ভেবেছিল। কিন্তু কথায় বলে, ক্ষমতার উত্তাপ, বল-বর্ধক, বীর্য-বর্ধক! তাই পরবর্তীতে তার ফুলে উঠতে মোটেই সময় লাগেনি।

৯ নভেম্বর, জাসদের রব, জলিল প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হলো। শুধু মুক্তি নয়, জিয়া তাদের সাথে রীতিমতো আলোচনা চালাতে শুরু করলেন। জাসদের নীতিমালা মানতে জিয়া রাজি হলেন না। ফলে আলোচনা ভেঙে গেলো। তাহেরের জাসদ বিপ্লবী গ্রুপ আবার ভেতরে বাইরে শক্ত আঘাত হানতে তৈরি হতে লাগল। কিছুদিন পর একদিন জিয়া টেলিফোন করে বলল, হামিদ, আজ রাতে তোমার লগ এরিয়া ইউনিটগুলোকে সাবধান থাকতে বলো। বললাম, কী হয়েছে? সে বলল, আগামীকাল শুনতে পারবে।

পরদিন খবরের কাগজে খবর বেরুলো, জাসদের রব, জলিল, শাহজাহান সিরাজ, তাহের প্রমুখকে আবার গ্রেফতার করা হয়েছে। সকালবেলা জিয়া আমাকে ফোন করে বললো, পত্রিকা পড়েছো? বললাম, 'হ্যাঁ। জিয়া টিটকিরি কেটে বললো, তোমার শিক্ষিত ইউনিটগুলোতেই ওদের আস্তানা। ওদের ঝটপট পাকড়াও করো, আর জেলে ঢোকাও। ব্যাটাদের আমি বিপ্লব দেখিয়ে ছাড়বো। আমার অধীনস্থ লগ এরিয়া ইউনিটগুলোর অশান্ত সৈনিকবৃন্দ তখন সবাই শান্ত, সুশৃঙ্খল হয়ে এসেছিল। কাকে ধরবো, কাকে জেলে ঢোকাবো কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আমি তাকে কোনো

শক্ত এ্যাকশনে না যেতে অনুরোধ করলাম। জিয়া অধীর, অস্থির, উত্তেজিত। বললো, Don't be coward. Take action.

পরবর্তীতে কর্নেল তাহেরের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হলো। বিশেষ মার্শাল-ল' আদালতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন জিয়ারই কোর্সমেট ব্রিগেডিয়ার ইউসুফ হায়দার। ট্রাইবুনালের অন্যান্য সদস্য ছিলেন : উইং কমান্ডার রশিদ, কমান্ডার সিদ্দিক আহমদ, ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল আলী ও হাসান। তড়িঘড়ি বিচারে কর্নেল তাহেরের ফাঁসি হলো। ১৭ জুলাই ১৯৭৬ তার ফাঁসির রায় দেয়া হয়। ২০ জুলাই প্রেসিডেন্টের কাছে তার ক্ষমার আবেদন নাচক হয়। ২১ জুলাই কাকডাকা ভোরে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে তার ফাঁসির আদেশ কার্যকর করা হয়। তাড়াহুড়ার ফাঁসিতে বিচার বিভাগীয় পদ্ধতি গুরুতরভাবে লঙ্ঘন করা হলো।

এভাবেই ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বরের বিপ্লবী নেতা কর্নেল তাহের বীর উত্তম ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলে প্রাণ বলি দিয়ে জিয়ার সাথে তার বন্ধুত্বের ঋণ পরিশোধ করলেন! বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তিনিই প্রথম অফিসার যাকে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিতে হলো। দিনটি ছিল ২১ জুলাই ১৯৭৫ইং।

একদিন সেনাসদর থেকে জেনারেল এরশাদ ফোন করে বললেন, ৩রা নভেম্বর অভ্যুত্থানকারী বিদ্রোহী অফিসারদের ট্রায়াল শুরু করা হবে। লগ এরিয়া হেডকোয়ার্টারের তত্ত্বাবধানে ট্রায়াল হবে। চীফ বলেছেন, আপনাকে সব অভিযুক্ত অফিসারদের চার্জশীটগুলো সাইন করে বাকি ব্যবস্থা নিতে। আমি বললাম, দয়া করে এসব ট্রায়ালের ঝামেলায় আমাকে ফেলবেন না। এছাড়া আমি কেন এসব চার্জশীট সাইন করতে যাবো?

কিছুক্ষণ পরই জিয়ার ফোন এলো, হামিদ, তোমরা কেন এরশাদের সাথে সহযোগিতা করো না? Culprit-দের চার্জশীট তোমাকে সাইন করতে হবে। ট্রায়াল পরে দেখা যাবে। জিয়া ফোন করার পরদিন লেঃ কর্নেল (অবঃ) আজিজ একগাদা 'তৈরি চার্জশীট' বগলদাবা করে আমার অফিসে এলেন এবং পাঁচ মিনিটেই সব সাইন করিয়ে নিয়ে চলে গেলেন। পরবর্তীতে এ নিয়ে ব্রিগেডিয়ার রউফ, শাফায়েত জামিল প্রমুখ আমার ওপর নাখোশ ছিল; তারা ভেবেছিল আমিই বুঝি তাদের চার্জশীট তৈরি করেছি। যদিও আসলে এগুলো করা হয়েছিল সেনাসদরে JAG ব্রাঞ্চে এরশাদেরই তত্ত্বাবধানে।

এর ক'দিন পরই জিয়ার ফোন এলো, বললো, হামিদ, ৩ নভেম্বর চক্রান্তকারী ১১ জন অফিসারের কেন ট্রায়াল শুরু করছো না? বললাম, আমি তো তাদের চার্জশীট সই করে দিয়েছি। এখনতো এরশাদই ব্যবস্থা করবে। বলল, তাহলে, তুমি ওদের গিয়ে দেখে আসো। ওদের সিকিউরিটি ব্যবস্থা ঠিক নয়। গড়বড় আছে। আসলে ওরা ডিজিএফআই'র তত্ত্বাবধানে ছিল শেরেবাংলা নগরে প্রধানমন্ত্রীর ভবনে। তবু আমি জিয়ার কথায় তাদের দেখতে গেলাম। ওখানে বন্দি করে রাখা হয়েছিল মেজর হাফিজউদ্দিন, মেঃ জাফর ইমাম, মেঃ গাফ্‌ফার, মেঃ ইকবাল, মেঃ আমিনুর, মেঃ নাসেরসহ আরো ক'জনকে— সবার নাম মনে পড়ছে না। তাদের সাথে কথা হলো।

ট্রায়াল নিয়ে তারা চিন্তায় ছিলো। কী হয়, কী না-হয়! সবাই তরুণ অফিসার। তাদের ছিল একগাদা অভিযোগ। খাট নাই। পালংক নাই, ফ্যান নাই, ভালো খানা নাই। আমরা এজন্যই কী মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম? মেজর জাফর ইমামের কণ্ঠই সবাইকে ছাড়িয়ে। তাদের যথাসম্ভব আশ্বাস দিয়ে ফিরে এলাম।

কী আশ্চর্য! আমার ভিজিটের একদিন পরই মেজর হাফিজউদ্দিন ও তার ভায়রা মেজর ইকবাল উঁচু দেয়াল টপকে বন্দিশালা থেকে পালিয়ে গেল। চারিদিকে হৈ চৈ। আমি জিয়াকে ঘটনা রিপোর্ট করলাম। সে বলল, এটা তোমার 'নেগলিজেন্স'। আমি আজও হিসাব মেলাতে পারি না, জিয়া কর্তৃক আমাকে ওদের দেখতে যাওয়ার নির্দেশ এবং পরদিনই ওদের পলায়নের মধ্যে যোগসূত্রটি কী?

সেপাই বিদ্রোহের পক্ষকালের মধ্যে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে মোটামুটি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলো। সেপাইরা ব্যারাকে ফিরে গেছে। অফিসাররা ইউনিটগুলোতে কাজকর্ম শুরু করেছে। সেপাইরা লুট করা অবৈধ অস্ত্রশস্ত্র জমা দিয়েছে। বিপ্লবী সৈনিকরা ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে পালিয়ে গেছে। বিশেষ করে এরিয়া ইউনিটগুলোই ছিল সবচেয়ে বেশি বিদ্রোহী। তারা সবাই শান্ত হয়ে এসেছে। আমি ত্বরিত unit fitness প্রোগ্রাম চালু করে তাদের ট্রেনিং-এ ব্যস্ত রাখলাম।

সংঘর্ষের পথে জিয়া

সর্বত্র শান্তি বিরাজমান। এবার শুরু হলো চক্রান্তবাজ স্বার্থান্বেষী অফিসারদের আসল খেলা। জিয়াউর রহমানের মাথায় ঢুকানো হলো ভিন্ন চিন্তা : রক্তপিপাসু এসব ১২ দফার সৈনিকদের এক্ষুণি শায়েস্তা করতে হবে। তা না হলে তারা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। আবার বিদ্রোহ করবে। এদের শক্তি এখনই ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। তার পাশে এখন বড় বড় উপদেষ্টাগণ জড়ো হয়েছেন। এসেছেন যশোহর থেকে মীর শওকত আলী। তিনি ইতিমধ্যে রাজধানী ঢাকায় নবম ডিভিশন গঠন করে হয়েছেন জেনারেল। দিল্লী থেকে উড়ে এসেছেন হুসাইন মুহম্মদ এরশাদ। তিনিও ত্বরিত প্রমোশন নিয়ে মেজর জেনারেল। এসেছেন দিল্লী থেকে ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর। বার্মা থেকে ব্রিগেডিয়ার নূরুল ইসলাম। CMH থেকে ভাঙ্গা পা নিয়েও উঠে এলেন কর্নেল মইনুল হোসেন। তারা সবাই জেঁকে ধরেছেন জিয়াকে। হালুয়া রুটি নিয়ে কাড়াকাড়ির ধূম!

সেপাইদের চাপে পড়ে ইতিমধ্যে জিয়াউর রহমান বহু অপমান সহ্য করেছে। তারা তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছে। বিপ্লবীদের সাথে যোগ দিয়ে সেপাইরা তাঁকে দিয়ে ১২-দফায় সই করতে বাধ্য করিয়েছে। ইতিমধ্যে চাপ সৃষ্টি করে ব্যাটম্যান প্রথা বিলোপসহ বেশ কয়টি সুবিধা আদায় করিয়ে নিয়েছে। আর নয়।

ডেপুটি চীফ জেনারেল এরশাদ আর নবম ডিভিশন কমান্ডার জেনারেল শওকত এখন প্রধান মন্ত্রণাদাতা। তাদের যাঁতাকলে আবদ্ধ জিয়াউর রহমান। তাদের পরামর্শেই এখন উঠেন বসেন জিয়াউর রহমান। এবার ১২ দফা দাবিদারদের শায়েস্তা করার পালা। তারা নিজ স্বার্থেই জিয়াকে দ্রুত সৈনিকদের সাথে সংঘর্ষের দিকে ঠেলে দিলো।

একদিন জিয়া বলল, আমি ঢাকা থেকে সিগন্যাল ইউনিটকে অতিসত্ত্বর সরাতে চাই। এরা বেশি শিক্ষিত হয়ে উঠেছে। আমি তাকে বুঝালাম, এরকম করা এখন ঠিক হবে না। অসন্তোষ বাড়বে। এসব কাজ কিছুদিন পরে করলেও চলবে। এখন করলে সবাই আবার বিগড়ে যাবে। তোমারই সমস্যা হবে।

সে কিছুই শুনলো না। বলল, দেখো আমি কীভাবে তাদের সোজা করি।

আর্মি হেডকোয়ার্টারের নির্দেশে সিগন্যাল ইউনিটকে ঢাকা থেকে কুমিল্লা যেতে বলা হলো। এ নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। প্রথমে তারা যেতে অস্বীকার করলো। তবে শেষ পর্যন্ত সুকৌশলে প্রীতিভোজ, চা-চক্র ইত্যাদির মাধ্যমে কাজ সেরে নেয়া হলো। তারা অসন্তুষ্ট হল বটে। তবে জিয়ার নির্দেশ মানতে তাদের ছলে-বলে-কৌশলে বাধ্য করা হলো। সৈনিকরা জিয়ার মতিগতি নিয়ে সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠলো।

২০ নভেম্বর ছিল জেনারেল জিয়াকে নিয়ে আমার বেঙ্গল ল্যান্সার ইউনিট ভিজিট করার পূর্ব নির্ধারিত প্রোগ্রাম। আমি ১৯ তারিখ দুপুরে জিয়াকে ফোন করে প্রোগ্রামের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেই বলল, আমি ঐ বেয়াদব ট্যাংকওয়ালাদের ভিজিট করবো না।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন, কী হয়ে গেল? বলল, হামিদ, তোমার বেঙ্গল ল্যান্সার সবচেয়ে উচ্ছৃঙ্খল ইউনিট। এদের আমি ঢাকা থেকে বগুড়া পাঠাবো। তাদের ঢাকায় রাখা যাবে না। তুমি মঞ্জুরের সাথে কথা বলো, সে ব্যবস্থা নিচ্ছে। স্পষ্ট বুঝলাম ঊর্ধ্বমার্গে নতুন চক্রান্ত শুরু হয়ে গেছে। বললাম— এদের এখন মুভ করানো উচিত হবে না। তারা 'রি-অ্যাক্ট' করবে। এদের বহু কষ্টে শান্ত করা হয়েছে। জিয়া রেগে গেল, বলল, আমি জানি 'ইউ আর ট্রাইং টু বিকাম পপুলার'। আমি সব বুঝি। কিন্তু তারা যাবেই। আমি বললাম, তাহলে আমার 'লগ এরিয়া' কমান্ড থেকে এই ইউনিটটি সরিয়ে নাও। আমি তাদের এরকম অর্ডার দিতে পারবো না। কারণ আমি জানি এতে একটা গণ্ডগোল বাধবেই। যারা তোমাকে অ্যাডভাইস দিয়েছে, তারা ঠিক কাজ করেনি। সে বলল, হামিদ আমি সব বুঝি। সব খবর রাখি! ও. কে, আজ থেকে বেঙ্গল ল্যান্সার তোমার কমান্ডে নয়। আর্মি হেডকোয়ার্টারের সরাসরি কমান্ডে আসলো। তুমি চিঠি পেয়ে যাবে।

পরদিনই আর্মি হেডকোয়ার্টার থেকে জরুরি একটি ছোট্ট চিঠির মারফত লগ এরিয়া হেডকোয়ার্টারের অধীনে ন্যস্ত করা হলো। ব্রিগেডিয়ার (পরে জেনারেল) মঞ্জুর তখন সি.জি.এস। চিঠির সাথে সাথে সে আমাকে ফোন করেও এই পরিবর্তনের কথা জানিয়ে দিয়ে বলল, দাদা, (আমাকে বরাবর শ্রদ্ধা করে সে 'দাদা' বলেই সম্বোধন করতো) আমি আপনার ঘাড়ের বোঝা কিছু হাল্কা করে দিলাম। তাকে থামিয়ে দিয়ে আমি বললাম, মঞ্জুর, ব্যাপারটা আমি জানি। Thank you and wishing you best of luck with Tankers.

খুব সম্ভবত জেনারেল মঞ্জুরের সাথে আমার এটাই ছিল শেষ কথোপকথন। দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী সেনাবাহিনীর এই প্রতিভাবান অফিসারটি পরবর্তীকালে চট্টগ্রাম সেনা অভ্যুত্থানে নির্মমভাবে নিহত হন। তার সাথে বোধ করি আমার আর দেখা হয়নি।

যাই হোক, এবার শক্ত এ্যাকশন নেয়ার পালা। তাদের নির্দেশ দেয়া হলো, ঢাকা ত্যাগ করে বগুড়া মুভ করার জন্যে। বলা হলো, এটা টেকনিক্যাল মুভ। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য বুঝতে ল্যান্সার সৈনিকদের মোটেই কষ্ট হয় নাই।

তারা জিয়ার নির্দেশ মানতে অস্বীকার করল। শুরু হলো নতুন গণ্ডগোল। ল্যান্সার সৈনিকরা আবার অস্ত্র হাতে গর্জে উঠলো। ট্যাংকগুলো সচল করে আবার তারা লড়তে তৈরি হয়ে গেল। তারা সেনা হেডকোয়ার্টার গুঁড়িয়ে দেবে। শওকত-এরশাদ জিয়ার কানে দিলো, এসবই লগ এরিয়া কমান্ডারের চাল।

২২ নভেম্বর। ক্যান্টনমেন্টের অবস্থা খুবই নাজুক ও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। যে কোনো মুহূর্তে গোলাগুলি শুরু হয়ে যেতে পারে।

আবার মহা সংকটে জিয়া।

তাকেই একা অবস্থা সামাল দিতে হচ্ছে সব সমস্যা। অন্য কোনো অফিসারকে কেউ মানছে না। এবার তো ল্যান্সাররা জিয়াকেও মানছে না। বেগতিক দেখে জিয়া ক্যান্টনমেন্ট অডিটরিয়ামে ঢাকায় সকল ইউনিটের সুবেদার মেজর, সিনিয়ার সুবেদারদের ও সৈনিক প্রতিনিধিদের জরুরি সভা আহ্বান করলেন। চীফ অব স্টাফ জিয়া তাদের সবার কাছে ল্যান্সার ইউনিটের নির্দেশ মানতে অস্বীকার করার কথা বর্ণনা করে বললেন, আপনারা আমার কোনো নির্দেশ মানছেন না, আমি আর অপমান সইতে পারি না। আমি আর আপনাদের 'চীফ' থাকছি না। বলে সবার সামনে স্টেজে কোমর থেকে বেল্ট খুলে মেঝেতে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলেন। সামনের সারিতে বসা জেসিওরা ছুটে এলেন, স্যার, স্যার করেন কী? তাড়াতাড়ি মাটি থেকে তুলে আবার তাঁর বেল্ট পরিয়ে দিল। ল্যান্সার ইউনিটের বিপ্লবী সুবেদার সারওয়ার নিজেই এসে বেল্ট লাগাতে সাহায্য করল। সবাই হাত মেলালো, জিয়ার সাথে কোলাকুলি করলো। এই সুযোগে জিয়া একখানি কোরান শরীফ (যা আগে থেকে ব্যবস্থা করে রাখা ছিল) এনে সব জেসিওকে ছুঁইয়ে প্রতিজ্ঞা করালেন, তারা শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখবে। নির্দেশ মানবে। জিয়া নিজেও পবিত্র কোরান ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন।

জিয়ার চাতুর্যপূর্ণ এই নাটক টনিকের মতো কাজ দিলো। ঢাকা স্টেশনের সব ইউনিটের জে.সি.ওরা তাদের যুদ্ধাংদেহী ল্যান্সার ভাইদের বুঝিয়ে শুনিয়ে শান্ত করে বগুড়া মুভ করাতে রাজি করালেন।

একটি বিরাট গণ্ডগোলের ফাঁড়া থেকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট কোনোমতে সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেল, শুধু জিয়ার কূট-বুদ্ধিতে। চাটুকার অফিসাররা জিয়াকে ধন্য ধন্য করতে লাগলো। অথচ একটা সংঘর্ষ বাধলে তারা সবচেয়ে খুশি হতো।

২৩ তারিখ শক্তিশালী বেঙ্গল ল্যান্সার রেজিমেন্ট ঢাকা ত্যাগ করে বগুড়া চলে গেলো। আর্মি হেডকোয়ার্টারে সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। জিয়ার মুখে হাসি ফুটে উঠল। এবার ক্যান্টনমেন্টে জিয়ার পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। তাকে চ্যালেঞ্জও করার কেউ রইলো না।

এই সময় ক্ষমতার আবর্তে জিয়া গভীরভাবে আটকে পড়েন। ক্ষমতায় বসেও শান্তিতে নেই জিয়া। চারিদিকে বিদ্রোহ। সৈনিকদের বিরুদ্ধাচরণ। ক্ষমতা নিরংকুশ করতে পাগল হয়ে উঠেন জিয়া। তার অবস্থা ভালো করে বুঝতে পারে চতুর

পার্শ্বচররা। তারা বুঝতে পারে জিয়ার দিন ঘনিয়ে আসছে। ক্ষমতার মসনদ থেকে যে কোনো মুহূর্তে সে ছিটকে পড়তে পারে। তারপর কে কে? ঐ মুহূর্তে জিয়ার পাদপার্শ্বে থেকেই এরশাদ, শওকত ভয়ানক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মেতে ওঠে। এবার মঞ্জুরও যোগ দেয়। প্রদীপের নিচে চলে গোপন খেলা। জিয়া যতোই ক্ষমতা নিরংকুশ করতে কঠোর হয়ে ওঠেন, তারা ততোই তাকে পরিণতির দিকে ঠেলতে থাকে। 'তিন খলিফার' মধ্যে নেপথ্যে ক্ষমতার লড়াই চলে নীরবে, অতি সন্তর্পণে। জিয়া কালো চশমার আড়াল থেকে ব্যাপারটা কিছুটা অনুধাবন করলেও তখন তেমন পাত্তা দেননি।

১৫ তারিখের দিক থেকে মোটামুটি পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে। অফিসাররা সবাই ক্যান্টনমেন্টে তাদের ফ্যামিলি ফিরিয়ে এনেছেন। অফিসার-সেপাই সম্পর্ক সুন্দর হয়ে উঠলো। সবার মুখে হাসি-খুশি। ইউনিট, হেডকোয়ার্টার সর্বত্র স্বাভাবিক কাজকর্মে মুখরিত হয়ে উঠলো।

শান্ত-সুন্দর পরিবেশ অনেকের পছন্দ নয়। ফাইটিং পরিবেশে শক্তি প্রদর্শনে সুবিধা হয়। সৈনিকদের দাবি-দাওয়া তাদের চাপের মুখে তখন বেশ কিছু মেনে নেয়া হয়েছিল বটে, তবে তাদের বিপ্লব এবং বিদ্রোহের অপমান অফিসাররা, এমনকি জিয়াও সহজে মেনে নিতে পারেননি। শীঘ্র ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে ও বাইরে ব্যাপক তল্লাসি ও খোঁজাখুঁজি শুরু হলো। জিয়ার এখন ভিন্নমূর্তি। জিয়া এখন শক্ত প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে। জাসদ-বিপ্লবীদের সাথে আর কোনো আপস নয়। ধৈর্যের বাঁধ তার ভেঙ্গে গেছে। বিগড়ে গেলে জিয়া ভয়ংকর!

জিয়ার সাথে বিপ্লবীদের আলোচনা ভেঙ্গে যায়। তাদের ভাষায়, জিয়া তাদের সাথে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। জিয়া কঠোরভাবে জাসদপন্থী বিপ্লবীদের ও বিপ্লবী সৈনিকদের দমন করতে নির্দেশ দিলেন। শুরু হলো ধর-পাকড়। আমাকে জিয়া একদিন ডেকে বললেন, হামিদ, তোমার লগ এরিয়ার ইউনিটগুলোর শিক্ষিত সৈনিকরাই সবচেয়ে বেশি গণ্ডগোল করছে। তুমি এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নাও। প্রতিটি ইউনিট থেকে নেতা গোছের সেপাই এনসিওদের লিস্ট বানিয়ে ঢাকার বাইরে পাঠিয়ে দাও। আমি তাকে বোঝালাম, এইমাত্র ক'দিন আগে সেপাই বিদ্রোহ শেষ হয়েছে। এখনই এদের বিরুদ্ধে ঢালাওভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করলে আবার গণ্ডগোল শুরু হয়ে যাবে। আমরা দু-তিন মাস সময় নিয়ে এসব করলে সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না। এখন শাস্তি-চিন্তার বদলে কিছু 'ওয়েলফেয়ার' চিন্তাভাবনা করা উচিত। পরিস্থিতির কারণে এই মুহূর্তে Soft লাইন গ্রহণ করা উচিত। কমাণ্ডার হিসাবে এটা আমার আন্তরিক সাজেশন্স। জিয়া মাথা গরম করে বলল, I don't take your suggestion. No compromise with discipline. আমাকে অন্যান্য সিনিয়ার অফিসার আগেই বলেছে, তোমার দ্বারা সেপাইদের মধ্যে ডিসিপ্লিন আনা সম্ভব হবে না। তুমি 'পপুলার' হওয়ার চেষ্টা করছো। আমি ল্যান্সারকে শায়েস্তা করেছি। তুমি পারো নাই। আমি বাকিদেরকেও সোজা করে ছাড়বো।

আমি কিন্তু তাঁর কথায় আমার অধীনস্থ সৈনিকদের বিরুদ্ধে গণ-চার্জসীট তৈরি করে শাস্তি প্রদানের ঘোর বিরোধী ছিলাম। জিয়া তখন অধীর অস্থির। বাচ-বিচার না করে ঢালাওভাবে সৈনিকদের শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর। তাঁর কাছে লগ এরিয়ার

বিদ্রোহীদের লম্বা লিস্ট ছিল। তাঁকে শান্ত করার কেউ ছিল না। বরং চতুর পার্শ্বচররা তার মেজাজ বুঝে আরো ক্ষেপিয়ে দিল। আমি বহু অনুনয় বিনয় করেও তাঁর উগ্র চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন করতে পারলাম না। জিয়া তখন বাঘের পিঠে ক্ষেপা সওয়ারী।

আসলে জিয়া তখন এমনই ক্ষেপে গিয়েছিলো যে, অন্তত লগ এরিয়ার সব সৈনিকেরই সে মনে করছিল জাসদপন্থী বিপ্লবী প্রভাবিত।

জিয়ার আচরণ যেন কেমন হয়ে গেলো। সে আমাকে সন্দেহ করতে লাগলো। কোনো কারণ ছাড়া খামাখাই তাঁর সাথে আমার সুসম্পর্কের হঠাৎ অবনতি ঘটলো। শওকত ও এরশাদের কুমন্ত্রণায়ই জিয়া আমাকে ভুল বুঝেছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বলাবাহুল্য, সেপাই বিদ্রোহের কঠিন সময়কালে জিয়াই আমাকে নিজে তার অফিসে ডেকে ঢাকার বিদ্রোহী ফরমেশন লগ এরিয়ার কমান্ড দিয়েছিল। বন্ধু হিসাবে রাতদিন খেটে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিটি বিদ্রোহী ইউনিটে ছুটে গিয়ে সৈনিকদের ভাষণ দিয়ে, বুঝিয়ে-শুনিয়ে রক্তাক্ত পথ পরিহার করে শৃঙ্খলার পথে ফিরিয়ে আনতে প্রচণ্ড পরিশ্রম করি।

ঢাকার বিদ্রোহী ইউনিটগুলোর তৎকালীন কমান্ডার হিসেবে এটা ছিল অবশ্য দায়িত্ব ও কর্তব্য, কোনো আবেগের তাড়না নয়। এই সময় ক্যান্টনমেন্টে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে জিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে ৪৬ ব্রিগেডের নতুন কমান্ডার কর্নেল (পরে ব্রিগেডিয়ার) আমিনুল হকও মূল্যবান অবদান রাখেন। সৈনিকদের পক্ষ থেকে ঐ সময় অশান্ত পরিস্থিতিকে শান্ত করতে কয়েকজন অখ্যাত জুনিয়ার কমিশন্ড অফিসার (জে.সি.ও) অমূল্য অবদান রাখেন, তাদের মধ্যে সুবেদার মেজর আনিসুল হক, আবুল বাশার, গিয়াস চৌধুরী, আবদুল দায়ান ও শফিক চৌধুরী প্রমুখর নাম উল্লেখ করার দাবি রাখে। কঠোর পরিশ্রম আর ভালো কাজ করলে কি-না এদেশে শুভাকাঙ্ক্ষী বদলে শত্রু সৃষ্টি হয়, অনেকের চক্ষুশূল হতে হয়। আমার বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হলো না।

ঢাকার ভয়াবহ সেনা বিদ্রোহ স্তিমিত হলো। সৈনিকরা ফিরে গেলো ব্যারাকে। শান্ত হলো পরিবেশ। সর্বত্র শান্তি শান্তি। এবার এক এক করে উদয় হলেন বড় বড় হোতারা। যাদের কারো গায়ে সেনা অভ্যুত্থানের কঠোর দিনগুলোর সামান্য আঁচড়ও লাগেনি। প্রধানত, তাদের ভ্রান্ত আক্রমণাত্মক পলিসির জন্য খামাখাই শান্ত সুন্দর পরিবেশ আবার অশান্ত হয়ে উঠলো। জিয়াও ভ্রান্ত পথে চালিত হল।

আমার পদত্যাগ

'দুই দোস্ত' শওকত আর এরশাদ তখন জোট বেঁধে জিয়াকে আগলে রাখলেন, যেন অন্য কেউ সহজে তাঁর কাছে ভিড়তে না পারে। তাদের প্রভাব খুবই বেড়ে গেল। দেখতে দেখতে সেনাসদরে স্বার্থান্বেষী ক্ষমতালোভী অফিসারদের প্রাসাদ ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেল। এই চক্রের প্রথম শিকার হলাম আমি। শওকত আর এরশাদ দু জনে মিলে জিয়াকে বোঝালেন, লগ এরিয়া কমান্ডার হয়ে কর্নেল হামিদ তার বিদ্রোহী সৈনিকদের

কাছে দারুণ 'পপুলার' হয়ে গেছে। এটা আপনার জন্য ভালো লক্ষণ নয়। আপনি খেয়াল করুন!

সন্দেহপ্রবণ জিয়া। তাঁর মাথায় চক্রান্ত-ভীতিই কিছুদিন ধরে ঢুকে আছে। কান কথায় জিয়া বরাবরই বিভ্রান্ত হয়েছে। কান-কথায় প্রভাবিত হওয়া ছিল তার বড় রকমের স্বভাবগত দোষ। এবারো ব্যতিক্রম হলো না। ওষুধে ধরলো। জিয়া আমাকে সন্দেহ করতে লাগলো।

জিয়ার ফোন আসলো। আমাকে তাঁর অফিসে আসতে বললো। গত ক'দিন ধরে তাঁর কথায় বন্ধুসুলভ আচরণ ছিলো না। তাঁর কামরাতে ঢুকতেই বললো, দেখো হামিদ, সেপাই ইজ সেপাই। এদের সাথে অত মাথামাখি ভালো না। বুঝলে?

আমি বললাম, তা তো বটে। কিন্তু যা বলবার তা আমাকে সোজা বলে দাও।

'হ্যাঁ, তুমি তোমার কমান্ডে ভালো করেছো। কঠোর পরিশ্রম করেছ। আমি খুশি। তবে শওকত আর এরশাদ তোমার ওপর অসন্তুষ্ট। জানি না ওদের সাথে কী ব্যবহার করেছ। তারা শক্ত কমপ্লেইন করেছে।'

'কী কমপ্লেইন করেছে? আমি আমার কাজ করছি। তারা তাদের কাজ করছে। আমার কাজ নিয়ে তাদের মাথাব্যথা হবে কেন? দেখ হামিদ, এসব নিয়ে আমার এই মুহূর্তে ঘাঁটাঘাঁটি করার ধৈর্য নেই। তবে আমি তাদের চটাতে চাই না। বাধ্য হয়েই তোমাকে লগ এরিয়া কমান্ড থেকে সরিয়ে নিতে হচ্ছে।'

'থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।' আমি তাঁর কামরা থেকে উঠে দাঁড়ালাম।

এর ক'দিন পর পত্র পেয়ে গেলাম। আমার স্থলে নতুন লগ এরিয়া কমান্ডার নিযুক্ত হলেন এরশাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু অর্ডিন্যান্স কোরের সাখাতুল বারী, তাকে কর্নেল থেকে ব্রিগেডিয়ার র‍্যাংকে প্রমোশন দেয়া হলো।

প্রায় এক ডজন কর্নেলের প্রমোশন হলো। সর্বত্র হৈ হৈ রৈ রৈ! আমার প্রমোশন আটকে রাখা হলো। আমার জুনিয়ারদের প্রমোশন দেয়া হলো। আমি জেনারেল জিয়ার কাছে গেলাম। তাঁর কামরায় আধ ঘণ্টা কড়া তর্কাতর্কি হলো।

তাঁর সাথে একটা চরম বোঝাপড়ার জন্যই গিয়েছিলাম।

জিয়া আমার কোর্স মেট। আমরা মিলিটারি একাডেমিতে শুধু আড়াই বছর এক সাথেই অধ্যয়ন করি নাই, এরপরেও তাঁর সাথে একত্রে কাজ করেছি। বাংলাদেশ আর্মি হেডকোয়ার্টারে আমি মিলিটারি সেক্রেটারি। জিয়া ডেপুটি চীফ। ডেপুটি চীফের কামরা ছিলো আমার পাশেই। প্রায় প্রতিদিনই কথা হতো। বিকেলে একই সাথে টেনিস খেলা। জিয়ার দুর্দিনে এরা যখন তাকে কৌশলে এড়িয়ে চলতো, তখন আমার সাথে জিয়ার ছিলো খোলামেলা সম্পর্ক। কী আফসোস! চক্রান্তবাজদের কান কথায় জিয়া আমাকে ভুল বুঝলো। তাদের ঘৃণ্য প্ররোচনায় প্রভাবিত হয়ে সে শুধু আমাকে লগ এরিয়া কমান্ড থেকেই সরালো না, আমার নিয়মিত প্রমোশনও আটকে দেয়া হলো। চক্রান্তের কী নগ্ন নমুনা! তার সাথে তুমুল কথা কাটাকাটি হলো।

অনেকক্ষণ বহু কড়া কথা হলো। আমি তার টেবিলে বসে হাতেই আমার 'পদত্যাগপত্র' লিখে দিলাম। জিয়া নরম হয়ে এলো। সে বললো, হামিদ, 'ফর গডস্

সেইক', তুই আমাকে ক'টা দিন সময় দে। বুঝস্ তো আমার সবাইকে সন্তুষ্ট করে চলতে হচ্ছে। এখন আমার পাশে তোর মতো বহু সিনিয়ার অভিজ্ঞ অফিসার দরকার। এই নে তোর পদত্যাগপত্র .... বলেই চিঠিখানা হাতে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে নিচে ঝুড়িতে ফেলে দিলো। আমি বললাম, জিয়া, যে আর্মিতে ইনসাফ নেই, আইনের শাসন নেই, চক্রান্তের শেষ নেই, যে আর্মি চীফ অব স্টাফ অবিচার করে, কাজের মর্যাদা দেয় না, যোগ্যতার মর্যাদা দেয় না, কান-কথায় চলে, সে আর্মিতে আমি আর চাকরি করবো না।

'লুক্ হামিদ, এই সব সেন্টিমেন্টাল কথা রাখ।'

'না জিয়া, প্রমোশন তোমার কাছে ভিক্ষা চাইতে আসিনি। If I am fit, I get it or, I don't ....'

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম, জিয়া বিগড়ে গেল। সেও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। চিৎকার করে বলল, হামিদ, আমার বিশ্বস্ত অফিসাররা প্রমাণসহ বলেছে, তুমি জওয়ানদের কাছে 'পপুলার' হওয়ার চেষ্টা করছো। তোমার সৈনিকগুলোই আমাকে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার কাজে বাধা দিচ্ছে। তুমি কোনো অ্যাকশন নিচ্ছো না। শুধু প্রশ্রয় দিচ্ছো।

আমি বিনীতভাবে বললাম, দোস্ত, তুমি তোমার এসব বিশ্বস্ত অফিসারদের নিয়েই সুখে থাকো। আমাকে রেহাই দাও। তবে আমার 'শেষ' কথাটি মনে রেখো, যারা হঠাৎ উড়ে এসে তোমাকে ঘিরে ধরেছে, তারাই একদিন তোমাকে ফিনিশ করবে। আমার পদত্যাগপত্র ছিঁড়ে ফেলেছো। আমি অফিসে গিয়েই টাইপ করে আবার পাঠাচ্ছি। প্লিজ গ্রহণ করো। তুমি আমাকে শুধু প্রাপ্য পেনশনটি দিও।

জিয়া আজ পরপারে। জানি না আমার কথাগুলো তাঁকে কেউ স্মরণ করাবে কি-না।

অফিসে এসে বহুক্ষণ চিন্তায় নিমগ্ন হলাম। দরজার উপরে রেড লাইট জ্বলতে লাগল। কেউ আসতে পারছিলো না। শুধু আমার পি.এ. আমার পদত্যাগপত্রের ডিক্টেশন নিচ্ছিলো। আমরা সৈনিকদের দোষ দেই, অথচ তুচ্ছ স্বার্থ নিয়ে সিনিয়ার অফিসাররা যেভাবে একে অন্যকে ঘায়েল করার জন্য হিংসাদ্বেষ, কোন্দল, চক্রান্তে লিপ্ত হয়, তা একজন সচেতন মানুষের পক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করাও কঠিন। এসব অন্যায় অবিচারের সাথে আমার বিবেক আর সন্ধি করতে রাজি হলো না। আমি কৃত্রিম পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতে ব্যাকুল হয়ে পড়লাম। আমি আমার লিখিত পদত্যাগপত্র সেদিনই সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানের কাছে আর্মি হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিলাম। জিয়া এরপরেও তা গ্রহণ করতে চায়নি, কিন্তু সে তখন দুই প্রতাপশালী জেনারেলের যাঁতাকলে আবদ্ধ। তাদের ক্রমাগত উস্কানি ও চাপে অবশেষে তা গ্রহণ করলো। কর্নেল আমিনুল হক দুর্যোগের দিনে ৪৬ ব্রিগেডের ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার, আমার আকস্মিক সিদ্ধান্ত শুনে দারুণ মর্মাহত হলো এবং সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বারবার অনুরোধ করলো। তাকে বললাম, জল বহুদূর গড়িয়ে গেছে বন্ধু।

আমি যেদিন আমার লগ এরিয়া হেডকোয়ার্টার থেকে আমার অধীনস্থ সৈনিকদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম তারা যারপরনাই ব্যথিত ও মর্মাহত হলো। সৈনিকদের চোখে ছিল জল। অনেকে প্রকাশ্যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। নতুন লগ এরিয়া কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার সাখাতুল বারী অফিসের দোরগোড়ায় আমাকে বিদায় জানালেন। আমার গাড়ির পতাকা তুলে নিয়ে তার গাড়িতে লাগিয়ে দেয়া হলো। একটি বেদনাভরা পরিবেশের মধ্যে দিয়ে আমি আমার সৈনিকদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

সেপাইদের বিদ্রোহের কারণে সিনিয়ার অফিসারদের ত্বরিত প্রমোশনের যখন অবাধ সুযোগ সৃষ্টি হয়ে গেলো ঠিক সেই মুহূর্তেই আমি ইউনিফর্ম ত্যাগ করে সাধারণ মানুষের কাতারে বেরিয়ে এলাম। এটা ছিলো আমার জন্য ৭ নভেম্বর সেপাই বিপ্লবের বিশেষ উপহার! সুদীর্ঘ ২২ বছরের সৈনিক জীবনের সর্বশেষ প্রাপ্তি!

পদত্যাগের পর আমার জীবনধারা কঠিন হয়ে পড়লো। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে এর আগে আরো তিনজন অফিসার প্রতিবাদ করেন। মেজর জলিল, কর্নেল তাহের ও জিয়াউদ্দিন। তাদেরকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করা হয়। আমিই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম অফিসার যে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে সরকারি চাকরি ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। বেরিয়ে এসেও আমি নিরাপদ ছিলাম না। আমাকে কড়া মূল্য দিতে হয়েছিলো। এরশাদ চক্রের হায়েনারা আমাকে বিপদে ফেলতে বহুদিন সক্রিয় থাকে।

দেখলাম, অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ করার চেয়ে এসব হজম করার ফায়দা অনেক বেশি। ক্ষমতা, প্রমোশন, নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকে। ক্ষমতাধরদের চক্ষুশূল হয়ে থাকতে হয় না। তাদের বন্ধু হয়ে নিশ্চিন্তে বসবাস করা যায়। দরকার শুধু স্রোতের অনুকূলে গা ভাসিয়ে দেয়া।

প্রিয় জেনারেল জিয়া

একদিনের নভেম্বর অভ্যুত্থানের জের কাটতে প্রায় এক মাস সময় লেগেছিল, কিন্তু এই একদিনের অভ্যুত্থান সেনাবাহিনীর দেহের অভ্যন্তরে যে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে গেল, তা মুছে যেতে বহুদিন সময় লাগে। অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসার সাথে সাথে সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে বিপ্লবের চেতনায় প্রভাবিত সৈনিকদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা শুরু হলো। সৈনিকগণ বহিষ্কার, ট্রান্সফার ও বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সম্মুখীন হলো।

সিগন্যাল রেজিমেন্টকে ঢাকার বাইরে পাঠানো হলো। বেঙ্গল ল্যান্সার ইউনিটকে ঢাকা থেকে বগুড়া যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। আর্টিলারি, ৩৮ লাইট এ্যাক্ এ্যাক্ প্রভৃতি ইউনিটে বিবিধ ব্যবস্থা নেয়া হলো। ঢাকার বেশিরভাগ বিপ্লবী সৈনিকদের বাইরে পাঠানো হলো। যারাই ৭ নভেম্বর বিদ্রোহের সাথে জড়িত ছিল তারাই হয়রানির শিকার হলো। যদিও ঐসব অতি উৎসাহী সৈনিকদের বিপ্লবের মাধ্যমেই জিয়া ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

এসব নির্যাতনমূলক ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে আবার ধীরে ধীরে ধূমায়িত হতে থাকে সৈনিকদের অসন্তোষ। দুর্ভাগ্যবশত এই সময় জিয়া এমন ক'জন সিনিয়ার অফিসারদের দ্বারা প্রভাবিত হন, যাদের মনে কস্মিনকালেও সৈনিকদের স্বার্থচিন্তা স্থান পায়নি। বিপ্লবের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল ঢাকার বাইরে বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে। রংপুর, সৈয়দপুর, যশোহর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম। সর্বত্র সংঘটিত হয় একের পর এক সেনা-বিদ্রোহ। এসব জায়গায় জিয়া ঢাকা থেকে হেলিকপ্টারে করে তার পক্ষ থেকে সুবেদার, হাবিলদার এবং সৈনিক প্রতিনিধিদের পাঠিয়ে তাদের শান্ত করতে সক্ষম হন।

জাসদ কর্নেল তাহেরের মাধ্যমে জিয়ার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে কোনোভাবেই লাভবান হয়নি। জিয়া তাদের ১২ দফা দাবি শুধু প্রত্যাখ্যানই করেননি, জাসদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যে নিধন অভিযান চালানো হয়, তাতে হাজার হাজার জাসদকর্মী গ্রেফতার হয়। ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরেও বহু বিপ্লবী জাসদপন্থী সৈনিককে আটক করা হয়। ১৯ নভেম্বর জাসদের মেজর জলিল, রব, শাহজাহান সিরাজ প্রমুখ মুক্তি পেলেও ২৩ নভেম্বর আবার তাদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার হন কর্নেল তাহের। ২১ জুলাই ১৯৭৬-এ ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলে প্রাণ বলি দিয়ে চুকিয়ে দিয়ে যান হিসাব-নিকাশ।

এভাবে যে জাসদ জেনারেল জিয়াউর রহমানের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে ঢুকে পুনঃজাগরণের স্বপ্ন দেখেছিল, শীঘ্র তাদের স্বপ্ন ভেঙে খানখান হয়ে গেলো। বিধ্বস্ত হলো জাসদের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা।

অগণিত সৈনিকের বুক নিংড়ানো দোয়া ও ভালোবাসার মধ্যদিয়ে জেনারেল জিয়ার উত্থান ঘটলেও ৭ নভেম্বরের পর থেকে জিয়া তার অভিজাত পরিষদবর্গ পরিবেষ্টিত হয়ে অতি দ্রুত সৈনিকদের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগলেন। সৈনিকদের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলেন প্রিয় সেনাপতি। অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠলো বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে। একের পর এক সংঘটিত হলো বিদ্রোহ। ৭ নভেম্বর সৈনিকরা তাদের প্রিয় জেনারেলকে গদিতে সমাসীন করার পর সংঘটিত হলো আরো ১৮টি ছোট-বড় সেনা-বিদ্রোহ। ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোহর, রংপুর, সৈয়দপুর, বগুড়া। কতজন প্রাণ হারালো, ফাঁসিতে ঝুললো, জেলে গেল। শত শত পরিবারের কান্নার রোল! সর্বশেষ বিদ্রোহে প্রাণ হারালেন স্বয়ং জেনারেল জিয়া, ১৯৮১ সালে।

হায় ইতিহাস! প্রিয় জেনারেল আজ নেই। আছে সেনাবাহিনী, আছে স্মৃতি!

ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন

১। শতাব্দীর ব্যবধানে সংঘটিত ৭ নভেম্বর সেপাই বিদ্রোহ ছিল যথার্থই একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

১৮৫৭ সালে এই উপমহাদেশে সংঘটিত হয়েছিল সারা ভারতবর্ষব্যাপী এক ভয়াবহ সেপাই বিদ্রোহ মোঘল বাদশাহ বাহাদুর শাহকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা ও ব্রিটিশ শাসককে উৎখাতের লক্ষ্যে। অর্জিত হয়নি সেই লক্ষ্য। ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ বলি দিতে হয় শত শত সৈনিককে। সেপাই বিদ্রোহের সময় ঢাকায় পরাজিত ও ধৃত সেপাইদের ঢাকা ময়দানে (বর্তমানে বাহাদুর শাহ্ পার্ক) প্রকাশ্যে ফাঁসি দেয়া হয়।

এরই ১১৮ বছর পর ১৯৭৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হলো আরেক ঐতিহাসিক সেপাই বিপ্লব। একই স্টাইলে, একই চেতনায়। এই সেপাই-বিদ্রোহে উৎখাত হয়েছিলেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জেনারেল জিয়াউর রহমানের কর্তৃত্ব। শতাব্দীর ব্যবধানে উভয় বিদ্রোহই সংঘটিত হয়েছিল মূলত সৈনিক অসন্তোষকে ভিত্তি করে। বিদ্রোহের মূল চালিকাশক্তি ছিল সাধারণ সৈনিকবৃন্দ, অফিসারগণ নয়। ৭ নভেম্বরের প্রধান লক্ষ্য ছিল–

(ক) খালেদ-শাফায়েত অক্ষ-শক্তির উৎখাত।

(খ) জিয়াউর রহমানের মুক্তি ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

(গ) বিপ্লবী সৈনিকদের ১২-দফার ভিত্তিতে শ্রেণিহীন সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠা।

অভ্যুত্থানের প্রথম দুটি লক্ষ্য সহজে অর্জিত হয়। তৃতীয় লক্ষ্য অর্জনে বিপ্লব ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে বিপ্লবের প্রধান নেতা লেঃ কর্নেল (অবঃ) আবু তাহের বৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকার উৎখাতের অভিযোগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

২। বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে তৎকালে প্রধান ইউনিটগুলো ছিল : টু-ফিল্ড আর্টিলারি, ১ম বেঙ্গল ল্যান্সার, ৩৮ লাইট এ্যাক এ্যাক রেজিমেন্ট, টু-ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়ন, সিগন্যাল ব্যাটালিয়ন, সাপ্লাই ব্যাটালিয়ন, সেন্ট্রাল অর্ডিন্যান্স ডিপো, বেইজ, ওয়ার্কশপ ইউনিট, এম.পি. ইউনিট, মেডিক্যাল ব্যাটালিয়ন, সিএমএইচ বেইজ সাপ্লাই ডিপো, আর্মি হেডকোয়ার্টার ব্যাটালিয়ন, স্ট্যাটিকস্ সিগন্যাল ইউনিট, স্টেশন হেডকোয়ার্টার ও লগ এরিয়ার অন্যান্য ক্ষুদ্র ইউনিটগুলো।

৪৬ ব্রিগেডের ৪টি ব্যাটালিয়ন মোটামুটি খালেদের পক্ষে থাকলেও পরবর্তী ৬/৭ তারিখ মধ্যরাতের পর সবাই অবশ্য জিয়ার পক্ষে যোগদান করে জিয়ার হাত শক্তিশালী করে। এয়ার ফোর্স ও নেভির কোনো ভূমিকা ছিলো না। পরে অবশ্য নেভীর কিছু সৈনিক যোগ দেয়।

এদের সাথে বাইরে থেকে যোগ দিয়েছিল কর্নেল আবু তাহেরের নেতৃত্বে জাসদের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার কয়েকশত সশস্ত্র সদস্য। মূলত সামগ্রিকভাবে অভ্যুত্থান প্লান করেন কর্নেল তাহের; ক্যান্টনমেন্টের বিভিন্ন ইউনিটের সৈনিক, এনসিও এবং জেসিও-দের সাথে সমন্বয় করে।

৩। সাধারণভাবে মনে করা হয়, পঁচাত্তরের ৭ নভেম্বর কর্নেল তাহের তার বিপ্লবী সৈনিকদল নিয়ে জিয়াকে বন্দি দশা থেকে উদ্ধার করে ক্ষমতার গদিতে বসান। ধারণাটা পুরোপুরি সত্য নয়। প্রকৃত ঘটনা হলো, জিয়াকে বন্দিদশা থেকে উদ্ধারের ব্যাপারে কর্নেল তাহেরের প্ল্যান প্রোগ্রাম অনুযায়ীই অভ্যুত্থান ঘটে, তবে প্রকৃত অভিযানে শুধু জাসদের বিপ্লবী সৈনিকরাই অংশ নেয়নি। টু-ফিল্ড, ইঞ্জিনিয়ার্স, এ্যাক্ এ্যাক্ রেজিমেন্ট, লগ এরিয়ার সিগনালস, ইএমই, মেডিকেল সাপ্লাই ব্যাটালিয়ন, অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি ইউনিটগুলোও অংশগ্রহণ করে। বলা যায়, অভিযানটি ছিল বিপ্লবী সংস্থা ও সেনা ইউনিটগুলোর যৌথ অভিযান। সেনা ইউনিটগুলোর নেতৃত্ব দিয়েছিল প্রধানত জেসিও এবং এনসিও'রা।

অভ্যুত্থানের পরপরই মধ্যরাতে তাহের ও জিয়া গদি দখলের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হন। ঐ সময় দুজনের যেকোনো একজন নিহত হতে পারতেন। আশেপাশে ছিল অস্ত্রের ঝনঝনানি। চূড়ান্ত মুহূর্তে ক্ষমতা দখলের Tag-of-war-এ জিয়া জয়ী হন; প্রধানত টু-ফিল্ড রেজিমেন্ট ও ফোর-ইস্ট বেঙ্গলের অফিসার ও সৈনিকদের প্রত্যক্ষ মদদে। জিয়া বন্দিদশা থেকে মুক্ত হন সৈনিক বিপ্লবীদের যৌথ প্রচেষ্টায়। তিনি ক্ষমতার গদিতে অধিষ্ঠিত হন। ছলে, বলে, কৌশলে, নিজ বুদ্ধি ও ক্ষমতা বলে। তাহেরের দয়ায় নয়, বরং তাহেরকে পরাজিত করে।

৪। ৭ নভেম্বরের সেপাই বিপ্লবে বারবার জনতার নাম যুক্ত হলেও প্রাথমিক পর্যায়ে বিপ্লব সংঘটিত করতে অথবা জিয়াকে মুক্ত করতে জনতার কোনো হাত ছিলো না। শুধু বিপ্লব সফল হওয়ার পর ৭ নভেম্বরে সকালে ক্যান্টনমেন্ট থেকে মিছিলকারী ধাবমান সৈনিকদের সাথে জনতার সংযোগ ঘটে। শুরু হয় একত্র আনন্দ, উল্লাস। বলা যেতে পারে, সেই মুহূর্ত থেকে সৈনিক বিদ্রোহ রূপান্তরিত হয় ঐতিহাসিক সেপাই-জনতার বিপ্লবে।

৫। ৭ নভেম্বরের অভাবনীয় সাফল্য সম্ভব হয়েছিল সৈনিক অসন্তোষকে পুঁজি করে। ১৫ অগাস্ট অভ্যুত্থানের দিন থেকে অফিসারদের অত্যধিক বাড়াবাড়িতে সৈনিক অসন্তোষ চরমে ওঠে। সর্বশেষ চীফ অব স্টাফ জিয়াউর রহমানকে বন্দি করে ব্রিগেডিয়ার খালেদের ক্ষমতায় আরোহণ সৈনিক অসন্তোষকে আগ্নেয়গিরিতে পরিণত করে। ফলে দরকার ছিল একটি স্ফুলিঙ্গ এর যা ৬/৭ তারিখের মধ্যরাতে জাসদের বিপ্লবী গ্রুপ প্রজ্জ্বলিত করতে সক্ষম হয়। অগ্ন্যুৎপাত বিস্ফোরিত হয় তৎক্ষণাৎ।

৬। ৭ নভেম্বরের বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে তাহেরের সাথে জেনারেল জিয়ার গোপন সমঝোতা সেপাই বিদ্রোহকে হিংসাত্মক বিপ্লবে রূপ দেয়। তাহেরের সাথে জিয়ার কোনো সমঝোতা ছিল একান্তভাবে তাঁদের প্রাইভেট ব্যাপার।

মুক্ত হওয়ার পর জিয়াকে টু-ফিল্ডে নিয়ে আসা হয়। জিয়াকে ঘিরেই তখন সৈনিকদের, অফিসারদের যত আনন্দ উচ্ছ্বাস। তাদের কাছে হঠাৎ করে তাহেরের নাম ছিল বিভ্রান্তিকর। জিয়ার মুক্তির সাথে তাহের অথবা তাহেরের গোপন বিপ্লবী সংস্থার জড়িত থাকার কথা তখন কেউ কিছুই জানে না। মধ্যরাতের ঐ ঘটনাবহুল মুহূর্তে জিয়াকে ঘিরে প্রকৃত সৈনিকদের আবেগ-উল্লাসে তাহেরের শক্তি শীঘ্র টলমলে হয়ে ওঠে। জিয়ার শক্তি প্রবল হয়ে ওঠে। জিয়া তাহেরের দেয়া ১২ দফা মানতে অস্বীকার করেন। তাহেরের নির্দেশ মানতেও অস্বীকার করেন। শুরু হয় প্রবল দ্বন্দ্ব। টু-ফিল্ড ইউনিটে অফিসার জওয়ান পরিবেশিত হয়ে জিয়াই তখন শক্তিশালী। যদিও ঐ সময় কিছুক্ষণের জন্য মনে হয়েছিল তাহেরের বিপ্লবী গ্রুপই বুঝি পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রক। ঐ দিন গভীর রাত্রি ২টায় তাহেরের প্রবল চাপে পড়ে জিয়া যদি ক্যান্টনমেন্টের বাইরে চলে যেতেন, তাহলে নভেম্বরের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হতো। জিয়া ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে অফিসার ও সৈনিক পরিবেষ্টিত হয়েই টু-ফিল্ডে নিরাপদ অবস্থানে থাকেন। এইভাবে তাহেরের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। মধ্যরাতে অভ্যুত্থানের দুই

প্রধান নেতার ক্ষমতার নীরব দ্বন্দ্বে জিয়াই জিতে গেলেন। পরাজিত হলেন কর্নেল তাহের।

৭। চরম মুহূর্তে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে তাহের যখন দেখলেন তার হাত থেকে ক্ষমতার মসনদ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, তখনই শুরু করা হয় অফিসার নিধন অভিযান, চরম ও সর্বশেষ পন্থা হিসাবে ৭/৮ নভেম্বরের রাত ছিল বিভীষিকার রাত। এই নির্মম পদক্ষেপ ক্যান্টনমেন্টে ব্যাপক ভয়-ভীতির সৃষ্টি করলেও জিয়াকে ক্ষমতার আসন থেকে উৎখাত করতে ব্যর্থ হয়। বরং পরবর্তীতে এই অভিযোগের কারণেই তাহেরকে ফাঁসিতে ঝুলতে হয়।

৮। তাহের সক্রিয় কমান্ডার ছিলেন না। তিনি জেনারেল জিয়ার কাঁধে বন্দুক রেখে তাঁকে ব্যবহার করে ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু জিয়া তার চেয়ে অধিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও চালাক হওয়ায় তার উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। বরং জিয়াই তাকে পূর্ণ ব্যবহার করে তার অনুকূলে নভেম্বর অভ্যুত্থান ঘটাতে সক্ষম হন। তাহের জিয়াকে হিসাব করতে ভুল করেছিলেন।

প্রশ্ন ওঠে, জিয়া নিয়মতান্ত্রিক প্রফেশন্যাল সেনাপ্রধান হয়ে কেন তাহেরের গোপন বিপ্লবী সংস্থার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ালেন? সেনাবাহিনীর নীতিমালার দৃষ্টিতে এটা কতটুকু ন্যায়সঙ্গত হয়েছিল? নভেম্বরের রক্তপাতের জন্য কী জিয়াই দায়ী?

৯। ইতিহাসই এসবের জবাব দেবে। সেপাই বিদ্রোহ ১৮৫৭ সালে সেপাইদের অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন আনেনি। ১৯৭৫ সালের সেপাই বিদ্রোহেও সেপাইরা বিশেষ কোনো লাভবান হয়নি। অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। সাধারণ সৈনিকদের কাছে শ্রেণিহীন সেনাবাহিনীর শ্লোগান ততো আকর্ষণীয় না হলেও তারা অন্তত আমলাতান্ত্রিক অভিজাত শ্রেণির সেনাকাঠামো ও দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা পরিবর্তন কামনা করেছিল। তা মোটেই হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, কোনো একটি অসন্তোষকে পুঁজি করে সৈনিক বিদ্রোহ সংঘটিত হলেও পেশাদার সেনাবাহিনীতে সৈনিকদের নেতৃত্ব-কাঠামো না থাকাতে তারা কোনোদিন নেতৃত্ব দিতে পারে না, ফলে শেষ পর্যন্ত তাদের অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়। এজন্যই জাসদ শ্রেণিহীন সেনাবাহিনীর ওপর গুরুত্ব দিচ্ছিলো।

১০। সৈনিকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অস্ত্র সমর্পণের পর নমনীয় মনোভাব প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু সেপাই বিদ্রোহের পরবর্তী সময়ে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে আসতে না আসতেই জিয়া কিছু ক্ষমতালোভী স্বার্থান্বেষী অফিসারের ভুল পরামর্শে সহনশীলতা ও নমনীয় নীতির পরিবর্তে সৈনিকদের বিরুদ্ধে শাস্তি, বদলিসহ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা শুরু করলে আবার চতুর্দিকে সৈনিক অসন্তোষ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে ছোট বড় আরো বহু বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। শত শত সৈনিক এতে প্রাণ হারায় অথবা ফাঁসিতে ঝুলে নির্মম মৃত্যুবরণ করে। অথচ সামান্য ধৈর্য, সহানুভূতি ও সহনশীলতার পরিচয় দিলে এসব দুঃখজনক ঘটনা এড়ানো সম্ভব হতো। কিন্তু সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমানের ভ্রান্ত নীতিতে দেশের সর্বত্র সেনা বাহিনীতে ব্যাপক রক্তপাত ও অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে, যা স্তব্ধ করতে ছল, বল,

হত্যা ফাঁসি এসব কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থার আশ্রয় নিতে হয়। এসবই ছিল দুঃখজনক, অনভিপ্রেত।

১১। সময় ও পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অনুকূলে থাকায় বিপ্লবের পরিধি ব্যাপক আকার ধারণ করে। ফলে জাসদের সীমিত গণ্ডি ছাড়িয়ে সর্বত্র ইসলামিক ভাবাপন্ন জনতার মধ্যে আগুনের মতো তা ছড়িয়ে পড়ে। তখন এটা গণ-অভ্যুত্থানের রূপ নেয়। আর জিয়া হয়ে পড়েন সকল ধ্যান-ধারণার কেন্দ্রবিন্দু। প্রবল আবেগের স্রোতে জনতার ওপর জাসদ ও তাহেরের নিয়ন্ত্রণ ভেস্তে যায়। পরিস্থিতির মহানায়ক হিসাবে আবির্ভূত হন জিয়াউর রহমান। জাসদের যে লক্ষ্য ছিল সৈনিক জনতার আবগকে জাসদের শ্রেণি সংগ্রামের দিকে প্রবাহিত করা, তা ব্যর্থ হয়।

১২। যুদ্ধ জয়ে যেমন জনসমর্থন অপরিহার্য, ঠিক তেমনি যে কোনো সেনা-অভ্যুত্থানেও জন-সমর্থন একটি অপরিহার্য অঙ্গ। ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও একাত্মতা প্রকাশ অভ্যুত্থানকে সেপাই-জনতার অভ্যুত্থানে পরিণত করে।

দেশের সাধারণ মানুষ হিংসা, রক্তপাত, হত্যা পছন্দ করে না। তাই জাসদের বিপ্লবী গ্রুপ কিছু মিটিং মিছিল করে হিংসাত্মক শ্রেণি সংগ্রামের আহ্বান জানালেও তা বৃহত্তর জনসমর্থন পায়নি। যদি পেতো, তাহলে নভেম্বর অভ্যুত্থানের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো।

জনতার তাৎক্ষণিক উল্লাস ছিলো 'নাজাত' বা মুক্তির। একটি হিংসাকে ঢাকতে আর একটি হিংসাত্মক বিপ্লব শুরু করার জন্য নয়। এখানেই জনগণের ইচ্ছার চেতনার প্রভাব পড়েছিল সৈনিক বিপ্লবের ওপর। তা না হলে সেপাই বিপ্লবের স্রোত হিংসাত্মক খাতে প্রবাহিত হয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করতো। জনগণের সদিচ্ছাই উত্তেজিত সৈনিকদের সঠিক পথে থাকতে প্রভাবিত করেছিল। সুস্থ চিন্তাধারার সৈনিকদের হাত শক্তিশালী করেছিল।

এখানে সূচিত হয় 'জনতার জয়'!

১৩। সিপাহী বিপ্লবে একমাত্র ব্যক্তি যিনি লাভবান হয়েছিলেন তিনি হলেন জেনারেল জিয়াউর রহমান ও তার কিছু ধূর্ত পার্শ্বচর। সিপাহীদের তৎপরতায় একটি রক্তাক্ত বিপ্লবের মাধ্যমে নিরংকুশ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হন জিয়াউর রহমান। ধূলিস্মাৎ হয়ে যায় মোশতাক-ওসমানী-খলিল চক্র, খালেদ-শাফায়াত চক্র, ফারুক-রশিদ চক্র এবং কর্নেল তাহের ও তার বিপ্লবী গ্রুপ। জিয়া অনিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সৈনিকদের ব্যবহার করলেন তার নিজ স্বার্থে, নিজ ক্ষমতা, সুসংহত করতে ও তার প্রতিপক্ষদের নিশ্চিহ্ন করতে। সফল হলো তাঁর মিশন।

এবার ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিপতি জিয়াউর রহমান।

ক্ষমতায় আরোহণ করার পর জিয়া সৈনিকদের প্রতি প্রদত্ত কোনো প্রতিশ্রুতিই বাস্তবায়ন করলেন না। বিক্ষুব্ধ সৈনিকগণ। পরবর্তীতে তাদের ওপর নৃশংসভাবে দমননীতির স্টীম রোলার চালিয়ে জিয়া হত্যা করেন দুই হাজারের অধিক সৈনিক ও বিমান সেনা। জেল জুলুম আর চাকরিচ্যুতি ঘটে আরো হাজার দুয়েক সৈনিকের।

হায় ৭ নভেম্বর! অসংখ্য স্বজনহারা সেনা পরিবারের কান্না বিজড়িত এক ঐতিহাসিক দিবস ৭ নভেম্বর। এক আবেগময় বিপ্লবের মাধ্যমে সৈনিকরা প্রতিষ্ঠিত করেছিল তাদের প্রিয় জেনারেলকে সিংহাসনে, কিন্তু প্রতিদানে তারা পেলো জেল, জুলুম, হত্যা, ফাঁসি, চাকরিচ্যুতি, বিতাড়ন, নিপীড়ন।

হাজার হাজার নিরপরাধ আত্মার আর্তনাদ আজও কেঁদে ফেরে ঢাকা সেনানিবাসের আকাশে বাতাসে। তাদের স্বজনরা আজও খুঁজে ফিরে প্রিয়জনদের লাশ। কেউ শুনেনি তাদের ফরিয়াদ, তারা পায়নি বিচার।

হায় অভিশপ্ত ঢাকা সেনানিবাস! স্বাধীনতার দিনগুলোতেও এখানে অঝোরে ঝরেছিলো রক্ত, আত্মাহুতি দিয়েছিল কত নিরীহ প্রাণ। স্বাধীনতার পর আজও বন্ধ হয়নি নিরীহ মানুষের রক্ত নিয়ে ক্ষমতা লোভীদের হানাহানি, কাড়াকাড়ি। শত শত নিরীহ প্রাণের আত্মাহুতি। পদদলিত মানবতা। দুর্বলের আর্তনাদ!

আজও নীরবে, নিভৃতে কেঁদে ফেরে এখানে বিচারের বাণী!

বিপ্লবীরা কেন এলো জিয়াকে উদ্ধার করতে?

৭ নভেম্বর ১৯৭৫ বিপ্লবের রাতে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সৈনিক ও বিপ্লবীরা মিশে একাকার হয়ে গেলো। সেপাই বিপ্লবের ছত্রছায়ায় এত বিপুল সংখ্যক সশস্ত্র বিপ্লবী সৈনিকদের ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে খোলামেলা উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ ছিলো এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। এসব দৃশ্য আগে কখনো কল্পনাও করা যায়নি।

প্রকৃত ঘটনা হলো, ১৫ অগাস্টের পর থেকেই জিয়া এবং জাসদের বিপ্লবী গ্রুপের নেতা কর্নেল তাহেরের যোগাযোগ বেড়ে যায়। তাহেরের বিপ্লবী গ্রুপকে জিয়া তাঁর আস্তিনের ভেতরে 'SECRET WEAPON' বা 'গোপন অস্ত্র' হিসেবে ব্যবহার করেন। খালেদ-শাফায়েতের উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝতে পেরে আগেভাগেই জিয়া তাহেরের সাথে গোপন সমঝোতায় আসেন। তাহেরও উচ্চাকাঙ্ক্ষী অফিসার ছিলেন। তিনি তার লালিত বিপ্লব ১২ দফার ভিত্তিতে জিয়াউর রহমানকে সাথে নিয়ে বাস্তবায়নের স্বপ্ন দেখেন। যদিও জিয়া কোনোদিনই শ্রেণিহীন সেনাবাহিনীর Concept-এর ধারে-কাছেও ছিলেন না। সুযোগ সুবিধা মতো তার নিজের স্বার্থে তাহেরের বিপ্লবী গ্রুপকে ব্যবহারের চিন্তা-ভাবনাই করছিলেন।

৪৬ ব্রিগেড কর্তৃক বন্দি হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে জিয়া বন্ধুবর তাহেরকে সংবাদ পাঠাতে সক্ষম হন এবং তাঁকে উদ্ধার করার অনুরোধ জানান। তাহেরের বিপ্লবী গণ-বাহিনীর সদস্যরা তৎক্ষণাৎ একটি অভ্যুত্থানের প্ল্যান করে। ঢাকা সেনানিবাসে বিভিন্ন ইউনিটের সৈনিকদের সাথে আগে থেকেই তাদের সংযোগ ছিল। প্রায় প্রতিটি ইউনিটে তাদের নিয়মিত রিক্রুটও ছিলো। কর্নেল তাহেরের নির্দেশে জাসদের বিপ্লবী গণ-বাহিনী দলের সদস্যরা নির্ধারিত দিনে দ্রুত ঢাকা সেনানিবাসের চারিদিকে বিভিন্ন পয়েন্টে সমবেত হয়। পূর্ব সমঝোতার ভিত্তিতেই তারা ক্যান্টনমেন্টে ছুটে আসে। জিয়াকে মুক্ত করার বিপ্লবকে পুঁজি করে কর্নেল তাহের তার সশস্ত্র বিপ্লবী বাহিনী নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে ব্যাপক সেনা-বিদ্রোহ ঘটাতে চান। তার বিপ্লবীরা খাকি পোশাকে ক্যান্টনমেন্টের সর্বত্র অবাধে

ঘোরাফেরা করে সাধারণ সৈনিকদের সাথে মিশে গিয়ে অফিসারদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে ধরার আহ্বান জানাতে থাকে।

৭ নভেম্বর জিয়াকে মুক্ত করে আনলেও বিপ্লব কিন্তু সেখানেই থেমে গেলো না। এবার 'অফিসারের রক্ত চাই' শ্লোগানে অফিসারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য বিপ্লবের ২য় পর্বের সংগ্রাম শুরু করা হয়। এভাবেই ৭ নভেম্বর মহান সেনা-বিপ্লব হঠাৎ করে এক খাত থেকে অন্য খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করে।

তাহেরের লক্ষ্য ছিল জিয়াকে ক্ষমতাহীন পুতুল-সম্রাট করে নিজেই আসল ক্ষমতা কুক্ষিগত করা। কিন্তু ক্ষমতার লড়াইয়ে মধ্যরাতেই তার সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। জিয়া তাহেরের কাছে মাথা নত করতে এবং পূর্ব শর্তসমূহ মানতে অস্বীকার করেন। তিনি দ্রুত তাঁর সেনা অফিসার ও সেনা ইউনিটদের সমর্থন নিয়ে টু-ফিল্ডে শক্ত ঘাঁটি তৈরি করে ফেলেন। অতঃপর 'পরাজিত উদ্ভ্রান্ত তাহেরের' অফিসার নিধন অভিযান শুরু হলো। কিন্তু তাও ব্যর্থ হলো। অনর্থক রক্তপাত, হত্যাকাণ্ড সেনাবাহিনীর প্রকৃতি কোনো সৈনিক, NCO ও JCO-দের সমর্থন পায়নি। ফলে তা বেশিদূর এগোতে পারেনি। বিপ্লবীদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকলেও সাধারণ সৈনিকগণ ছিল এ সবের ঊর্ধ্বে। তাদের অভিযোগ অনুযোগ ছিল, কিন্তু কোনো রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিলো না। তাই সৈনিক বিপ্লব রাজনৈতিক বিপ্লবে রূপ নিতে পারেনি।

৭ নভেম্বর রাতে এ ধরনের জটিল অবস্থা সৃষ্টির জন্য তাহের এবং জিয়াউর রহমান উভয়েই সমভাবে দায়ী। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে অনর্থক নিরংকুশ ক্ষমতা অর্জনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা না থাকলে, এসব অবস্থার সৃষ্টি হতো না। তাই দেখা যায়, তিন তিনটি রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের পেছনেই উচ্চাভিলাষী অফিসারদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাই দায়ি। জিয়ার আহ্বানেই তাঁকে উদ্ধার করতে তাহেরের বিপ্লবী সৈনিকদল ক্যান্টনমেন্টে ছুটে আসে। কিন্তু সাফল্যের পর পরবর্তী কার্যক্রমের প্রশ্নে উভয় নেতার মধ্যে ঘটে তীব্র মতানৈক্য। ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে শুরু হয় দ্বন্দ্ব সংঘাত, রক্তপাত। ৭ থেকে ১০ নভেম্বরের ভয়াবহ দিনগুলো কাটে চরম বিভ্রান্তি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে। দিনরাত জিয়া জাসদ ও বিপ্লবী নেতাদের সাথে টানা আপস আলোচনার আড়ালে ক্যান্টনমেন্টে সৈনিকদের মঝে তার নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করতে থাকেন। তিনি কূট কৌশল অবলম্বন করে জেসিও, এনসিওদের তাঁর স্বপক্ষে টানতে সক্ষম হন। জিয়া দ্রুত তাঁর অনুগত অফিসার ও কিছু সৈনিক নেতাদের মাধ্যমে টু-ফিল্ড, ফোর বেঙ্গল ও যশোহর থেকে আনা কমান্ডো সৈনিকদের তাঁর চারপাশে একত্র করে শক্ত দুর্গ সৃষ্টি করেন। এভাবে তিনি তাহেরের বিপ্লবীদের প্রচ- চাপ তাৎক্ষণিকভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম হন। রক্তক্ষয়ী পরিণাম থেকে তখনকার মতো রক্ষা পায় ঢাকা সেনানিবাস। তাড়িয়ে দেয়া হয় তাহেরের বিপ্লবীদের। ফিরে আসে স্বস্তি। ভেঙে যায় তাহেরের স্বপ্ন।

এ প্রসংগে গত ৭ নভেম্বর ২০০৫ তারিখে দেয়া বেগম খালেদা জিয়ার ছোট ভাই সাইদ ইসকান্দারের টিভি ইন্টারভিউ ছিল অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। তিনি মন্তব্য করেন ৭

নভেম্বরের সার্বিক অপারেশন ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম INTELLIGENCE (গোয়েন্দা) অপারেশন। এর আগে কখনও কেউ এত নিপুণ দক্ষতায় এরকম জটিল অপারেশন করতে পারেননি। ভেতরের ব্যাপার আমি আরো অনেক কিছু জানি।

সেপাই বিদ্রোহ : পরবর্তী সময়কাল

ঢাকার সেপাই বিদ্রোহ নভেম্বরের শেষ সপ্তাহের মধ্যেই স্তিমিত হয়ে যায়। তবে এর উত্তাপ সহজে শেষ হয়নি। বিদ্রোহ পরবর্তী দিনগুলোতে জিয়া অতি দ্রুততার সঙ্গে তাঁর সিভিল-মিলিটারি ক্ষমতা সুসংহত করতে সক্ষম হন। জাসদকে এবং জাসদের বিপ্লবী সংস্থাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে মেরুদণ্ডহীন করে দেন। সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহী সৈনিকদের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বিভিন্ন ইউনিটে সৈনিকরা অবশ্য শান্ত হয়েই এসেছিল, কিন্তু জিয়ার প্রশাসনযন্ত্র অস্থির হয়ে ওঠে।

সৈনিকরা ঐতিহাসিক বিপ্লবের মাধ্যমে জিয়াউর রহমানকে ক্ষমতার আসনে বসানোর পর স্বভাবতই তারা তার পক্ষ থেকে সহানুভূতিশীল নীতিমালা ও ব্যবহার আশা করেছিল, কিন্তু তাদের আশা নিরাশায় পরিণত হয়। কার্যত দেখা গেলো, জিয়া একের পর এক সৈনিকদের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে কঠোর শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। এ সময় জিয়া কিছু অভিজাত শ্রেণির অফিসারদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে প্রভুত্বসুলভ আপসহীন নীতিমালা গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে বেঙ্গল ল্যান্সার ও সিগন্যাল রেজিমেন্টকে ঢাকার বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তারা এখন দেখতে পেল এসব মুভ কোনো টেকনিকেল মুভ নয়, তাদের দুর্বল ও বিভক্ত করার জন্যই এসব ব্যবস্থা। তাদের চরম অসন্তোষকে কেন্দ্র করে ফারুক, রশিদ, পাশা, ডালিম এরা দেশে ফিরে নানাভাবে আবার সেনা-বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে তোলার প্রচেষ্টা চালায়। চাপা অসন্তোষ ঢাকার বাইরে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

ঢাকা, বগুড়া, সাভার, চট্টগ্রাম, রংপুর, কুমিল্লা, যশোহর, দয়ারামপুর ও অন্যান্যস্থানে একের পর এক বিদ্রোহ ঘটতে থাকে। জিয়াকে উৎখাত করতে আরো প্রায় ১৮টি ছোট বড় বিদ্রোহ সংঘটিত হলো। অবশ্য জিয়া এখন সর্বোচ্চ ক্ষমতায় আরোহণ করে আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। এসব বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহ দমন করতে তাকে খুব বেশি একটা বেগ পেতে হয়নি। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ বিদ্রোহ ছিলো ১লা অক্টোবর অনুষ্ঠিত বিদ্রোহ এবং বগুড়া ক্যান্টনমেন্টের বিদ্রোহ।

রংপুরেও সৈনিকরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। রংপুরে কর্নেল মান্নাফকে পাঠানো হলো ব্রিগেড কমান্ডার হিসাবে। সৈনিকরা তাকে গ্রহণ করলো না। তাকে ফিরে যেতে বললো। উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে সুবেদার মেজর আনিস ও গিয়াসকে হেলিকপ্টারে পাঠানো হলো সেপাইদের শান্ত করার জন্য। এতে কাজ হলো। রংপুরে সৈনিকরা বেশ কিছু অফিসারকে ধরে কোয়ার্টার গার্ডে বন্দি করে রাখে। সুবেদার মেজর আনিস ও গিয়াসরা তাদের উদ্ধার করেন। পরে কর্নেল হান্নাহ শাহ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। দয়ারামপুর, সৈয়দপুরেও যথেষ্ট গণ্ডগোল হয়। এসব স্থানে সৈনিকরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠলে বহু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। অফিসারদের হেস্তনেস্ত করা হয়।

চট্টগ্রামে সৈনিক বিদ্রোহ বেশ প্রকট আকার ধারণ করে। বহু অফিসার বিদ্রোহী সৈনিকদের হাতে লাঞ্ছিত হন। অফিসারগণ তাদের ফ্যামিলি নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। নৌবাহিনীর ঘাঁটিতে বিদ্রোহী সৈনিকদের হাতে ক'জন অফিসার নিহত হন। ছল, বল, কৌশল অবলম্বন করে জেনারেল জিয়াউর রহমান চতুর্দিকে প্রজ্জ্বলিত বিদ্রোহের আগুন নেভাতে সক্ষম হলেন। অফিসারদের কর্তৃত্ব আবার প্রতিষ্ঠিত হলো। এই সময় জেনারেল এরশাদ তাঁর পদপার্শ্বে থেকে তাঁর ছত্রছায়ায় পরম অনুগত ও বিশ্বস্ত অফিসার হিসাবে নিজ যোগ্যতার প্রমাণ দেন।

পরবর্তীকালে অবশ্য এই নম্র, বিনীত ও গোবেচারা অফিসারটিকেও ক্ষমতার গন্ধে রক্তনেশায় পেয়ে বসে। ১৯৮১ সালে একটি আকস্মিক সেনা-অভ্যুত্থানে নিহত হলেন প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান। নিহত হন জেনারেল মঞ্জুর। এক ঢিলে দুই পাখি কতল! পরিষ্কার পথে হেলেদুলে এগিয়ে এসে ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করলেন লেঃ জেঃ হুসাইন মুহম্মদ এরশাদ। শুরু হলো ষড়যন্ত্র ও প্রাসাদ রাজনীতির আর এক অধ্যায়।

উনিশ 'শ পঁচাত্তর সালে অগাস্ট অভ্যুত্থানের পর থেকেই সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে ক্ষমতার কোন্দলের বিষ-বৃক্ষ দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ৭ নভেম্বরের পর থেকে তা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। বলাবাহুল্য, সকল দেশে, সকল ক্ষেত্রে মিলিটারি কমান্ডারের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষই সকল সেনা-অভ্যুত্থানের মূল কারণ। বাংলাদেশেও কতিপয় সামরিক অফিসারের উচ্চাভিলাষ দেশ ও জাতিকে ঠেলে দেয় সেনা অভ্যুত্থান ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতা মঞ্চে।

বলা যেতে পারে সব বিদ্রোহের মূল উৎস ছিল ৭ নভেম্বরের সেপাই বিপ্লব। তখন সৈনিকদের সমস্যাগুলো সততা ও সহানুভূতির সাথে বিবেচনা না করে, কঠোর দমননীতির পথ অবলম্বন করাতেই পরবর্তী দিনগুলোতে এরকম অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হলো।

জিয়াউর রহমান সাধারণ সৈনিকদের কাছে জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। সৈনিকদের সদিচ্ছা, সমর্থন ও বিশ্বস্ততা আদায় করার জন্য তাঁর মতো জনপ্রিয় জেনারেলের জেল ফাঁসি ও কঠোর শক্তি প্রয়োগের কোনো দরকার ছিল বলে আমি তখনো মনে করিনি, আজও মনে করি না। চরম সন্ধিক্ষণে কয়েকজন স্বার্থান্বেষী উচ্চাকাঙ্ক্ষী অফিসার জোট বেঁধে জিয়ার চারপাশে 'লৌহ জাল' (Iron curtain) সৃষ্টি করে তাদের নিজ স্বার্থে জিয়াকে দমননীতি, হঠকারিতা ও আক্রমণাত্মক পথে পরিচালিত করে, যার ফলশ্রুতিতে জাতিকে এবং সেনাবাহিনীকে করুণ মূল্য দিতে হয়।

বগুড়ার বিদ্রোহ

১৯৭৬ সালের মার্চ মাসে প্রথমে কর্নেল রশিদ, তারপর ফারুক সবার চোখে ধুলো দিয়ে আবার ঢাকায় এসে উপস্থিত হয়। রাজধানীর পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ইতিপূর্বে জিয়া বেঙ্গল ল্যান্সার ইউনিটকে দু-ভাগে ভাগ করে ১৪টি ট্যাংক ও ৫০০ সৈন্য বগুড়ায়

পাঠিয়ে দেন। বাকি অর্ধেক ১৪টি ট্যাংক ও ৪০০ সৈন্য নিয়ে সাভারে ফার্স্ট ক্যাভালরি গঠন করেন। ফারুক ঢাকায় পৌঁছার সাথে সাথে সাভারে অবস্থিত ক্যাভালরির সৈনিকগণ আবার উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তারা কর্নেল ফারুককে এয়ারপোর্টে এসে বরণ করে।

অতঃপর বগুড়ার ল্যান্সার সৈনিকগণ কর্নেল ফারুককে তাদের কাছে পাঠাবার জোর দাবি জানায়। জিয়া বাধ্য হয়ে একান্ত অনিচ্ছায় কড়া নিরাপত্তা গ্রহণ করে ফারুককে বগুড়া যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। এবার ফারুককে পেয়ে বেঙ্গল ল্যান্সারের সৈনিকগণ পঁচাত্তর সালের মতোই গর্জে উঠল। তারা ঢাকায় মার্চ করে জিয়াকে উৎখাত করতে হাতিয়ার ধরে বসলো। জিয়া আবারো মহাবিপদে। তিনি বগুড়ার পদাতিক বাহিনী বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে তাদের ঘেরাও করে রাখলেন। এরপর এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি ফারুকের বাবা অবসরপ্রাপ্ত মেজর রহমানের স্মরণাপন্ন হলেন। আন্তরিক আলোচনার পর তিনি হেলিকপ্টারে করে ফারুকের বাবা ও বোনকে বগুড়া পাঠিয়ে কৌশল প্রয়োগ করে তাদেরকে দিয়ে ফারুককে ঢাকায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলেন। ঢাকায় আসার সাথে সাথে ফারুককে ধরে লিবিয়ার পথে প্লেনে তুলে দেন। বলাবাহুল্য, একই স্টাইলে কর্নেল রশিদকেও দু'দিন আগে ক্যান্টনমেন্ট বাসস্থান থেকে জবরদস্তি ধরে লিবিয়া পাঠিয়ে দিতে সক্ষম হন।

ফারুকের প্রত্যাবর্তনের পর নেতাবিহীন বগুড়ার বিদ্রোহ নিভে গেল। অতঃপর বিদ্রোহী বেঙ্গল ল্যান্সার সৈনিকদের ওপর নেমে আসে ঘোর দুর্দিন। ল্যান্সার ইউনিট সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে দেয়া হলো। সৈনিকদের ভাগ্যে জোটে জেল আর ফাঁসি। কিন্তু ফারুক-রশিদের কিছুই হয় নাই।

বগুড়ায় আবার বিদ্রোহ

৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ সাল। দেড় বছর পর বগুড়ায় আবার ভয়াবহ সৈনিক বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এবার ২২ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট। এই প্রথমবার একটি ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করলো। সৈনিকরা অফিসারদের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠল। বিদ্রোহী সৈনিকদের হাতে দু'জন তরুণ লেফটেন্যান্ট নিহত হলো। বেশ ক'জন অফিসারকে তারা ধরে বন্দি করে। তারা ব্রিগেড কমান্ডার সাদেকুর রহমান চৌধুরীকে তাড়া করে। আপন সৈনিকদের তাড়া খেয়ে ব্রিগেড কমান্ডার পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচান; বিদ্রোহী সৈন্যরা তার বাসভবনে ঢুকে ফ্যামিলিকে অপমান করে।

পরবর্তীতে বগুড়ার বিদ্রোহ দমন করা হয়। বিদ্রোহী সৈনিকদের কঠোর শাস্তি প্রদান করা হয়। যদিও ব্যর্থ ব্রিগেড কমান্ডার সাদেক চৌধুরীর কিছুই হয়নি। তাকে বরং প্রমোশন দিয়ে যথাসময়ে জেনারেল পদে উন্নীত করা হয়। সৈনিকদের ঢালাও জেল, ফাঁসি, বরখাস্তর মধ্য দিয়ে প্রশমিত হয় বগুড়ার সেনা বিদ্রোহ। মুক্তিযুদ্ধের বীর কমান্ডার সুবেদার মেজর চাঁন্দ মিয়াকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড প্রদান ছিল সবচেয়ে হৃদয় বিদারক ঘটনা।

ঢাকায় অক্টোবর সেনা বিদ্রোহ

বগুড়ার বিদ্রোহের একদিন পর ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আবার জ্বলে উঠে ভয়াবহ বিদ্রোহের আগুন। হঠাৎ করেই এই বিদ্রোহ শুরু হলেও জিয়া ছিলেন প্রস্তুত। বিদ্রোহের আগাম সংবাদ পেয়েই তিনি আগেভাগেই উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। জিয়া তাঁর ঐ সময়ের বিশ্বস্ত সহচর কর্নেল আমিনুল হক ও ক'জন সঙ্গীসহ বাসার পাশে একটি ইউনিটে আত্মগোপন করেন এবং সেই নিরাপদ স্থান থেকে রেডিও ওয়্যারলেস যোগে পরবর্তী অপারেশন পরিচালনা করতে থাকেন। ফলে নেতার সাময়িক অনুপস্থিতি সেনা প্রশাসনে কোনোরকম শূন্যতার সৃষ্টি হয়নি।

ঢাকা এয়ারপোর্টে সব সিনিয়র অফিসাররা উপস্থিত চলছে জাপানী প্লেন হাইজ্যাক ড্রামা। সবাই জাগ্রত। ক্যান্টনমেন্টে সবকটি ইউনিট সতর্ক অবস্থায়। জাগ্রত ৪৬ ব্রিগেডের সব অফিসার উপস্থিত। সব অফিসে জ্বলছে বাতি। টেলিফোনে একে অন্যের সাথে চলছে খবর আদান-প্রদান, একটি অভ্যুত্থান নাকি রাতেই ঘটতে যাচ্ছে!

এরকম সতর্কতামূলক অবস্থার মধ্য দিয়েই শুরু করা হলো ক্যান্টনমেন্টের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত এয়ারফোর্স কলোনী থেকে বিদ্রোহ। কে বা কারা এয়ারফোর্স কলোনীতে এয়ারম্যান কোয়ার্টারে গিয়ে ডাকাডাকি, শ্লোগান শুরু করে দেয়। তারপর এয়ারম্যানদের জড়ো করে গাড়িতে তুলে মিছিল। ধর্মঘটি শ্রমিকদের মতো। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা ৮ম বেঙ্গল ও টু-ফিল্ডের পাতানো মরণ ফাঁদে এসে আটকা পড়ে শ্লোগান মুখের বিদ্রোহীরা। অতঃপর নিধনযজ্ঞ, এইতো অক্টোবর বিদ্রোহ!

২রা অক্টোবর সৈনিক বিদ্রোহ ছিলো স্বল্পস্থায়ী, কিন্তু এর ফলাফল ছিল ভয়াবহ ও মর্মান্তিক। মাত্র ৮ ঘণ্টা স্থায়ী ছিল এই বিদ্রোহ। প্রধানত, এয়ারফোর্স এবং আর্মি সিগন্যাল ইউনিট জড়িত ছিল এতে। অর্ডিন্যান্স ও সার্ভিসেস কোরের দু-তিনটি ক্ষুদ্র ইউনিটও ছিল।

১/২ অক্টোবর মধ্যরাতে ক্যান্টনমেন্টের উত্তর প্রান্ত থেকে শুরু হয় গোলযোগ। কীভাবে হঠাৎ করেই বিপ্লবটি শুরু হয়, এ নিয়ে যথেষ্ট বিভ্রান্তি ও গভীর সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

বিদ্রোহীরা দুটি গ্রুপে ভাগ হয়ে শ্লোগান দিতে দিতে টারগেটের দিকে অগ্রসর হয়। কোনো প্ল্যান নেই, প্রোগ্রাম নেই, নেতা নেই, লক্ষ্য নেই—তারা এগিয়ে চললো এয়ারপোর্ট রোড ধরে। শ্লোগান মুখর সৈনিক—'সিপাই সিপাই ভাই ভাই, অফিসারদের রক্ত চাই ....'

পথে বনানীতে COD'র অস্ত্রাগার ভেঙ্গে তারা অস্ত্রশস্ত্র লুটপাট করলো। তখন মধ্যরাত। বনানীর রাজপথে শ্লোগানমুখর সৈনিক। এই গ্রুপে ছিল সিগন্যালস, বিমান ও অন্যান্য গ্রুপের সৈনিকবৃন্দ। ১০/১২টি ট্রাকে চেপে তারা শ্লোগান তুলতে তুলতে শূন্যে ক্রমাগত ফায়ার করতে করতে এয়ারপোর্ট রোড ধরে ২নং এমপি চেক পোস্টের কাছে এসে হাজির হয়। প্রথম তিনটি ট্রাক চেক পোস্টে ডিউটিরত এমপিরা থামিয়ে দেয়। তখন বিদ্রোহী সৈনিক ও মিলিটারি পুলিশদের মধ্যে প্রবল বাদানুবাদ চলতে

থাকে। ফায়ার আর গণ্ডগোলে বেশ আগেই আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। সরকারি বাড়ি ছেড়ে আমি তখন ডিফেন্স সোসাইটিতে আমার নিজ বাড়িতে। সেখানে আমার বাড়ি থেকে মাত্র ৩০০ গজ দূরে আমার চোখের সামনেই ঘটছিল ঘটনা। বাড়ির ছাদের তিনতলা থেকে সবকিছুই পরিষ্কার দেখছিলাম। শ্লোগান মুখর বিদ্রোহীরা মিলিটারি পুলিশদের বাধা নিষেধ অমান্য করে জবরদস্তি করে চেকপোস্ট অতিক্রম করে কয়েক গজ দূরে ৮ম বেঙ্গল লাইনের দিকে এগিয়ে গেলো।

রাস্তা থেকে বাঁদিকে মোড় নেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের ওপর শুরু হলো অবিশ্রান্ত ধারায় গুলিবর্ষণ। ট্যা-ট্যা-ট্যা। ট্যার-র-র .... বিপ্লবীরা তাদের আপন ভাইদের কাছ থেকে এরকম বিরূপ অভ্যর্থনার জন্য মোটেই তৈরি ছিলো না। তারা সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে খোলা মাঠে স্বয়ংক্রিয় রাইফেল থেকে বর্ষিত বুলেট বর্ষণের মধ্যে ধরা পড়লো। প্রথম তিনটি শ্লোগানমুখর ট্রাকের সৈনিকদের জীবন স্পন্দন তখনই থেমে গেলো। স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থেকে অবিরাম ধারায় গুলিবর্ষণ চলতেই থাকলো। যতক্ষণ পর্যন্ত না বিপ্লবীদের সকল স্পন্দন থেমে গেলো। বেশ কটি বুলেট আমার ছাদের পাশ দিয়ে শোঁ শোঁ করে উড়ে গেল, আমি ছুটে নিচে নেমে পড়লাম। পিছনের ট্রাকগুলোতে যারা ছিল, তারা রেললাইনের পাশে বড় রাস্তার পাশে কাঁচা দোকানগুলোর আশেপাশে অবস্থান নিয়ে পাল্টা গুলিবর্ষণ শুরু করলো।

ভোর সাড়ে সাতটা পর্যন্ত উভয় পক্ষে গোলাগুলি চলতে থাকলো। সকাল ৭টার দিকে একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন তেজগাঁ-এর দিক থেকে এসে গোলাগুলির মধ্যে আটকা পড়লো। প্রবল গোলাগুলিতে ট্রেনটি না পারছিলো এগিয়ে যেতে, না পারছিলো পিছিয়ে যেতে। ঘুমন্ত যাত্রীরা ভয়ে কম্পমান। বিদ্রোহীরা আটকে পড়া ট্রেনের আড়াল পেয়ে এবার ঊর্ধ্বশ্বাসে বনানীর দিকে ছুটে পালাতে লাগলো, কেউ কেউ হাতিয়ার ফেলেই। ৮ম বেঙ্গলের সৈন্যরা তাদের পেছনে ধাওয়া করলো। পলায়নপর অনেকে গুলিবিদ্ধ হলো। অনেকে ধরা পড়লো। তাদের ভাগ্যে কী ঘটেছিল বলা মুশকিল। গোলাগুলির পর ল্যান্সার ইউনিটের বিপ্লবী সুবেদার সারওয়ারের মৃতদেহ রেললাইনের পাশে পড়ে থাকতে দেখা যায়। আগের দিন তাকে ইরাকগামী প্লেন থেকে নামিয়ে আনা হয়। জেল হত্যাকাণ্ডের নায়ক সুবেদার মোসলেম উদ্দিনও গোলাগুলিতে নিহত হয় বলে জানা যায়। বহু মৃতদেহ ট্রাকে, খোলা মাঠে রেললাইনের আশেপাশে পড়ে থাকে।

দ্বিতীয় গ্রুপটি ছিল প্রধানত, এয়ারফোর্স সেনাদের। তারা ক্যান্টনমেন্টের ভেতর দিয়ে বড় রাস্তা ধরে অগ্রসর হয়। পথে স্টেশন হেডকোয়ার্টারের কাছে ২ ফিল্ড আর্টিলারি তাদের বাধা দেয় এবং গুলিবর্ষণ করে। বেশ কিছু হতাহত হয়। বিমান সেনারা ছত্রভঙ্গ হলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রুপে বিভক্ত হয়ে তারা এয়ারপোর্টের দিকে ছুটে যায়। রক্তপাগল এয়ারম্যান সৈনিকরা ছুটে গিয়ে এয়ার টারমিনালে অবস্থিত বিমান বাহিনী প্রধান এ. জি. মাহমুদ ও অন্যান্য অফিসারের ওপর হামলা চালায়। ঐ সময় ঘটনাচক্রে জাপানি কমান্ডোরা হাইজ্যাক করে একটি জাপানি বোয়িং প্লেন ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করায়। জিম্মিদের ছাড়ানোর ব্যাপারে আলোচনা করতে সব সিনিয়ার

অফিসার টারমিনালে উপস্থিত। লক্ষ ডলার জড়ো করা হয়েছে জিম্মিদের ছাড়ানোর জন্য। বিদ্রোহীদের আকস্মিক আক্রমণে ডলারের বড় বড় বান্ডিল নিয়ে যে যেদিকে পারলো পালাল। এগারোজন অফিসার করুণভাবে নিহত হলো। শুধু রহস্যজনকভাবে বেঁচে গেলেন এয়ার মার্শাল এ. জি. মাহমুদ! তাকে সেনাবাহিনীর একটি জিপ এসে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। জাপানী প্লেন হাইজ্যাকের সাথে এয়ারফোর্স 'ক্যু' ঘটনার কী সম্পর্ক ছিল, সঠিক বুঝা যায়নি।

অভ্যুত্থানে যে সব অফিসার মারা গেলেন তাঁরা হলেন–

গ্রুপ ক্যাপ্টেন আনসার চৌধুরী, গ্রুপ ক্যাপ্টেন রাস মাসুদ, উইং কমান্ডার আনোয়ার শেখ, স্কোয়াড্রন লীডার মতিন, ফ্লাইট লেঃ শওকত জাহান চৌধুরী ও সালাউদ্দিন, ফ্লাইং অফিসার মাহবুব আলম ও আখতারুজ্জামান, পাইলট অফিসার আনসার, নজরুল ও শরীফুল ইসলাম।

এয়ারপোর্টে হত্যাকাণ্ডের পর বিদ্রোহীরা কী করবে ভেবে পায় না। তাদের কিছু লোক রেডিও স্টেশনে পৌঁছে আবোল-তাবোল ভাষণ দিতে থাকে। টু-ফিল্ড আর্টিলারি, ৪৬ ব্রিগেড ও নবম ডিভিশনের ট্রুপ দ্রুত এগিয়ে এসে সবাইকে তাড়িয়ে দেয় ও গ্রেফতার করে। তারা মূল টার্গেট জিয়াউর রহমানের সন্ধান পায়নি, তারা তাঁর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেনি। সকাল আটটার মধ্যেই বিদ্রোহীরা যেখানে সেখানে অস্ত্র ফেলে চতুর্দিকে পলায়ন করে। ব্যর্থ হয় অক্টোবর অভ্যুত্থান। স্পষ্ট বুঝা গেল, তাদের কোনো নির্দিষ্ট প্লান প্রোগ্রাম ছিলো না, কোনো নেতাও ছিলো না। তাহলে কার প্ররোচনায় হঠাৎ করে তারা এই হুজুগের অভ্যুত্থানে বেরিয়েছিল, তা আজও এক বিরাট রহস্য।

জিয়ার শুদ্ধি অভিযান

এবার শুরু হল জিয়ার কঠোর শুদ্ধি অভিযান। বিদ্রোহী বিমান ও সৈনিকদের পাকড়াও করে তাদের নির্মমভাবে ঢালাও শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হলো। সংক্ষিপ্ত বিচারের সুবিধার্থে মার্শাল ল' আইন করে বিশেষ সামরিক আদালত গঠন করা হলো। এই সময় জেনারেল এরশাদ ছিলেন ডেপুটি চীফ। তারই তত্ত্বাবধানে এসব সংক্ষিপ্ত ট্রায়াল সুষ্ঠুভাবে দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করা হয়। শুরু হলো ত্বরিত গতিতে বিচারের নামে প্রহসনের পালা। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে কয়েক শত সৈনিক ও বিমান সেনাদের ফাঁসির আদেশ দেয়া হলো। সেনা বা বিমান বাহিনীর কোনো প্রতিষ্ঠিত আইন-কানুন এক্ষেত্রে মেনে চলা হয়নি। পাঁচটি কারাগারে এক সাথে ৮/১০ জন করে পর্যায়ক্রমে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়। ফাঁসি ছাড়াও এলোপাথাড়ি ফায়ারিং-এ মারা যায় শত শত। ফায়ারিং স্কোয়াডেও বহুজনকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এছাড়া ঢালাওভাবে গ্রেপ্তারের পর বহু সৈনিকের মৃত্যু ঘটে অমানবিক নির্যাতনে। ৩ থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতি রাতে সেনা ও বিমান বাহিনী ব্যারাক থেকে সৈনিকদের ধরে ধরে

নিয়ে যাওয়া হয় নির্যাতন ক্যাম্পে, তারা আর ফিরে আসেনি। সারা ক্যান্টনমেন্ট জুড়ে হাহাকার। কান্নার রোল। কত সৈনিক, বিমান সেনা ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুললো, কতজন প্রাণ হারালো, 'গুপ্ত হত্যার' শিকার হলো, এর কোনো হিসেবে নেই। বিমান বাহিনীর কার্যক্রম ক্ষমতা নেমে আসে প্রায় শূন্যের কোঠায়। সরকারি হিসাব মতেই শুধু দুই মাসে ফাঁসিতে লটকানো হয় ১১৪৩ জন সৈন্যকে, যার মধ্যে বিমান সেনাই ছিল ৫৬১ জন। হতভাগ্য সৈনিকদের লাশ পর্যন্ত তাদের আত্মীয়-স্বজনদের দেয়া হয়নি। তারা আজও খুঁজে ফিরে তাদের প্রিয়জনকে। কোথায় যে এত লাশ গুম করা হলো, তাও এক রহস্য। এটা ছিল একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড, না-কি অভ্যুত্থান, তা এখনও নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। অনেকেরই ধারণা, এটা ছিল পূর্ব-পরিকল্পিত এক নিধনযজ্ঞ। মধ্যরাতে সিগন্যাল লাইনস ও কুর্মিটোলা এয়ারফোর্স ব্যারাকে কে বা কারা শ্লোগান দিয়ে আহ্বান জানিয়ে শুরু করে বিদ্রোহ, তা আজও রহস্য।

জিয়া হত্যাকাণ্ড

চট্টগ্রাম সেনা অভ্যুত্থান

১৯৮১ সালে চট্টগ্রামে সেনা অভ্যুত্থানে নিহত হলেন জেনারেল জিয়া। রহস্যময় অভ্যুত্থান। ৭ নভেম্বর অভ্যুত্থানের পর জিয়ার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে প্রায় ১৮টি ছোটবড় সেনা অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। জিয়া সবকটিই দক্ষতার সাথে প্রতিহত করেন। বলা যায় ঐ সময় জিয়া সৈনিকদের অভ্যুত্থান ঠেকাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু ১৯৮১ সালের চট্টগ্রাম অভ্যুত্থান ঠেকাতে পারলেন না। চট্টগ্রাম অভ্যুত্থান প্রকৃতপক্ষে সেনা অভ্যুত্থান ছিলো না। ৩ নভেম্বরের মতো এটা অফিসারদের দ্বারা পরিচালিত একটি 'অফিসার্স অভ্যুত্থান' আখ্যা দেয়া যেতে পারে, যেখানে সৈনিকদের স্বার্থ সামান্যই জড়িত ছিল। সবকটি অভ্যুত্থানই ছিল প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতার লড়াই। চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানও ছিল তাই, কিন্তু পর্দার আড়ালে নেপথ্যে থেকে কোন্ ক্ষমতাধর ব্যক্তি কলকাঠি নেড়েছেন, তা সবার কাছে আজও অজ্ঞাতই থেকে গেছে।

জেনারেল জিয়ার প্রিয় সেনাপতি ছিলেন মঞ্জুর, যেমনভাবে এরশাদ ছিলেন তার বড়োই বিশ্বস্ত ফরমা-বরদার। বাংলাদেশ আর্মির একজন দক্ষ, প্রতিভাবান, সৎ অফিসার মঞ্জুর; অবশ্য তিনিও ছিলেন জিয়া, এরশাদ, তাহের, খালেদ, শাফায়েতের মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষী।

কেন হঠাৎ বিগড়ে গেলেন জেনারেল মঞ্জুর? রাজধানী ঢাকার মসনদ ছেড়ে চট্টগ্রামে করলেন অভ্যুত্থান প্লান? আজ এটা জলবৎ পরিষ্কার, জিয়া-মঞ্জুর হত্যাকাণ্ড ৭ নভেম্বরের সেই প্রভাবশালী চক্রের চক্রান্তেরই ফসল।

১৯৭৬ সালে ডবল প্রমোশন নিয়ে জেনারেল এরশাদের ঢাকা আগমন। আগমনের পরপরই ক্যান্টনমেন্টে সেপাইরা তার মতো এক অখ্যাত অফিসারের এক বছরে ডবল প্রমোশনের বিষয় তখনই যথেষ্ট উষ্মার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জিয়ার কাছে বিভিন্নভাবে সৈনিকরা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও জানায়।

জিয়া তাকে চিনতে পারেননি। তাকে দুর্বল ভেবে কাছে টেনে এনে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ভেবেছিলেন। সেটাই হলো তাঁর কাল।

এরশাদ জিয়ার কান-ভারি করে আমাকেও সরিয়ে দিয়েছিল। [সৌভাগ্য হত্যা করেনি!] তারপর সেই যে এরশাদরূপী মামদো ভূত জিয়ার ঘাড়ে চাপলো, অন্যেরা শত চেষ্টা করেও তাকে নামাতে পারেনি।

ছিটকে পড়লো মঞ্জুর, ছিটকে পড়লো শওকত। একাই তখন এরশাদ জিয়ার

ঘাড়ে সওয়ার। ধূর্ত এরশাদ। চানক্যের কূটকৌশল প্রয়োগ করে জিয়ার সাথে মঞ্জুর-শওকতের সম্পর্কে ফাটল ধরালো। সময় দ্রুত গড়িয়ে চললো।

মঞ্জুরকে চট্টগ্রাম ডিভিশন থেকে অপসারণ করে স্টাফ কলেজে বদলি করা হলো। পোস্টিং মঞ্জুরের মনঃপুত হয়নি। এসব ব্যাপার নিয়ে সেনাপ্রধান এরশাদের চক্রান্তে জিয়া এবং মঞ্জুরের মধ্যে হঠাৎ করে সম্পর্কের তিক্ততা চরম আকার ধারণ করে। মঞ্জুর আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নেন। তবে তিনি জিয়াকে হত্যা করার প্ল্যান করেছিলেন কি-না, এ নিয়ে গভীর সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। যতদূর জানা যায়, জিয়াকে বন্দি করে ক্যান্টনমেন্টে এনে এরশাদের পদচ্যুতিসহ কিছু দাবি দাওয়া আদায়ই ছিল মূল উদ্দেশ্য।

৩০ মে ১৯৮১ সাল। প্রেসিডেন্ট জিয়া চট্টগ্রাম পৌঁছেন। জেনারেল এরশাদও প্রেসিডেন্টের সাথে যাওয়ার কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে তিনি অজ্ঞাত কারণে তার প্ল্যান পরিবর্তন করেন। প্রেসিডেন্ট চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে অবস্থান নেন। তিনি রাজনৈতিক মিটিং নিয়ে মহাব্যস্ত থাকেন। রাত এগারোটায় ঘুমোতে যান।

ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ রাত তিন ঘটিকায় বিদ্রোহী অফিসারগণ তিনটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে সার্কিট হাউজে আকস্মিক কমান্ডো আক্রমণ চালায়। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আক্রমণের প্ল্যান প্রোগ্রাম ও উদ্দেশ্য নিয়ে অফিসারদের মধ্যে ছিল দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও বিভ্রান্তি।

প্রথমে রকেট লাঞ্চার থেকে সার্কিট হাউজের ওপর রকেট বর্ষণ করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে মেশিনগান থেকে অবিরাম গুলিবর্ষণে গার্ডরা ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। বিনা বাধায় বিদ্রোহী অফিসাররা সার্কিট হাউজের দো-তলায় ছুটে যায়। তারা বারান্দায় ছোটাছুটি করে প্রেসিডেন্টকে চিৎকার করে খুঁজতে থাকে। এই সময় প্রেসিডেন্ট জিয়া নিজেই ৪নং কক্ষ থেকে দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কী চাও? কাছে দণ্ডায়মান লেঃ মোসলেহ উদ্দিন রীতিমতো ঘাবড়ে যায়। এমন সময় হঠাৎ করে লেঃ কর্নেল মতি ছুটে এসে তার স্টেনগান দিয়ে অতি কাছ থেকে প্রেসিডেন্ট জিয়ার ওপর সরাসরি গুলিবর্ষণ করে। ক্ষিপ্তপ্রায় মতি তার স্টেনগান থেকে মেঝেতে পড়ে যাওয়া জিয়ার মুখমণ্ডলে আর এক ঝাঁক গুলিবর্ষণ করে। আনুমানিক ৪-৩০ মিনিটে জিয়া মৃত্যুবরণ করেন। জিয়াকে হত্যা করার কোনো নির্দিষ্ট প্ল্যান প্রোগ্রাম বা নির্দেশ না থাকা সত্ত্বেও কেন কর্নেল মতি ছুটে গিয়ে তাকে হত্যা করলো, তাঁর এই মোটিভ আজও রহস্যাবৃত। রাষ্ট্রপতি জিয়াকে যেভাবে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়েছে, সে রকম নির্দেশ জেনারেল মঞ্জুর কোনো পর্যায়ে কাউকে দিয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

নেপথ্যে থেকে তাহলে নাটাইর সুতাটি টেনেছিল কে? লেঃ কর্নেল মতি কার নির্দেশে ছুটে গিয়ে জিয়ার বুকে স্টেনগান ধরলো? মঞ্জুরতো জিয়াকে হত্যা করার নির্দেশ কাউকে দেয় নাই। তাহলে মতি এককভাবে এ কাজটি কেন করলো? ঘটনাপ্রবাহ থেকে জানা যায়, হত্যাকাণ্ডের চারদিন আগে চট্টগ্রামে মতির সাথে হিলপট মেসে এরশাদের সাথে দুঘণ্টা অন্তরঙ্গ পরিবেশে আলোচনা হয়েছিল। সকল প্রটোকলের বাইরে জুনিয়ার মতির সাথে সেনাপ্রধানের এমন কী ব্যক্তিগত গোপন আলাপ হতে পারে ঐ সন্ধিক্ষণে? ক'দিন আগে ঢাকায় গিয়েও মতি সেনাপ্রধান এরশাদের সাথে দেখা করে। ঐদিন এরশাদ মিলিটারি একাডেমির নির্ধারিত ভিজিট

ক্যানসেল করে প্রায় সারাদিন মঞ্জুরের সাথে গভীর আলোচনায় লিপ্ত ছিলেন। তাদের মধ্যে কী গোপন আলোচনা হয়েছিলো? এসবই আজ রহস্য।

মেজর জেনারেল মঞ্জুর হত্যাকাণ্ড ঘটনা অবহিত হওয়ার পর কর্নেল মতিকে ডেকে বকাবকি করেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সিনিয়ার অফিসার হিসেবে সকল দায়-দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে তুলে নেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধে দুই কোম্পানি সেনা শুভপুর ব্রিজের দিকে পাঠাতে নির্দেশ দেন। মঞ্জুর একটি বিপ্লবী পরিষদ গঠন করেন এবং চট্টগ্রাম রেডিও মারফত বিভিন্ন ঘোষণা দিতে থাকেন। জিয়ার আকস্মিক হত্যাকাণ্ডের সংবাদে সবাই হতভম্ব হলেও ঢাকায় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এরশাদ ছিলেন প্রস্তুত। তিনি ত্বরিত গতিতে অতি ভোরেই আর্মি হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে যান এবং সকল নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। তিনি তার স্টাফ প্রধানদের তৎক্ষণাৎ ডেকে পাঠান। জেঃ নুরল উদ্দিন, জেঃ ওয়াহেদ, হারুন, মইন প্রমুখ সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যায়। সেনাসদরে স্থাপন করা হয় 'অপারেশন নিয়ন্ত্রণ কক্ষ' জেনারেল এরশাদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে। অতঃপর সেখান থেকেই নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন রাষ্ট্রের সকল কর্মকাণ্ড। তিনি রেডিও বাংলাদেশ মারফত চট্টগ্রামে অবস্থিত সকল সৈনিকদের আত্মসমর্পণের আহ্বান জানান। বস্তুত তখনও রেডিও টেলিভিশন মারফতই দিবারাত্রি ঢাকা-চট্টগ্রামের মধ্যে 'মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ' চলতে থাকে। কোনো পক্ষের সৈন্যরাই তখন অস্ত্র নিয়ে একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে মোটেই আগ্রহী ছিলো না। মঞ্জুর রাজধানীর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণে ব্যর্থ হন। রাজধানী ঢাকায় তার স্বপক্ষে কারা কাজ করছিল, তা এখন তদন্ত সাপেক্ষ। তবে রেডিও, টেলিভিশন মারফত সেনাপ্রধান জেনারেল এরশাদের দিবারাত্রি প্রোপাগাণ্ডা ও নির্দেশ চট্টগ্রামে অবস্থিত মঞ্জুরের অনুগত অফিসার ও সৈনিকদের মনোবল দ্রুত ভেঙ্গে দেয়। তারা রেডিও-র ঘোষণা অনুযায়ী তৎক্ষণাৎ আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত হয়। তারা অফিসারদের ক্ষমতার কোন্দলে নিজেদের জড়াতে আগ্রহী ছিলো না।

ওদিকে এরশাদের নির্দেশে কুমিল্লা থেকে বিপুল সৈন্য নিয়ে ব্রিগেডিয়ার (পরে জেনারেল) মাহমুদ চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করেন। হতাশ এবং ভগ্নহৃদয় মঞ্জুর বেগতিক দেখে কয়েকজন সহকর্মী অফিসার ও ফেমিলিসহ হাটহাজারীর দিকে পালিয়ে যেতে থাকেন। ওদিকে এরশাদের নির্দেশে রেডিও বাংলাদেশ জেনারেল মঞ্জুরকে জীবিত অথবা মৃত গ্রেফতার করার জন্য ৫ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে।

অবশেষে একটি চা বাগানে একজন কুলির জীর্ণ কুটিরে ধরা পড়লেন স-পরিবারে জেনারেল মঞ্জুর। পুলিশ ইন্সপেক্টর গোলাম কুদ্দুস তাকে গ্রেফতার করে হাটহাজারী থানায় নিয়ে আসেন।

সংবাদ পেয়ে এরশাদের বিশেষ ব্রিফিং নিয়ে মেঃ জেঃ লতিফ চট্টগ্রাম গিয়ে উপস্থিত হন। চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট থেকে তিনটি পিকআপ ও জিপ নিয়ে ক্যাপ্টেন এমদাদকে পাঠানো হয় হাটহাজারি থানায়। সেখানে পৌঁছে এমদাদ প্রায় জোর করেই পুলিশ কর্তৃপক্ষের হাত থেকে জেনারেল মঞ্জুরকে ছিনিয়ে নেন। মঞ্জুর বারবার আকুল আবেদন করে তাকে পুলিশের হেফাজতেই রাখার জন্য। এর জবাবে ক্যাপ্টেন এমদাদ হতভাগ্য জেনারেলকে হাত-পা-চোখ বেঁধে প্রায় টেনে-হিঁচড়ে গাড়িতে তুলে তাকে চট্টগ্রাম অভিমুখে হাঁকিয়ে নিয়ে চলেন। পুলিশের গাড়িও পেছন পেছন ছুটে চলে।

মঞ্জুরের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা কাঁদতে থাকে। মিসেস মঞ্জুর চিৎকার করে কেঁদে কেঁদে স্বামীর জীবন ভিক্ষা চেয়েছিলেন।

বন্দি জেনারেল

বন্দি জেনারেলকে নিয়ে ক্যাপ্টেন এমদাদের জিপ চট্টগ্রাম সেনানিবাসে প্রবেশ করলো। নিয়তির কী করুণ পরিহাস! দুশো বছর পর যেন বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার কাহিনীর বাস্তব পুনরাবৃত্তি ঘটলো। বাউল করুণ সুরে গেয়ে উঠলো 'সকালবেলা আমিররে ভাই ফকির সন্ধ্যাবেলা'। যিনি ছিলেন রাজ্যের বাদশাহ্ মহান অধিপতি, দিনহীন ভিখারীর বেশে বন্দি হয়ে তাঁর মুর্শিদাবাদ প্রবেশ। মীরজাফর পুত্র মীরনের নির্দেশে ঘাতক ভৃত্য মহম্মদি বেগ কর্তৃক তাঁর বুকে আমূল ছোরা প্রবেশ করিয়ে দিয়ে হত্যা!

দুশো বছর পর চট্টগ্রামে পুরানো সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটলো। সেনাবাহিনীর বরপুত্র চট্টগ্রামের একচ্ছত্র সেনাপতি মেজর জেনারেল মঞ্জুর তার আপন সেনানিবাসে প্রবেশ করলেন দীন-হীন বন্দি বেশে। তার হাত-পা-চোখ বাঁধা। ক্ষমতার মসনদে সদ্য উপবিষ্ট নবাবের ইঙ্গিতে ঘাতকরা তাকে হত্যা করতে প্রস্তুত। রাতের অন্ধকারে তাকে নিয়ে ক্যাপ্টেন এমদাদের দল সেনানিবাসে ঘুরতে থাকে। জনপ্রিয় জেনারেলকে কেউ খুন করতে রাজি হয় না। এক সময় ঘাতক দল কঠোর হয়। উপরের নির্দেশ পালন করতেই হবে। অতি নিকট থেকে জেনারেল মঞ্জুর-এর মাথায় একটি মাত্র গুলি করা হলো। গুলিটি তার মাথায় একটি বড় গর্তের সৃষ্টি করলে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। সরকারের রেডিও টেলিভিশন অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে ঘোষণা করলো– চট্টগ্রাম সেনানিবাসে একদল উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যের হাতে জেনারেল মঞ্জুর নিহত হয়েছেন। 'কী নির্লজ্জ মিথ্যাচার।' মুক্তিযুদ্ধের এক বীর সেনানী ও সেক্টর কমান্ডার মেজর জেনারেল এম এ মঞ্জুর বীর উত্তম; আজ তাঁর কবরটির কোনো চিহ্ন পর্যন্ত নেই। তিনজন ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর হত্যার সময় চট্টগ্রাম ক্যান্টেনমেন্টে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন। তারা হলেন ; ব্রিগেডিয়ার এম. এ. লতিফ, ব্রিগেডিয়ার আজিজুল ইসলাম ও ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুল হাসান। ব্রিঃ আজিজ অকালে মারা যান। লতিফ ও মাহমুদ প্রমোশন পেয়ে জেনারেল হন। মাহমুদও পরে অকালে মারা যান।

মঞ্জুরের তিরোধানের সাথে সাথেই চট্টগ্রাম বিদ্রোহের অবসান ঘটলো। নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন জেনারেল এরশাদ। ধরাশায়ী হলো সকল প্রতিপক্ষ। অতঃপর তারই মনোনীত অসুস্থ অথর্ব বিচারপতি সাত্তারকে প্রেসিডেন্টের গদিতে বসিয়ে নিজেই রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করে বসলেন এরশাদ।

মেজর জেনারেল মোজাম্মেলের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হলো. অভিযুক্তদের শনাক্ত করতে। তড়ি-ঘড়ির তদন্তে ঐ পরিস্থিতিতে কী পরিবেশ বিদ্যমান ছিলো, তা সহজেই অনুমেয়। পরবর্তীতে জেনারেল আবদুর রহমানের সভাপতিত্বে চট্টগ্রাম জেলের অভ্যন্তরে একটি গোপন কোর্টমার্শাল অনুষ্ঠান করে ১৩ জন মুক্তিযোদ্ধাকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হলো। তাদের পরিবার পরিজনদের আকুল

রশিদ : হ্যাঁ।

এ্যান্থনী : তাহলে এসব আপনি জিজ্ঞেস্ করেছিলেন? ১৩ই অগাস্ট সেখানে যাওয়ার এই ছিলো আপনার উদ্দেশ্য?

রশিদ : হ্যাঁ।

এ্যান্থনী : আপনি কী সামরিক অভ্যুত্থানের তারিখ সম্পর্কে তাকে কোনো ধারণা দিয়েছিলেন?

রশিদ : না। আমি কীভাবে বিশ্বাস করতে পারি? তিনিও তো এসব শেখকে বলে দিতে পারেন এবং তাঁর দক্ষিণ হস্তে পরিণত হতে পারেন।

এ্যান্থনী : আপনার কী এ ধরনের ধারণা হয়েছিলো যে উনি আপনাদের পক্ষে রয়েছেন?

রশিদ : হ্যাঁ।

এ্যান্থনী : তাহলে দেখা যাচ্ছে এই-ই হচ্ছে আর এক ব্যক্তিত্ব এবং যিনি হচ্ছেন মুজিবের অন্যতম মন্ত্রী। যার জানা ছিলো যে, তাঁর নেতার মৃত্যু হবে।

রশিদ : হ্যাঁ।

এ্যান্থনী : কোনো নির্দিষ্ট দিনের কথা মনে মনে স্থির করেছিলেন?

ফারুক : তখন আমি চিন্তা করতে শুরু করলাম, কখন কাজটা সুবিধাজনক হবে। অবশ্য এ সময় আমার লোকদের জন্য ইউনিট ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করি। এই 'ট্রেনিং' হচ্ছে প্রতি মাসে দুবার করে 'রাত্রিকালীন ট্রেনিং'।

এ্যান্থনী : কিন্তু এসব তো হচ্ছে স্বাভাবিক ধরনের 'ট্রেনিং এক্সারসাইজ'। যখন এসব শুরু হয়েছিল তখন মুজিব হত্যার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক থাকতে পারে?

ফারুক : না। অপারেশনের কথা চিন্তা করেই এই বিশেষ ট্রেনিং-এর কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছিলো। কেননা রাতের অসময়ে ইউনিট-এর চলাচল নজরে পড়তে বাধ্য। এজন্যই কর্মসূচি অনুযায়ী মার্চ থেকে প্রতি মাসে দু'বার করে 'রাত্রিকালীন ট্রেনিং' শুরু করলাম।

এ্যান্থনী : মুজিবকে হত্যার জন্যে কেন আপনি ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট দিনটিকে বেছে নিলেন?

ফারুক : প্রথমত, ১৪/১৫ই অগাস্ট-এর রাত হচ্ছে রাত্রিকালীন ট্রেনিং-এর পূর্ব নির্ধারিত একটি তারিখ। দ্বিতীয়ত, বর্ষাকালীন। বর্ষাকালে বাংলাদেশ আক্রমণ করা খুবই দুরূহ। এ সত্ত্বেও যদি ভারত তা করে, তাহলে কমপক্ষে ভারতকে ৬ থেকে ৮ ডিভিশন সৈন্য এতে জড়াতে হবে।

এ্যান্থনী : তাহলে আপনি এভাবে চিন্তা করেছিলেন যে ভরা বর্ষায় ১৫ই অগাস্টে মুজিবকে সরিয়ে ফেললে, ভারত প্রয়োজনীয় ত্বরিত প্রক্রিয়া দেখাতে পারবে না?

ফারুক : হ্যাঁ।

এ্যান্থনী : ভারতের কথা আপনার চিন্তায় এসেছিলো কেন? আপনি কী ভারতের দিক থেকে কোনোরকম আক্রমণ আঁচ করেছিলেন?

ফারুক : হ্যাঁ। কেননা শেখ মুজিব ভারতের সঙ্গে চুক্তি দস্তখত করেছেন, তার একটিতে এ মর্মে শর্ত রয়েছে যে, দেশে কোনো গণ্ডগোল হলে উনি ভারতীয় সৈন্য ডেকে পাঠাতে সক্ষম।

এ্যান্থনী : মুজিবকে সরাবার জন্য আপনাদের পরিকল্পনা অনুসারে ছিলো ২৮টি ট্যাংক, ১৮টি কামান, আর ৭০০ লোকবল?

ফারুক : হ্যাঁ।

এ্যান্থনী : এটা রশিদের চিন্তায় এলো যে, ব্যক্তিগত আক্রোশ রয়েছে এ ধরনের কিছু অফিসার এর ভেতরে জড়ানো মঙ্গলজনক হবে। তাই ১৪ই অগাস্ট তারিখের রাতের জন্য আমরা এ ধরনের কিছু অফিসার সংগ্রহ করলাম, যারা আগেই বাহিনী থেকে স্থায়িভাবে অবসর গ্রহণ করেছে।

এ্যান্থনী : তাহলে মুজিব হত্যার মাত্র ঘণ্টা কয়েক আগে ১৪ই অগাস্ট রাতে আপনারা এদের নিয়ে আসলেন?

ফারুক : হ্যাঁ, এদের এ মর্মে বলা হয়েছিলো যে, আমরা কোনো একটা ব্যাপারে পরিকল্পনা করেছি, তোমরা নতুন এয়ারপোর্টে আসো।

এ্যান্থনী : ১৫ই অগাস্ট ভোর রাত ৫টা থেকে সাড়ে ৫টার মধ্যে আপনারা পূর্ব নির্ধারিত টার্গেটে দলগুলোকে পাঠিয়ে দিলেন। আপনি কী করলেন? আপনি নিজের জন্যে কী দায়িত্ব নিলেন?

ফারুক : আমার মূল দায়িত্ব ছিলো, যে কোনো ধরনের 'প্রতি আক্রমণ' নিশ্চিহ্ন করে দেয়া।

এ্যান্থনী : ষড়যন্ত্রকারীরা আশঙ্কা করেছিলো যে, বাধা আসবে রক্ষীবাহিনীর কাছ থেকে; এরাই ছিলো শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত গার্ড। এ সময় এই আধা সামরিক বাহিনীর ৩,০০০ লোক ঢাকায় অবস্থান করছিলো। কিন্তু এদের কাছে ছিলো হালকা ধরনের অস্ত্র।

ফারুক : আমার ৯৯% বিশ্বাস ছিলো যে, শেখ মুজিব, সেরনিয়াবাত এবং শেখ মনির হত্যা কার্যকরী হবে। কিন্তু আমি পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের ব্যাপারে খুব একটা নিশ্চিত ছিলাম না। এজন্যে সাইকোলজিক্যাল ভীতি উৎপাদনের লক্ষ্যে আমি ট্যাংক-এর ব্যবহার করেছিলাম।

এ্যান্থনী : আপনি কী বলতে চান যে, ট্যাংকগুলোতে কোনো গোলাই ছিলো না। তাহলে আপনারা কেনো ওগুলো বের করলেন?

ফারুক : আমার বিশ্বাস ছিলো শুধু জনাকয়েক নেতৃস্থানীয় জানতে পারবে যে, ট্যাংকগুলোতে গোলাবারুদ নেই।... আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে, এটা ছিলো এক 'ধাপ্পাবাজি'।

রশিদ : তাঁকে যদি বাঁচিয়ে রাখা হতো, তাহলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

এ্যান্থনী : তাহলে আপনাদের বক্তব্য হচ্ছে, মুজিব বেঁচে থাকলে পরিস্থিতি আপনাদের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ঘুরে যেতো?

রশিদ : হ্যাঁ।

এ্যান্থনী : এজন্যই কী তাঁকে হত্যা করতে হয়েছে?

রশিদ : হ্যাঁ, তাই করতে হয়েছে।

ফারুক : আমি সিদ্ধান্ত নেই যে, তাঁকে এই পৃথিবী থেকে বিদায় দিতে হবে, কিন্তু এসময় ১৯৭৪ সালের মার্চে আমি ছিলাম পুরোপুরিভাবে একজন পেশাদার সৈনিক। আমার কোনো রাজনৈতিক বোঝাপড়া ছিলো না। কিন্তু একটা বিষয় বুঝতাম না যে, তাঁকে সরাবার পর কী ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে এবং প্রতিক্রিয়া কী হবে। তাই আমি বিভিন্নজনের সঙ্গে আলাপ শুরু করলাম এবং অর্থনীতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনা করলাম। কেননা তখন পর্যন্ত অনেকের মতে অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশ টিকে থাকতে পারে না।

এ্যান্থনী : মুজিবকে সরাবার প্রক্রিয়া একবার শুরু হলো, তার স্থলাভিষিক্তি কাকে করা হবে সেই ব্যক্তিত্বকেও খুঁজে বের করতে হয়। তা কীভাবে করা হয়?

রশিদ : আমাদের প্রথম পছন্দ ছিলো জেনারেল জিয়া, এজন্য অনেক প্রচেষ্টার পর ১৯৭৫ সালের ২০শে মার্চ সন্ধ্যায় আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হই। জেনারেল জিয়া বললেন, "আমি একজন সিনিয়ার অফিসার। এ ধরনের কর্মকাণ্ডে আমি জড়িত হতে পারি না। কিন্তু তোমরা, জুনিয়ার অফিসাররা আগ্রহী হলে, এগিয়ে যেতে পারো।"

এ্যান্থনী : আপনি কী একথা জেনারেল জিয়াকে পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন যে, আপনারা শেখ মুজিবুর রহমানকে উৎখাতের পরিকল্পনা করেছেন?

রশিদ : আপনার মনে রাখা দরকার যে, এসময় আমি সামরিক বাহিনীর উপ-প্রধান একজন মেজর জেনারেলের সঙ্গে কথা বলছিলাম। যদি আমি সরাসরি তাঁকে বলতাম যে, আমি দেশের প্রেসিডেন্টকে সরাতে চাই, সেক্ষেত্রে তাঁর নিজের সান্ত্রীদের দিয়ে সেখানেই আমাকে গ্রেফতার করে সরাসরি জেলে পাঠিয়ে দেয়ার সম্ভাবনা ছিলো, তাই আমাকে কিছুটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথাটা পাড়তে হয়েছে। আলোচনার আসল জায়গায় এসে বলেছিলাম যে, ব্যাপকভাবে দুর্নীতি চলছে এবং কিছুই ঠিকভাবে চলছে না, সেজন্য একটা পরিবর্তন দরকার। এসব শুনে জেনারেল জিয়া বলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, চলো আমরা বাইরের লন-এ যেয়ে বসে আলাপ করি।

এ্যান্থনী : জিয়া কী আপনাকে এভাবে বলেছিলেন?

রশিদ : হ্যাঁ। এরপর আমরা লন-এ গেলাম। আমি তাকে বললাম আমরা হলাম পেশাদার সৈনিক। আমরা দেশকে সেবা করি, কোনো ব্যক্তি বিশেষকে

নয়। সশস্ত্র বাহিনী, সিভিল সার্ভিস, সরকার, সব কিছুই রসাতলে যাচ্ছে। আমাদের এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। আমরা জুনিয়ার অফিসাররা এর মধ্যেই এ ব্যাপারে পরিকল্পনা করেছি। আমরা আপনার সমর্থন ও নেতৃত্ব কামনা করছি। তিনি বললেন, আমি দুঃখিত এ ধরনের কিছুর মধ্যে আমি জড়াতে চাই না। যদি তোমরা কিছু করতে চাও, সেক্ষেত্রে জুনিয়ার অফিসারদের নিজেদের তা করা উচিত।

এ্যান্থনী : তাহলে আপনাদের এ ধরনের একটা পরামর্শের কথা তিনি প্রেসিডেন্টকে জানান নি।

রশিদ : না। তবে তিনি নিজের এডিসিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, আমাকে আর কোনো সাক্ষাৎকার দেয়া হবে না।

এ্যান্থনী : মুজিবের মৃত্যুর পর আপনি এবং কর্নেল ফারুক মিলে জনাব মোশতাককে দেশের প্রেসিডেন্ট বানালেন। এর আগে কী তার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল?

রশিদ : হ্যাঁ। অগাস্টের প্রথম সপ্তাহে তার সঙ্গে আমার আলোচনা হয় এবং এরপর আমি ১২ই, ১৩ই এবং ১৪ই অগাস্ট তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

এ্যান্থনী : আপনি কী মুজিব হত্যা সম্পর্কে তার সঙ্গে আলোচনা করেছেন?

রশিদ : ঠিক হত্যার কথা সরাসরি বলিনি। তবে তাকে এমনভাবে বলা হয়েছে যে, ক্ষমতা থেকে ওদের বল প্রয়োগে হঠানো হবে এবং এ কাজ করতে যেয়ে শেখ মুজিবকে হত্যা করা হতে পারে।

এ্যান্থনী : কী ধরনের আলোচনা হয়েছিলো, আপনি কী সে সম্পর্কে ধারণা দিতে পারেন?

রশিদ : হ্যাঁ, আলোচনার পর আমি তাকে দুটো বিশেষ প্রশ্ন করলাম। যেহেতু তিনি শেখের খুব ঘনিষ্ঠ, সেক্ষেত্রে তিনি কী মনে করেন যে, শেখের নেতৃত্বে দেশের অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁর উত্তর ছিলো; না, কোনো সম্ভাবনা নেই। রাজনীতিবিদদের মতো আপনিও মনে করেন যে, দেশের অগ্রগতির কোনো সম্ভাবনা নেই, তখন আপনি কেন তাকে সংশোধনের পরামর্শ দিচ্ছেন না? তিনি বলেন, আমাদের পক্ষে এটা বলা খুবই দুষ্কর।

এ্যান্থনী : আপনি কোনটা বোঝাতে চাচ্ছেন? উৎখাত, নাকি পরামর্শ দেয়া?

রশিদ : উৎখাত এবং পরামর্শ দেয়া দুটোই ছিলো কঠিন কাজ।

এ্যান্থনী : আপনারা কী করতে যাচ্ছেন, এ সম্পর্কে আপনি কী তাকে কোনোরকম ইঙ্গিত দিয়েছিলেন?

রশিদ : তিনি বললেন, এ ধরনের কাজ করার জন্য যদি কারো সাহস ও কর্মতৎপরতা থাকে, তাহলে আপনারা ভবিষ্যতে যে নেতৃত্বকে পছন্দ করতে যাচ্ছেন তার জন্য মঙ্গলজনক হবে। এরপর শুধু জানতে চাইলাম যে, আপাতত তাঁর দেশের বাইরে যাওয়ার কোনো সম্ভবনা রয়েছে কিনা?

এ্যান্থনী : পরবর্তী কয়েক দিনের মধ্যে যোগাযোগের জন্য পাওয়া যাবে কি-না, আপনাকে এ ধরনের সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন করেছিলেন?

আবেদন, কাকুতি, মিনতি, অনশন কিছুই এরশাদের ইস্পাত কঠিন হৃদয়কে টলাতে পারলো না।

তারা জীবিত থাকলে হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত রহস্য বেরিয়ে আসতো। বেরিয়ে আসতো নেপথ্য নায়কের বিভৎস চেহারা। এখন সব পাক-সাফ। মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত এবং বিভিন্ন মেয়াদে সাজাপ্রাপ্ত অফিসারদের অনেকেই জিয়া হত্যার সাথে সরাসরি জড়িত ছিলেন না। চট্টগ্রাম বিদ্রোহকে বাহ্যত একটি বিশেষ গ্রুপের অফিসারদের নিশ্চিহ্ন করে দেবার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

মঞ্জুর বরাবরই জেনারেল এরশাদকে তার দুর্নীতি ও নষ্ট চরিত্রের জন্য প্রকাশ্যে ঘৃণা করতো। এরশাদ ভালোভাবেই জানতেন, জিয়ার পর তিনি ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করলেও জীবিত মঞ্জুরের উপস্থিতিতে কোনোভাবেই তিনি নিশ্চিন্ত মনে দেশ শাসন করতে পারবেন না। অতএব ভালো করে হিসাব-নিকাশ করেই এক ঢিলে দুই পাখি মারার আয়োজন করা হয়। সবকিছুই ছিল মূলত সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার কোন্দল ও ষড়যন্ত্রের ফসল।

৭ নভেম্বরের সিপাহী বিদ্রোহের পথ ধরে জিয়ার উত্থানের আড়ালে যে বহুরূপী কালো বিড়ালটি ম্যাও ম্যাও করে সবার অলক্ষ্যে সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদর দফতরে প্রবেশ করে, পরবর্তীতে তার অশুভ পদচারণায় সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিমণ্ডলে সুদূরপ্রসারী বিপর্যয় ডেকে আনে। এর জের আজও চলছে। চলবে আরো বহুদিন।

জিয়ার উত্থানের দিনগুলোতে তাঁর পাশে প্রকৃত বন্ধু হিসেবে তাঁকে ঘনায়মান সংকেত নিয়ে হুঁশিয়ার করেছিলাম, তাঁর সাথে কড়া বাক্য বিনিময় করেছিলাম। সে আমার কোনো কথাই শোনেনি। ক্ষমতার পংকিলে পড়ে সে ছিল তখন অন্ধ। সেই সুযোগে চাটুকার ষড়যন্ত্রকারীরা দল বেঁধে ঘিরে ধরে হিংসা-সংঘাতের দিকে তাঁকে পরিচালিত করে। আমার বিরুদ্ধে জোট বেঁধে জিয়ার কান-ভারি করে। তাঁর ও আমার মধ্যে বহুদিনের গভীর সুসম্পর্কে ফাটল ধরায়। ষড়যন্ত্রের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে আমি তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করে চক্রান্তের পংকিল আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসি। ওদেরকে জিয়া চিনতে পারেনি, বরং আমাকেই ভুল বুঝেছিল।

আজ বলতে দ্বিধা নেই, তখনকার সেই চাটুকার ষড়যন্ত্রকারীদের জালেই আটকা পড়ে জিয়া এবং পরবর্তীতে মঞ্জুরসহ আরো বহু তরুণ অফিসার অকালে জীবন বিসর্জন দেয়।

আমিও জীবনযুদ্ধে পরাজিত এক সৈনিক। সেই উত্তাল দিনগুলোর আমি শুধু এক নীরব সাক্ষী। আজ জীবন সায়াহ্নে এসে গভীর বেদনার সাথে নীরবে নিভৃতে সহযোগীদের আকাশ-পাতাল উত্থান আর পতনের স্মৃতি রোমন্থন করে বার বার খেই হারিয়ে ফেলি।

মানুষের জীবন কী বিচিত্রময়? ভাগ্য বিধাতা মানুষের ভাগ্যলিপিতে যা লিখে দিয়েছেন, তা কিছুতেই খণ্ডাবার নয়।

পরিশিষ্ট 'ক'

মুজিব হত্যা প্রসঙ্গ : ফারুক-রশিদের সাক্ষাৎকার

১৯৭৬ সালের আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে লন্ডন টেলিভিশনে মেজর ফারুক এবং মেজর রশিদ এক সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। উপমহাদেশের বিতর্কিত সাংবাদিক এ্যান্থনী ম্যাসকার্নহাস এই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। তারই অংশবিশেষ এখানে সংযোজিত হলো—

এ্যান্থনী : ঐ সময়ে সেনাবাহিনী কী কোনো বিশেষ ধরনের অপারেশনে লিপ্ত ছিলো?

ফারুক : হ্যাঁ, আমরা ঐসময় চোরাচালান-বিরোধী এবং খাদ্যশস্য স্থানান্তর অভিযানে লিপ্ত ছিলাম।

এ্যান্থনী : মুজিবের অফিস থেকে এ মর্মে কী নির্দেশ ছিলো যে, এ ধরনের কার্যকলাপের অভিযোগে কোনো আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেফতার করা যাবে না?

রশিদ : হ্যাঁ।

ফারুক : অবস্থা এমন এক পর্যায়ে দাঁড়িয়েছিলো যে মনে হচ্ছিলো যে, আমরা একটি ক্রিমিনাল সংস্থার নিয়ন্ত্রণে ছিলাম।

রশিদ : তিনি সবাইকেই দুর্নীতিপরায়ণ হবার সুযোগ দিয়েছিলেন। তিনি অমানবিক ও নীতিবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগের জন্য নিজের দলীয় সদস্য এবং অন্য কারো বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করেননি।

এ্যান্থনী : এটা কী সত্য যে, যখনই নিজের রাজনৈতিক দলের কেউ দুর্নীতির অভিযোগে অযথা আইনকে অগ্রাহ্য করার অপরাধে আটক হয়েছে, তখনই মুজিব তাদের রক্ষা করেছেন।

রশিদ : হ্যাঁ।

এ্যান্থনী : আপনারা কী মুজিবকে এ কথাটা জানাবার চেষ্টা করেছিলেন যে, এই অবস্থার পরিবর্তন দরকার?

রশিদ : না, তা করা হয়নি। কেননা সামরিক বাহিনীর আমরা ছিলাম জুনিয়ার অফিসার।

এ্যান্থনী : এ ধরনের এক প্রেক্ষাপটে আপনারা কী তাঁকে জোর করে পদত্যাগের কথা বলতে পারতেন? নাকি তাঁকে হত্যা করাটা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিলো?

এ্যান্থনী : কর্নেল ফারুক-এর ট্যাংকগুলোতে গোলাবারুদ না থাকতে পারে, কিন্তু কর্নেল রশিদের ফিল্ডগানগুলোর জন্যে যথেষ্ট সরবরাহ ছিলো। তার কামানগুলো মুজিবের বাসার ওপর দিয়ে গোলা নিক্ষেপ করতে শুরু করে।

ফারুক : রক্ষীবাহিনী যাতে ভীত হয়ে পড়ে এবং মুজিবের সাহায্যে এগিয়ে আসতে না পারে সেটাই ছিলো এর উদ্দেশ্য।

এ্যান্থনী : তাহলে আপনি ৩০টা ট্যাংক নিয়ে রক্ষীবাহিনীর হেডকোয়ার্টার-এর দিকে রওয়ানা দিলেন?

ফারুক : আমি ২৮টা ট্যাংক নিয়ে গ্যারাজ থেকে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু যখন আমি এয়ারপোর্ট এবং সেকেন্ড ক্যাপিটাল এলাকা অতিক্রম করছিলাম, তখন আমার পিছনে একটা মাত্র ট্যাংক অনুসরণ করছিলো।

এ্যান্থনী : আপনি কী ২৭টা হারিয়ে ফেলেন?

ফারুক : মনে হয় এগুলো ক্যান্টনমেন্ট অথবা এয়ারপোর্টের কোথাও আটকা পড়েছিলো।

এ্যান্থনী : বাস্তবে আপনি একটিমাত্র অস্ত্রহীন ট্যাংক নিয়ে ৩,০০০ রক্ষীর শেখ মুজিবের প্রাইভেট ফোর্সকে বিন্দুবৎ করে দিলেন?

ফারুক : যে কোনো বাহিনীর স্বাভাবিকভাবে প্রতিক্রিয়া করতে কিছুটা সময়ের প্রয়োজন। এ ব্যাপারে মানসিক দিক থেকে আমি নিশ্চিত ছিলাম যে ওরা এখন আর তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারবে না। কেউ উদ্ভূত পরিস্থিতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলে ত্বরিতভাবে তারা কোনো 'এ্যাকশন' গ্রহণ করতে পারে না।

এ্যান্থনী : এবার আপনি অন্য টার্গেটগুলোর দিকে এগিয়ে গেলেন?

ফারুক : এরপর আমি শেখ মুজিবের বাসার দিকে রওয়ানা হই। শেখ মুজিবের বাসায় আমাদের লোক আমাকে থামিয়ে বললো, 'সব কিছু ঠিক আছে'।

এ্যান্থনী : সব কিছু ঠিক আছে অর্থ কী মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে?

ফারুক : হ্যাঁ।

এ্যান্থনী : মুজিবের বাসায় কি ঘটনা হলো? কেন তাঁর পরিবারের সমস্ত সদস্যকে হত্যা করা হলো?

ফারুক : শেখকে বলা হয়েছিলো আত্মসমর্পণ করার জন্যে এবং নিচে নেমে আসার জন্য। এরপর হলো কী, তিনি ঘরের মধ্যে চলে গেলেন এবং আর্মি হেডকোয়ার্টারে ফোন করলেন। তার সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্যে তিনি জেনারেল শফিউল্লাহ এবং মিলিটারি সেক্রেটারি কর্নেল জামিলকে বললেন। এমন কী রক্ষীবাহিনীর হেডকোয়ার্টারেও ফোন করলেন। সবাই তাঁকে জানালো যে, তারা শীঘ্রই হাজির হবেন। মনে হয় এতেই তিনি সাহস পেলেন এবং ছেলেমেয়েদের বললেন প্রতিহত করার জন্যে।

এ্যান্থনী : তাই মুজিব বুঝতে পেরেছিলেন যে, সাহায্য আসছে এবং আপনাদেরকে প্রতিহত করতে শুরু করবে?

ফারুক : হ্যাঁ, ওরাই গোলাগুলি শুরু করে। ওরাই প্রথমে গুলি আরম্ভ করে। আমাদের সৈন্যদের একজন ঘটনাস্থলেই মারা গেলো। আর বুলেটে গুরুতর আহত হলো ৪ জন। তাই ঘটনা যখন ঘটেই গেলো, তখন আর সময় নষ্ট করা সম্ভব নয়। আমরা তাঁকে আসতে বললাম। তারা গুলি করলো এবং আমরাও ঘরের মধ্যে গ্রেনেড নিক্ষেপ করলাম। কেননা সবাই মিলে এই ঘর থেকেই গুলি করছিলো। যেহেতু কামরা বন্ধ ছিলো এবং সবাই এখানেই ছিলো। পরিবারের মহিলা ও শিশুও ছিলো। তাই এ্যাকশন— এর দরুন এরাও নিহত হয়েছে। এটা খুবই দুঃখজনক। কিন্তু যেহেতু সৈন্য মারা গেছে, সেজন্যে এরা আর কোনো সুযোগ দেয়নি এবং অপেক্ষা করেনি—।

এ্যান্থনী : আপনি কী আশা করেছিলেন, মুজিব বেরিয়ে আসবেন এবং আত্মসমর্পণ করবেন?

ফারুক : যদি তিনি করতেন, তাহলে এ ধরনের ঘটনা হতো না। সম্ভবত তাঁর পরিবারের সদস্যরা বেঁচে যেতেন।

এ্যান্থনী : কিন্তু আপনি কেমন করে আশা করতে পারলেন যে, মুজিব তা করবেন, তিনি বেরিয়ে আসবেন ....?

ফারুক : আপনিই দেখুন, যখন আর্মিরা তাঁকে ঘেরাও করে ফেলেছে এবং তারা আত্মসমর্পণ করতে বলছে, তখন তাঁর উচিত ছিলো আত্মসমর্পণ করা ......। এখান থেকে আমি গেলাম রেডিও স্টেশন চেক করতে, রেডিও ভবন দখল করা হয়েছে কি-না। আমি দেখলাম রেডিও স্টেশন নিরাপদে রয়েছে এবং এই রেডিও স্টেশন থেকেই খন্দকার মোশতাক আহমদ নিজেকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন এবং কয়েকটি ঘোষণা দেন। এখানে তাঁর সঙ্গে আমাকে পরিচয় করানো হলো। এই প্রথমবারের মতো আমি তাঁর সঙ্গে পরিচিত হলাম। তিনি আমাকে বসতে অনুরোধ করলেন ....।

এ্যান্থনী : ১৫ই অগাস্ট শেখ মুজিবের উত্তরসূরি হিসেবে আপনি খন্দকার মোশতাক আহমদকে নয়া প্রেসিডেন্টের গদিতে বসালেন। ক্ষমতায় ছিলেন তিনি ৮৩ দিন। আপনার আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যগুলো কী তিনি পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন?

ফারুক : না। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, কিন্তু করেননি?

এ্যান্থনী : তিনি কী মুজিবের নীতিই অনুসরণ করছিলেন? নাকি তিনি নীতিগতভাবে পরিবর্তন এনেছিলেন?

ফারুক : তিনি বলেছিলেন যে, পরিবর্তন করবেন, কিন্তু সে সময় তিনি করেননি।

এ্যান্থনী : ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে মোশতাককে সরাবার পর যখন জেনারেল জিয়া তাঁর সমস্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পথে সরকার পরিচালনা করছেন, তিনি কী কোনোভাবে মোশতাকের নীতি পরিবর্তন করেছেন?

ফারুক : জেনারেল জিয়া কিছুই করেননি এবং কিছু করতে সক্ষম নন।

এ্যান্থনী : তাহলে দেশ শাসনের ক্ষেত্রে তিনি মুজিবের মতোই খারাপ?

ফারুক : তিনি শেখ মুজিবের নীতিই অনুসরণ করে যাচ্ছেন।

এ্যান্থনী : মুজিবকে হত্যা করে বাংলাদেশ কী ফায়দা উঠাতে সক্ষম হয়েছে? গত ১২ মাসের (১৯৭৫-১৯৭৬) ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণ করে বলা যায় যে, খুবই কম ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়েছে। এ ধরনের এক প্রেক্ষাপটে যে কোনো লোক সব সময়ের জন্যে একটা প্রশ্নই শুনতে পারেন, তাহলে মুজিবকে কেন মরতে হলো?

পরিশিষ্ট 'খ'

কর্নেল ফারুক ও কর্নেল রশিদের চাঞ্চল্যকর সাক্ষাৎকার ১৫ই অগাস্ট, ১৯৮৩ ও ৭ই নভেম্বর ১৯৮৩ স্যাটারডে পোস্টে প্রকাশিত (আংশিক)

প্রশ্ন : ১৯৭৫ সালের অগাস্ট বিপ্লবের অনুপ্রেরণার উৎস কী ছিলো?

জবাব : আমাদের নিপীড়িত ভাইবোন ও দুঃখী মানুষের সীমাহীন দুঃখ, দুর্গতি, নির্যাতন ও শোষণ থেকে মুক্তি। জাতীয় স্বাধীনতা ও মর্যাদা যেখানে লাঞ্ছিত, পদদলিত হচ্ছিল, সেখানে কোনো এ্যাডভেঞ্চারিজমের জন্য নয়; বরং আমাদের সাধারণ বোধশক্তিই দেশমাতৃকার প্রতি নিছক দায়িত্ব পালনে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে।

প্রশ্ন : অগাস্ট বিপ্লবের তাৎক্ষণিক ও সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যসমূহকে চিহ্নিত করবেন কী?

জবাব : তাৎক্ষণিক লক্ষ্য : আগ্রাসী বহিঃশক্তির মদদপুষ্ট গণবিরোধী আওয়ামী বাকশালী স্বৈরাচারের সুকঠিন শৃঙ্খল থেকে মুক্তির স্বপ্ন ছিনিয়ে আনা এবং জনগণের রাজনৈতিক স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা।

সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য : জাতীয় স্বার্থ সামাজিক শক্তির স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ বিকাশের মাধ্যমে স্বতঃসিদ্ধ পদ্ধতিতে সঠিক ধারায় বিপ্লবী পরিবর্তন সূচিত করা।

প্রশ্ন : আপনারা কী মনে করেন যে, বিপ্লবের লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হয়েছে?

জবাব : আমাদের মতে, পরিপূর্ণ সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা নির্ভর করছে সামনের দিনগুলোতে সাধারণ মানুষ, প্রতিরক্ষা বাহিনী ও জনগণের প্রতিনিধিদের সামগ্রিক সচেতনতার ওপর।

প্রশ্ন : কেউ কেউ অগাস্ট বিপ্লবকে কতিপয় অসন্তুষ্ট সামরিক অফিসারের হঠকারী পদক্ষেপ বলে চিহ্নিত করতে চান। এ প্রশ্নের জবাবে আপনারা কী বক্তব্য রাখবেন?

জবাব : এটা সত্যের অপলাপ মাত্র। ১৯৭২ সালের শেষের দিকেই সামরিক বাহিনীর অধিকাংশ অফিসারের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, একটি আগ্রাসী শক্তির কাছে মীরজাফররা দেশের আজাদী বন্ধক দিয়েছে। ১৯৭৩ সালের শেষের

দিকে অধিকাংশ বিজ্ঞ সামরিক অফিসারের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, দেশের এই সংকটকালে কিছু একটা করা উচিত। কিন্তু কেউই এটা নির্ণয় করতে পারছিলেন না যে, কীভাবে সে দায়িত্বটা পালন করতে হবে। ১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যে একটি যৌক্তিক কার্যক্রমের প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করে বিস্তারিত কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয় এবং একটি খসড়া সময়সূচিও নির্ধারণ করা হয়। গোপনীয়তা রক্ষা করার স্বার্থেই বিস্তারিত কার্যক্রমের পরিকল্পনা আমরা দু'জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখি। চূড়ান্ত সময়সূচি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রায় ৬ মাস কেটে যায়। কেননা এটি বেশ কিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রবাহের কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত চূড়ান্ত আঘাত হানার দুটি নির্ধারিত সময়সূচি ছিলো। সত্যি কথা বলতে কী, দুটি বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বিপ্লবের মহড়াও অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে ১৫ই অগাস্ট ছিল চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণের সর্বশেষ সময়সূচি। ১২ অগাস্টের মধ্যে আমাদের কাছে এটা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ১৫ই অগাস্ট হচ্ছে চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণের মোক্ষম সময়। চূড়ান্ত পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য ১২ই অগাস্ট ও ১৪ই অগাস্টের মধ্যবর্তী সময়কে বেছে নেয়া হয়। পরিকল্পনা কার্যকরী করার আদেশ প্রদান করা হয় ১৫ই অগাস্ট, এবং ১৪ আগস্ট ঐ দিনই সূর্যাস্তের অব্যবহিত পর থেকে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দেশ দেয়া হয়।

প্রশ্ন : একটি সফল অভ্যুত্থানের সংগঠক ও নেতা হয়েও কেউ বিপ্লব পরবর্তীকালে ক্ষমতার মোহ থেকে দূরে থেকেছেন কেন?

জবাব : প্রথমেই আমরা এ ধারণার নিরসন করতে চাই যে, আমরা কোনো সামরিক অভ্যুত্থানের সংগঠক কিংবা নেতা নই। আমরা দুজনই ১৫ই অগাস্ট অপরাহ্নে আমাদের কমান্ড রেজিমেন্টের কাছে হস্তান্তর করি এবং ঐদিনই একজন বেসামরিক প্রেসিডেন্ট শপথ গ্রহণ করেন। এরপর আমরা ঊর্ধ্বতন অফিসারের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেছি।

প্রশ্ন : ১৫ই অগাস্টকে কেন্দ্র করে দেশে বেশ কিছু গুজব চালু আছে। আপনারা এই পটভূমিতে জাতিকে সঠিক তথ্য জানানোর কোনো দায়িত্ব অনুভব করেন কি-না?

জবাব : ১৫ অগাস্টের বিপ্লবী পদক্ষেপ নিয়ে দেশে যথেষ্ট গুজব চালু আছে, এসব আমরা জানি। তবে আমরা আশাবাদী যে, সময়ে এসব গুজবের ফানুস নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : কেউ কেউ মনে করেন যে, মুজিব এবং অন্যান্যের আত্মসমর্পণের সুযোগ দেয়া উচিত ছিল। আপনারা এই হত্যাকাণ্ডের সপক্ষে আপনাদের যুক্তি তথ্য পেশ করবেন কী?

জবাব : শেখ মুজিব, শেখ মনি এবং আবদুর রব সেরনিয়াবাত এই তিনজনের প্রত্যেককেই নিজ নিজ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বিপ্লবীদের কাছে আত্মসমর্পণ

করার অনুরোধ জানানো হয়েছিল। কিন্তু আত্মসমর্পণের পরিবর্তে এরা গোলাবর্ষণ করতে থাকেন। এতে বেশ ক'জন বিপ্লবী সৈনিক ও অফিসার আহত হন এবং ক'জন মৃত্যুবরণ করেন। ফলে বিপ্লবীরা আত্মরক্ষার প্রয়োজনে গ্রেনেড নিক্ষেপ করেন এবং স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের গুলিবর্ষণ করে দুর্গগুলো বিধ্বস্ত করে দিতে বাধ্য হন। অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির শিকার হয়ে অনেকেই ঘরের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন। তবে এটাও সত্য যে, শেখ মুজিব, শেখ মনি ও আবদুর রব সেরনিয়াবাতের ব্যাপারে বিপ্লবীদের এই সিদ্ধান্ত ছিল যে, দেশ ও জাতির সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে বিচারের মাধ্যমে ফায়ারিং স্কোয়াডে তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। শেখ মুজিব এবং তাঁর সহযোগীরা যে পদ্ধতি চালু করেছিলেন, সেই পদ্ধতিতে জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে তাদেরকে গণআদালতে বিচার করারও কোনো পথ খোলা ছিলো না। তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখা হলে আমাদের বিপ্লবী কার্যক্রম সফল করার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণকে অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক আগ্রাসনের কবল থেকে মুক্ত করা সম্ভব হতো না।

প্রশ্ন : ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বরের অভ্যুত্থান সম্পর্কে দেশে অসংখ্য গুজব চালু আছে। এ সময়কার রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হিসেবে আপনারা এ সম্পর্কে জাতিকে কিছু সঠিক তথ্য জানাবেন কি?

জবাব : হ্যাঁ, ৩রা নভেম্বরের অভ্যুত্থানের ঘটনাপ্রবাহ আজও অন্ধকারে ঢাকা। এ সম্পর্কিত পুরো তথ্য আমরা পরবর্তী কোনো এক সময়ে জাতিকে জানাবো। এ মুহূর্তে দ্ব্যর্থহীনভাবে আমরা বলতে চাই যে, ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বরের অভ্যুত্থানটি ছিলো জিয়াউর রহমানের নেপথ্য পরিকল্পনা ও প্ররোচনার ফসল। তিনি একটি সামরিক ফ্যাসিস্ট সরকার গঠনের লক্ষ্যে নেপথ্যে থেকে একদল অসন্তুষ্ট সামরিক অফিসারের মাধ্যমে এটি সংগঠিত করেছেন। আমরা জানি, আমাদের এই মূল্যায়ন কারো কারো কাছে রূঢ় এবং বিব্রতকর লাগতে পারে। কেননা জেনারেল জিয়া অত্যন্ত দক্ষতার সাথেই তাঁর শঠ ও ক্ষমতালিপ্সু চরিত্রটিকে আড়াল করে নিজের একটা ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমরা আর একটি সত্য ঘটনা প্রকাশ করার দায়িত্ব তীব্রভাবে অনুভব করছি। অন্য রকম গুজব যাই থাক না কেন এবং ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে সাধারণভাবে যে ধারণাই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, খালেদ মোশাররফ ছিলেন ১৫ই অগাস্টের বিপ্লবী পদক্ষেপের অন্যতম জোরালো সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক এবং তিনি ৩রা ন[illegible] অভ্যুত্থানের সাথে আদৌ জড়িত ছিলেন না। বিশ্বাসঘাতকদের কূটচক্রান্তের মাধ্যমে সৃষ্ট দুর্যোগ প্রতিরোধে তিনি যখন সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, তখন তাকে পরিস্থিতির শিকার হতে হয়েছিল মাত্র। এই অজ্ঞাত ইতি[illegible]সের পাতা আমরা অদূর ভবিষ্যতে জাতির সামনে উন্মোচিত করবোই ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন : ১৯৭৫ সালের ৩রা ও ৪ঠা নভেম্বরের ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে কে বেশি লাভবান হয়েছে বলে আপনারা মনে করেন?

জবাব : জেনারেল জিয়াউর রহমান, অধিকাংশ উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার এবং ঊর্ধ্বতন সরকারি আমলারাই এর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে লাভবান হয়েছে।

প্রশ্ন : কোন কোন মহল ৩রা ও ৪ঠা নভেম্বরের জেল হত্যার ঘটনার জন্য আপনাদেরকে দায়ী করতে চান। এ ব্যাপারে আপনাদের বক্তব্য কী?

জবাব : আমাদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আমাদের বৈরি মহল এই অসত্য প্রচারটা চালিয়েছে। আমরা ৩রা নভেম্বর ১৯৭৫-এর অভ্যুত্থান প্রতিরোধেই সর্বাত্মকভাবে ব্যস্ত ছিলাম। ঐ সময় জেল হত্যার পেছনে সময় ও মেধা ব্যয় করার মতো পর্যাপ্ত সময় আমাদের হাতে ছিলো না। ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর থেকে দেশের বাইরে থাকায় এখন পর্যন্ত আমরা ষড়যন্ত্রের নেপথ্য নায়কদের মুখোশ উন্মোচন করার সুযোগ পাইনি। আজও বিস্তারিত তথ্য অনুদঘাটিত রয়ে গেছে। আমরা এটা জানতে পারলে খুশি হতাম যে, মরহুম জিয়া কেন ৩রা নভেম্বরের অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত অফিসারদের বিনা বিচারে নিষ্কৃতি দিলেন? তবে সম্ভবত এ প্রসঙ্গে একটি তদন্ত অনুষ্ঠিত হলে সব রহস্যের জট খুলে যেতো।

প্রশ্ন : ১৯৭৫ সনের ৩রা নভেম্বরের অভ্যুত্থান সম্পর্কে অনেকেই মনে করেন, ওটা ছিল আসলে ক্ষমতা দখলের জন্য রুশ-ভারতের অনুগত চক্রের একটি অপপ্রয়াস। ৩রা নভেম্বরের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে আপনাদের বক্তব্য কী?

জবাব : উপরোক্ত ধারণা আংশিক সত্য। ওটা অভ্যুত্থান ছিলো না; ছিল সেনা ছাউনির কতিপয় হিংসা, পরশ্রীকাতরতা ও উচ্চাভিলাষে অন্ধ সামরিক অফিসারের বিদ্রোহ।

প্রশ্ন : ৩রা নভেম্বরের বিদ্রোহ সংঘটনের পেছনে সুনির্দিষ্ট কারণগুলো খোলামেলাভাবে আপনারা বলবেন কী? সেই সময়কার চীফ অব স্টাফ হিসেবে জেনারেল জিয়াউর রহমানের ভূমিকা ও দায়িত্ব কী ছিলো?

জবাব : আমরা পূর্বেই বলেছি যে, সেনাবাহিনীর কতিপয় নগণ্য সংখ্যক অফিসার হিংসা, উচ্চাভিলাষ এবং পরশ্রীকাতরতায় জড়িয়ে সুগভীর ষড়যন্ত্রের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিল। সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ হিসেবে জেনারেল জিয়াউর রহমান চাননি যে, বিপ্লবের পর পরই বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা কিংবা পার্লামেন্ট সদস্যদের মধ্যে থেকে কাউকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ করতে। তিনি এটাও চাননি যে, দেশে তাড়াতাড়ি একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া চালু করে তার সাথে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করতে। অতৃপ্ত বাসনা, উচ্চাভিলাষ এবং লোভ জেনারেল জিয়াকে এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যে, তিনি চাইতেন যেকোনো মূল্যে প্রেসিডেন্ট পদে অভিষিক্ত হওয়া। যার জন্যে ৩রা নভেম্বরের বিদ্রোহের জন্য তিনি যে কেবল দায়ীই ছিলেন তাই

নয়, বরং সে বিদ্রোহের তিনি ছিলেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এর জন্যে তিনি বাকশাল ও জাসদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন।

প্রশ্ন : আপনারা প্রেসিডেন্ট জিয়াকে সর্বদাই একজন ক্ষমতালিপ্সু ব্যক্তি ও ৩রা নভেম্বরের বিদ্রোহের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু দেশের প্রায় সর্বমহল এই মর্মে অবহিত যে, ৩রা নভেম্বরের বিদ্রোহীরা তাকে আটক করে রাখে এবং ৭ই নভেম্বরের সিপাহী জনতা তাকে বিপ্লবের মাধ্যমে মুক্ত করে আনে। এতদসংক্রান্ত কোন তথ্যগুলো সঠিক?

জবাব : প্রথম কথা হচ্ছে জিয়া তাঁর স্বসৃষ্ট স্টাইলে নিজের বাসভবনে আটক ছিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত দেহরক্ষী ও পদাতিক বাহিনীর একটি কোম্পানির প্রহরাধীন ছিলেন। সেখানে তাঁর ব্যক্তিগত স্টাফ অফিসাররাও ছিলেন। বিদ্রোহ দমনের জন্য তিনি নিজে কোনো উদ্যোগই নেননি। উপরন্তু প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক প্রেসিডেন্ট কর্তৃক এ ব্যাপারে তাঁকে বিদ্রোহ দমন করতে সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করা সত্ত্বেও তিনি বিদ্রোহ দমন করতে অস্বীকার করেন, তার বাসভবনের টেলিফোন বরাবরই সম্পূর্ণরূপে কাজ করছিল। তার স্ত্রী আমাদের এই মর্মে নিশ্চিত করেছিলেন যে, তিনি গ্রেফতার কিংবা আটকাবস্থায় নেই। টেলিফোনে তার সাথে কথা বলতে চাইলে তার স্ত্রী জানান যে, তিনি কতিপয় সামরিক অফিসারের সাথে আলাপ করছেন। এরপর বঙ্গভবন থেকে তাঁকে যতবারই ফোন করা হয়েছে ততবারই তিনি ফোনে কথা বলতে অস্বীকার করেন। চীফ অব আর্মি স্টাফ এর পদবী অপব্যবহার করে জিয়া সর্বদাই মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জনগণ ও সৈনিকদের ধোঁকা দিয়েছেন।

প্রশ্ন : এই মর্মে বিভিন্ন মহলে গুজব আছে যে, জিয়ার শাসনামলে প্রায় এক ডজনের মতো ব্যর্থ অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিল এইসব ব্যর্থ অভ্যুত্থানের সাথে জড়িয়ে সামরিক বাহিনীর বহু অফিসার ও জোয়ানকে নাকি নৃশংসভাবে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। এই ব্যাপারে আপনাদের কিছু বলার আছে কী?

জবাব : এইগুলো সব গুজব এবং মিথ্যা। জিয়ার শাসনামলে একমাত্র অভ্যুত্থান করেছে তারাই, যারা তাঁর সামরিক ও রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী এবং সেই অভ্যুত্থানে তিনি নিহত হন। তাঁর ঐসব উত্তরাধিকারীদের একাংশ বর্তমানে বাংলাদেশের ক্ষমতা উপভোগ করছে। অতীতে যে সব অভ্যুত্থান সম্পর্কে গুজব ছড়ানো হয়, তা ছিল আসলে পূর্ব থেকে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে পরিকল্পিত ব্যাপার। এইসব তথাকথিত অভ্যুত্থানের কথা জিয়া সেই সময়কার ডাইরেক্টরেট-এর সাহায্যে রটনা করিয়েছিলেন নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে : (১) প্রতিরক্ষা বাহিনীসহ বিভিন্ন স্তরের জাতীয়তাবাদী শক্তিসমূহকে নিশ্চিহ্ন করার একটা ক্ষেত্র সৃষ্টি করা; (২) ভয়-ভীতি ও ত্রাস সঞ্চার করে তার মাধ্যমে অর্জিত ফল তাঁর রাজনৈতিক ও দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার কাজে

লাগানো এবং (৩) বাইরের জগতের সামনে নিজকে খুব শক্তিশালী এবং স্বীয় অবস্থানকে অত্যন্ত সুসংহত প্রমাণ করা।

প্রশ্ন : কর্নেল তাহেরের ভূমিকা ও পরিণতি সম্পর্কে আপনা কী জানেন?

জবাব : জেনারেল জিয়া এবং মঞ্জুরের সাথে কর্নেল তাহেরের গভীর হৃদ্যতা ছিল। জেনারেল জিয়া কর্নেল তাহেরের মাধ্যমে জাসদের যোগসাজশে তাঁর রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার ষড়যন্ত্র করেন। জিয়া ক্ষমতা দখল করার পর কর্নেল তাহেরকে নিঃশেষ করার পথ বেছে নেন। কেননা, তাঁর মাধ্যমেই জাসদের সাথে জিয়ার যোগসূত্র রচিত হয়েছিল। তিনি এতদসংক্রান্ত সকল সাক্ষ্য প্রমাণ গায়েব করার সিদ্ধান্ত নেন। আর এই উদ্দেশ্যে (ক) জাসদের গণবাহিনীর হাতে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটানো ও (খ) জাসদের সাথে রাজনৈতিক যোগসাজশ ধামাচাপা দেবার জন্য জেনারেল জিয়া হিংসাত্মক পথ বেছে নেন। কেননা, এই দুটো বিষয় প্রমাণ হলে জিয়ার রাজনৈতিক মৃত্যু অনিবার্য হয়ে উঠতো। ১৫ই অগাস্টের বিপ্লবের পর কর্নেল তাহের আমাদের সাথে বেশ কয়েকবার দেখা করতে আসেন। তিনি জিয়ার পক্ষ থেকে মোশতাককে অপসারিত করার প্রস্তাবও আমাদেরকে দিয়েছেন। মোশতাকের পরিবর্তে আমরা যাতে জিয়াকে প্রেসিডেন্ট মনোনীত করি, সে ব্যাপারে কর্নেল তাহেরের পীড়াপীড়ির অন্ত ছিলো না। এক্ষেত্রে জাসদ আমাদেরকে সকল বাকশালী চর নিশ্চিহ্ন করার ক্ষেত্রে সহযোগিতারও আশ্বাস দেন। আমরা কর্নেল তাহেরকে আরো বলেছি, জাসদ যদি জিয়াকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেখতে চায় তাহলে জিয়াকে সশস্ত্র বাহিনীর দায়িত্ব ছেড়ে নির্বাচনে অংশ নিতে হবে।

প্রশ্ন : ৩রা নভেম্বরের বিদ্রোহের মূল লক্ষ্যই ছিল অগাস্ট বিপ্লবের ফলশ্রুতিকে নস্যাৎ করা। অন্যদিকে ষড়যন্ত্রকারীদের পরিকল্পনা জানা সত্ত্বেও খন্দকার মোশতাক নাকি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে গড়িমসি করেন। তাঁর এই ভূমিকা গ্রহণের উদ্দেশ্য কী?

জবাব : এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার। মোশতাক ইচ্ছে করে কতিপয় জেনারেলদের কুপরামর্শ দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন (ক) তদানীন্তন প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা জনাব এম. এ. জি. ওসমানী; (খ) চীফ অব ডিফেন্স স্টাফ মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান এবং (গ) চীফ অব আর্মি স্টাফ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ প্রমাণ করেছে যে, এসব জেনারেল বাংলাদেশের শত্রুদের ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করেছেন। এছাড়া যদি অন্য কোনো কারণ থেকে থাকে, তবে মোশতাক নিজেই সেক্ষেত্রে পরিষ্কার ধারণা দিতে পারবেন।

প্রশ্ন : ৭ই নভেম্বরের সিপাহী-জনতার বিপ্লবের পরে আপনারা ব্যাংকক থেকে কেন দেশে ফিরে এলেন না?

জবাব : ঐ সময় জিয়ার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোকই অবহিত ছিলেন। আমাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ফলে দু-ধরনের ঘটনা ঘটতে পারতো। প্রথমত, জোর করে জিয়ার ষড়যন্ত্রের পক্ষে আমাদের সমর্থন আদায় করার চেষ্টা হতো, অথবা আমাদের সাথে জিয়ার সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠতো। আমরা যদি জিয়াকে সমর্থন করতাম তাহলে আমাদের মৌলিক নীতিমালাকে জলাঞ্জলি দিতে হতো। অবশ্য অন্য একটি পথও আমাদের জন্য খোলা ছিল। জিয়ার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমরা ব্যাপক জনমত গড়ে তুলতে পারতাম। কিন্তু ঐ সময়টিতে জাতি একটি সংকটকাল অতিক্রম করছিল। আমরা যদি জিয়ার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ নিয়ে অগ্রসর হতাম, তাহলে জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হতো, সেনাবাহিনী বিভক্ত হয়ে পড়তো এবং এমনকি গৃহযুদ্ধও অনিবার্য হয়ে উঠতো। এ ধরনের সংঘাতকে এড়িয়ে চলার জন্যই আমরা সাময়িকভাবে দেশের বাইরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। জিয়া এই অবস্থার সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করেছেন, নিজের ক্ষমতা সংহত করেছেন এবং বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছেন।

প্রশ্ন : অনেকে মনে করেন যে, মুজিবের অবসানের মাধ্যমে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চেয়েছিল।

জবাব : হ্যাঁ, আমরা এই মূল্যায়নের সাথে একমত। এইসব হতাশ জেনারেলরা পেশাগতভাবে ছিলেন অযোগ্য ও অথর্ব। গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার পথে অগ্রসরমান একটি জাতির প্রতিরক্ষা বাহিনীতে তাদের নিজেদের কোনো ভবিষ্যৎ ছিলো না। যে রাজনৈতিক পদ্ধতিতে জনগণের সবকিছু জানার অধিকার রয়েছে; এমনকি, প্রতিরক্ষা বাহিনীর মধ্যেও যা ঘটে, সে সম্পর্কেও জনগণের জানার অধিকার রয়েছে– সেই ধরনের রাজনৈতিক পদ্ধতিতে কারো পক্ষে অযোগ্যতা গোপন করা খুবই দুরূহ ব্যাপার।

প্রশ্ন : ৭ই নভেম্বর বিপ্লব কীভাবে সংঘটিত হয়েছিল বলে আপনারা মনে করেন?

জবাব : পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৫ অগাস্টের বিপ্লব অনন্য বলে বিবেচিত। ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর অভ্যুত্থান হচ্ছে আর একটি অনন্য ঐতিহাসিক ঘটনা, যেদিন কোনোরূপ নেতৃত্বের অপেক্ষা না করে সিপাহী-জনতা স্বাধীনতা রক্ষার অভিন্ন উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে এক বিপ্লবের সূচনা করে। নভেম্বর অভ্যুত্থান ছিলো ১৫ই অগাস্ট অভ্যুত্থানের অনুকরণে জাতীয় ঐক্যের একটি বিস্ফোরণ।

৭ নভেম্বর বিপ্লবের পর যেসব সামরিক, বেসামরিক নেতা নিজস্ব স্বার্থ ও লোভ চরিতার্থ করার দুরভিসন্ধিতে লিপ্ত হয়েছিলো, তারা সাফল্যমণ্ডিত হতে পারেনি।

পরিশিষ্ট 'গ'

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আ.ই.জি. (প্রিজন) নুরুজ্জামানের 'জেল হত্যা রিপোর্ট'

তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবের বরাবর নিজের একটি বিবৃতিসহ তখন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কর্তব্যরত ঢাকা বিভাগের ডি.আই.জি. প্রিজন খন্দকার আবদুল আওয়াল একটি রিপোর্ট পাঠান। তৎকালীন আইজি (প্রিজন) নুরুজ্জামানের বিবৃতিপূর্ণ বিবরণ এখানে দেয়া হলো :

"১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ভোর ৩টায় আমি বঙ্গভবন থেকে মেজর রশিদের একটি ফোন পাই। তিনি আমার কাছে জানতে চান, ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে কোনো সমস্যা আছে নাকি। আমি জানালাম, ঠিক এই মুহূর্তের অবস্থা আমার জানা নেই। এরপর তিনি আমাকে জানালেন, কয়েকজন বন্দিকে জোর করে নিয়ে যেতে কয়েকজন সেনা সদস্য জেলগেটে যেতে পারে, আমি যেন জেল গার্ডদের সতর্ক করে দিই। সে অনুযায়ী আমি সেন্ট্রাল জেলে ফোন করি এবং জেলগেটে দায়িত্বে নিয়োজিত ওয়ার্ডারকে ম্যাসেজটি জেলারকে পৌঁছে দিতে বলি, যাতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়।

৩/৪ মিনিট পর বঙ্গভবন থেকে আরেকজন আর্মি অফিসারের ফোন পাই। তিনি জানতে চান আমি ইতিমধ্যেই ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে গার্ডদের সতর্ক করে দিয়েছি কি-না। আমি ইতিবাচক জবাব দেয়ার পর তিনি আমাকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য জেলগেটে চলে যেতে বলেন। আমি তখন ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ডি.আই.জি. প্রিজনকে ফোন করি। খবরটি জানিয়ে আমি তাকে তাৎক্ষণিকভাবে জেলগেটে চলে যেতে বলি। দেরি না করে আমিও জেলগেটে চলে যাই এবং ইতিমধ্যেই সেখানে পৌঁছে যাওয়া জেলারকে আবারও গার্ডদের সতর্ক করে দিতে বলি। এরই মধ্যে ডি.আই.জি.ও জেলগেটে পৌঁছেন। বঙ্গভবন থেকে পাওয়া খবরটি আমি আবার তাকে জানাই।

এর পরপরই মেজর রশিদের আরেকটি ফোন পাই। তিনি আমাকে জানান, কিছুক্ষণের মধ্যেই জনৈক ক্যাপ্টেন মোসলেম জেলগেটে যেতে পারেন। তিনি আমাকে কিছু বলবেন। তাকে যেন জেল অফিসে নেয়া হয়। এবং ১। জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ ২। জনাব মনসুর আলী, ৩। জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ৪। জনাব কামরুজ্জামান এই ৪ জন বন্দিকে যেন তাকে দেখানো হয়।

এ খবর শুনে আমি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলতে চাই এবং টেলিফোনের প্রেসিডেন্টকে খবর দেয়া হয়। আমি কিছু বলার আগেই প্রেসিডেন্ট জানতে চান, আমি পরিষ্কারভাবে মেজর রশিদের নির্দেশ বুঝতে পেরেছি কি-না এবং আমি ইতিবাচক জবাব দিলে তিনি আমাকে তা পালন করার আদেশ দেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ৪ জন সেনা সদস্যসহ কালো পোশাক পরা ক্যাপ্টেন মোসলেম জেলগেটে পৌঁছায়। ডি.আই.জি. প্রিজনের অফিসকক্ষে ঢুকেই তিনি আমাদের বলেন, পূর্বোল্লিখিত বন্দিদের যেখানে রাখা হয়েছে সেখানে তাকে নিয়ে যেতে। আমি তাকে বলি, বঙ্গভবনের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি আমাকে কিছু বলবেন? উত্তরে তিনি জানান, তিনি তাদের গুলি করবেন। এ ধরনের প্রস্তাবে আমরা সবাই বিমূঢ় হয়ে যাই। আমি নিজে এবং ডি.আই.জি. প্রিজন ফোনে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি, কিন্তু ব্যর্থ হই। সে সময় জেলারের ফোনে বঙ্গভবন থেকে মেজর রশিদের আরেকটি কল আসে। আমি ফোনটি ধরলে মেজর রশিদ জানতে চান, ক্যাপ্টেন মোসলেম সেখানে পৌঁছেছেন কি-না। আমি ইতিবাচক জবাব দিই এবং তাকে বলি, কী ঘটছে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তখন মেজর রশিদ আমাকে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলতে বলেন। আমি প্রেসিডেন্টকে ক্যাপ্টেনের বন্দিদের গুলি করার ইচ্ছার কথা জানাই। প্রেসিডেন্ট জবাব দেন... ১৯৭৫-এর নভেম্বরের জেলহত্যা সম্পর্কে তৎকালীন আইজি প্রিজন নুরুজ্জামান ঘটনার একদিন পর ৫ নভেম্বর যা বলছে– তখন আমরা আরো উত্তেজিত হয়ে যাই। ক্যাপ্টেন মোসলেম বন্দুকের মুখে আমাকে, ডি.আই.জি. প্রিজন, জেলার ও সে সময় উপস্থিত অন্যান্য কর্মকর্তা সেখানে যাওয়ার নির্দেশ দেন, যেখানে উপরিল্লিখিত বন্দিদের রাখা হয়েছে। ক্যাপ্টেন ও তার বাহিনীকে তখন উন্মাদের মতো লাগছিল এবং আমাদের কারো তাদের নির্দেশ অমান্য করার উপায় ছিল না, তার নির্দেশ অনুযায়ী পূর্বোল্লিখিত ৪ জনকে অন্যদের কাছ থেকে আলাদা করা হয় এবং একটি রুমে আনা হয়, সেখানে জেলার তাদের সনাক্ত করেন। ক্যাপ্টেন মোসলেম এবং তার বাহিনী তখন বন্দিদের গুলি করে হত্যা করে। কিছুক্ষণ পর নায়েক এ আলীর নেতৃত্বে আরেকটি সেনাদল সবাই মারা গেছে কি-না, তা নিশ্চিত হতে জেলে আসে। তারা সরাসরি সেই ওয়ার্ডে চলে যায় এবং পুনরায় তাদের মৃতদেহে বেয়নেট-চার্জ করে।

স্বাক্ষর
এন জামান
মহা কারাপরিদর্শক
৫-১১-৭৫ ইং